অগ্রজের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

আন্দামান-নিকোবর অধুনা সংবাদ পত্রের শিরোনাম হয়ে উঠছে। এবার সেলুলার জেল নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের শহীদ-তীর্থ নয়। তেল ও গ্যাস্। পৃথিবী-জোড়া এই হাহাকারের মধ্যে, তেল ও গ্যাসের আশ্বাস খুব বড় খবরই নয় শুধু ; হয়তো বিরাট রূপান্তরের জবর সংকেতও বটে !

বঙ্গোপসাগরে
আন্দামান-নিকোবরের অবস্থিতি
মাইল 0 ১00 ২00 ৪00 মাইল
ভারত
বাংলাদেশ
কলিকাতা
ব্রহ্মদেশ
রেঙ্গুন
পোর্টব্লেয়ার
শ্রীলঙ্কা
পূঃ

৯৩°
৯৪°
ল্যাণ্ডফল দ্বীপ
নারকোনডাম
দ্বীপ
পোর্ট কর্নওয়ালিস
ডিগলীপুর
নর্থ আন্দামান
স্যাডেল পীক
উ:
মায়াবন্দর
মিডল
আন্দামান
রঙ্গত
বেতাপুর
বকুলতলা
কৌশল্যানগর
নেবুতলা
রঙ্গত উ: সা:
শবরী
হামফ্রে প্রণালী
বারাটাঙ্গা দ্বীপ
ব্যারেন দ্বীপ
১২°
উ:
হ্যাভলক দ্বীপ
সাউথ
আন্দামান
চিরকাটাঙ্গ
নীল দ্বীপ
উইমবার্লিগঞ্জ
মংগলুটন
পোর্ট ব্লেয়ার
কালিকট
চিরিয়াটাপু
রাটল্যাণ্ড দ্বীপ
লিটল
আন্দামান
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ
আন্দামান ট্রাঙ্ক রোড
মাইল 0 20 40 ৬০ মাইল
৯৩° পূ:
৯৪°

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

মাইল 0 ২0 ৪0 মাইল

৯৩° ৯৪°
১0° ১0°
উ:

টাটপ
মুস
কারনিকোবর দ্বীপ
মালাক্কা
কাকানা
বাট্টি মালভ দ্বীপ
(শমপেনদের বসতি)
পারুবত দ্বীপ
চৌরা দ্বীপ
তেরেসা দ্বীপ
কামোর্টা দ্বীপ
নিনকোট দ্বীপ
৮° উ:
৮°
নানকৌরী দ্বীপ
কাচাল দ্বীপ
ব ঙ্গো প সা গ র
(শমপেনদের বসতি)
পিলোমিলো দ্বীপ
(শমপেনদের বসতি)
লিট্‌ল নিকোবর দ্বীপ
কণ্ডুল দ্বীপ
লাফুল
প্রাক্তন সৈনিক সেটেলারদের এলাকা
গ্রেট নিকোবর দ্বীপ
ক্যাম্পবেল উ: সা:
পিগম্যালিয়ন পয়েন্ট
৯৩° পূ: ৯৪°

রূপান্তরের পথে
লিট্‌ল আন্দামান
(স্কেল অনুযায়ী নয়)
বামলি ক্রীক্
উঃ
নালা
ইক্‌তি উপসাগর
জ্যাকসন ক্রীক্
রোড নং ২
ভুগঙ্গ ক্রীক্
নালা
প্রস্তাবিত চিনি কল
বাঙ্গালী উদ্বাস্তু এলাকা
প্রস্তাবিত ম্যাচ ফ্যাক্টরী
বাটলার উপসাগর
জলপ্রপাত (১)
টিলা এলাকা
নালা
নালা
নিকোবরীদের নূতন বসতি
দক্ষিণ উপসাগর
সঙ্কেত
জলাভূমি
নারিকেল চাষ
আর. আর, ও. কলোনী
স্কুল
হাসপাতাল, পোষ্ট অফিস, বাজার
প্রশাসনিক অফিস, স্টাফ কোয়ার্টার
পি ডবলুডির স্টোর

ভাইপার দ্বীপে পরিত্যক্ত ফাঁসীঘর
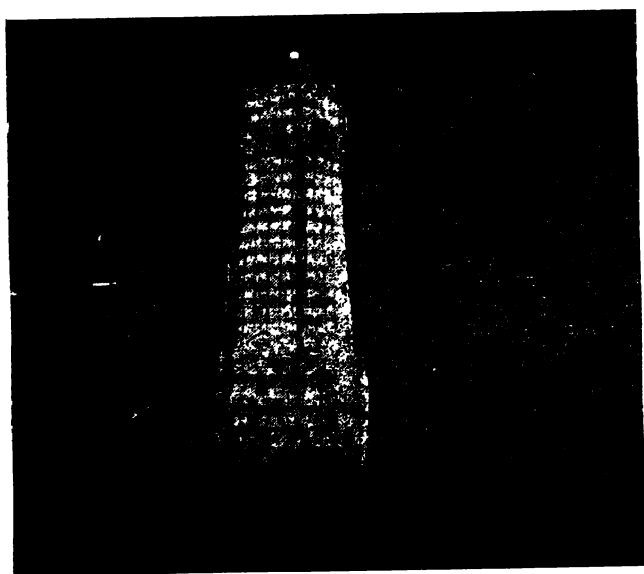
এবারডিন বাজারের মাঝখানে "ক্লক টাওয়ার" এবং 'ওয়ার মেমরিয়াল
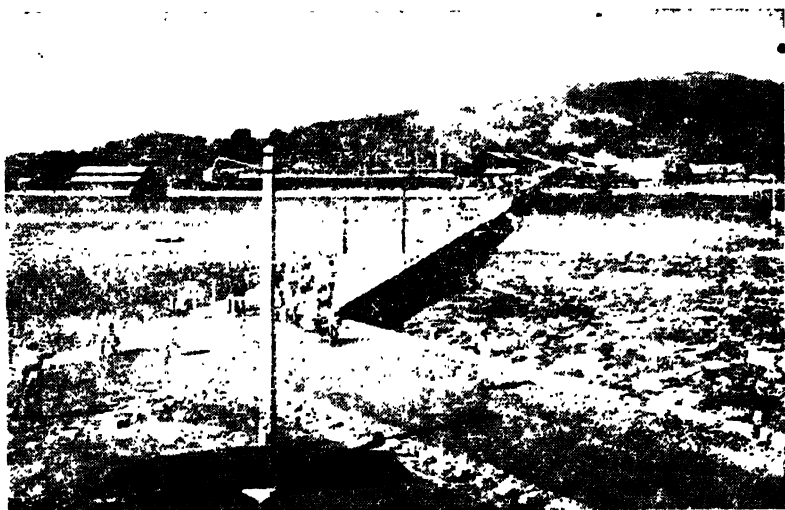
চ্যাথাম জেটিতে যাবার পথ
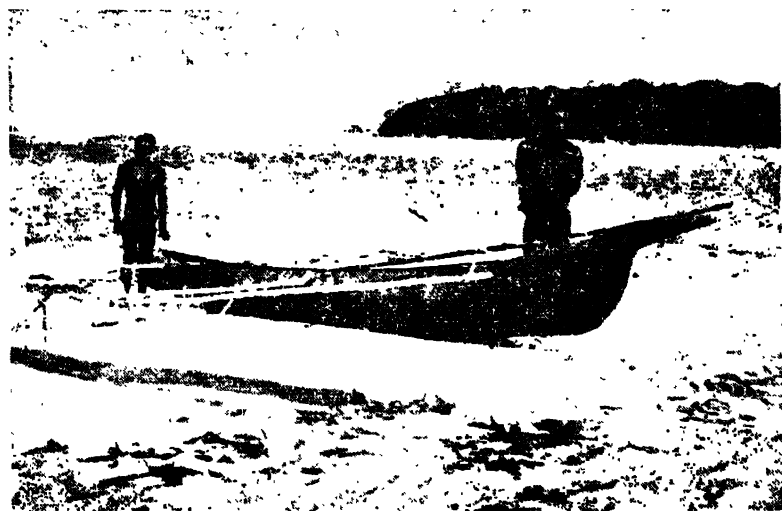
আদিম মানুষ ওঙ্গে ও শমপেনদের সমুদ্রে বিচরণের নৌকা (ক্যানু)
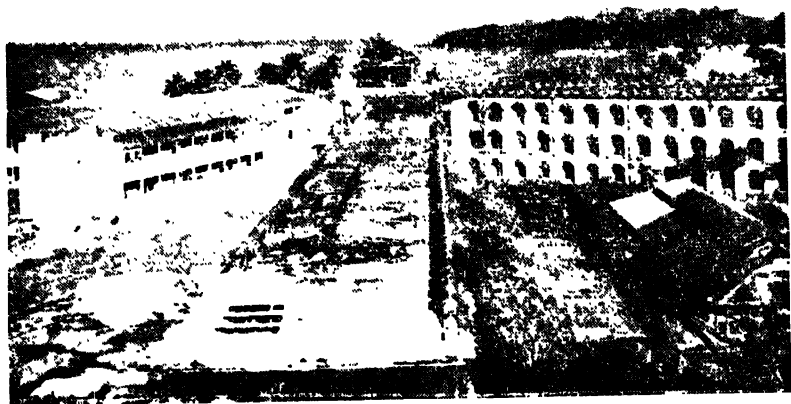
সেলুলার জেল
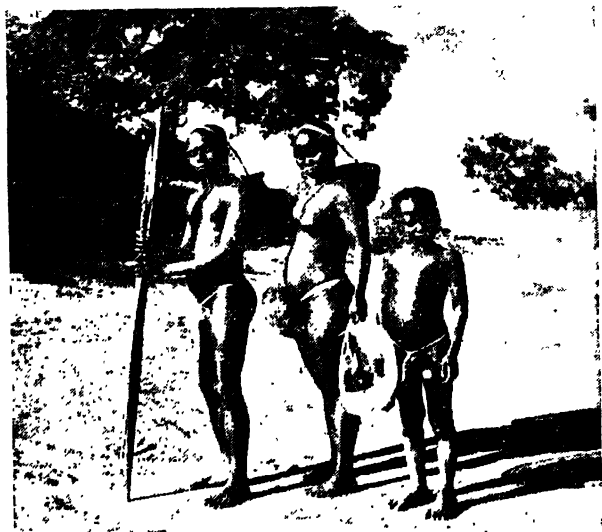
লিটল আন্দামানের একটি ওঙ্গে পরিবার

॥ এক ॥

বঙ্গোপসাগরের বুকে আন্দামান নিকোবরের ভৌগোলিক অবস্থানের দিকে একবার নজর ফেরান। ঐ যে ছোট ছোট দ্বীপগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সাকুল্য বিস্তৃতি উত্তর দক্ষিণে মাত্র ৭২৫ কি. মিটার ঃ ৮২৯৩ বর্গ কি. মি. স্থান জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ২০৪টি ছোট বড় দ্বীপ নিয়ে আন্দামান, আর ১৯টি দ্বীপ নিয়ে নিকোবর দ্বীপমালা। যে কোন দ্বীপ থেকে উত্তর-দক্ষিণ, পূব-পশ্চিম যে দিকেই যান দশ মাইলের মধ্যে সাগরের জল অঞ্জলি ভরে তুলে নিতে পারবেন। একেবারে উত্তরে ল্যাণ্ড-ফল দ্বীপ ছোট ছোট কয়েকটি উপগ্রহ পাশে নিয়ে মাথা তুলেছে। তারপর নর্থ মিডল ও সাউথ আন্দামান। পাশে পাশে ইনটারভিউ, বারাটাঙ্গ, হ্যাভলক, রাটল্যাণ্ড টারমুঙ্গলী ও আরো একরাশ ছোট দ্বীপ। সম্প্রতি নাকি আরো কিছু নতুন দ্বীপ হিসাবে ধরা পড়েছে। এবার ৬৪ কি. মি. দক্ষিণে নেমে আসুন, লিটল আন্দামানের সাক্ষাৎ পাবেন। আরো দক্ষিণে নামুন পোর্টব্লেয়ার থেকে প্রায় ২০০ কি.মি. গেলে কার নিকোবর মিলবে। কার নিকোবর ও গ্রেট নিকোবরের মাঝখানে ছিটেফোটা ১৭টি দ্বীপ। আন্দামানের সঙ্গে নিকোবরের ছেদ ঘটিয়েছে টেন ডিগ্রী চ্যানেল; ৪০০ ফ্যাদম গভীর। গ্রেট নিকোবর ও সুমাত্রার মাঝখানের গ্রেট চ্যানেলের গভীরতা ৭৫০ ফ্যাদম। উভয়ের দূরত্ব মাত্র ৮০ মাইল (প্রায় ১২৯ কি.মি)।

সংখ্যার হিসাবে নগণ্য নয়. কিন্তু অধিকাংশ দ্বীপেই মানুষ নেই। আন্দামানের মাত্র ২৬টি দ্বীপে ও নিকোবরের ১২টি দ্বীপে লোকবসতি রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আরো স্বল্প দ্বীপে লোকের বাস ছিল। ক্ষয়িষ্ণু আদিম মানুষ, পুরাতন কয়েদীর বংশধর লোকাল বর্ণ,

মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী, বৃটিশ কর্মচারী এবং গোরা ও ভারতীয় সৈনিক থাকতো এখানে। মাঝে মাঝে এসে উপস্থিত হতো সেলুলার জেলের রাজনৈতিক ও সমাজবিরোধী বন্দী। তারো আগে, দু'শ বছর আগে, দ্বীপগুলি ছিল সম্পূর্ণ আদিম মানুষের বাসভূমি। স্বাধীনতার পর বহু বাঙ্গালী উদ্ব.স্ত পরিবার ঘর বেঁধেছিল নতুন নতুন দ্বীপে ও পুরাতন দ্বীপের জনবিরল স্থানে। বিভিন্ন রাজ্যের ব্যবসায়ী কুলিকামিন সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকের সংখ্যাও বহুগুণ বেড়ে উঠেছে। গ্রেট নিকোবরের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বসত দেওয়া হচ্ছে সকল রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত জোয়ানদের। পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে আন্দামান নিকোবরে। এখন গোটা ভারতের দৃষ্টি এই ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের দিকে।

ভূবিস্থার বিশেষজ্ঞগণের অভিমত আন্দামান নিকোবরের নাড়ির সম্পর্ক রয়েছে বর্মার আরাকান ইয়োমা এবং ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা ও যাভার সঙ্গে। গিরিরাজ হিমালয় পশ্চিম ও পূবে শৈলমালার বাহু প্রসারিত করে দিয়েছেন। পশ্চিম এশিয়ার পার্শিয়ান লুপ তারই প্রকাশ। পূবে আত্মপ্রকাশ করেছে আরাকান আন্দামান নিকোবর সুমাত্রা, যাভা। এই কারণেই আন্দামান শৈলময়। উপত্যকার পরিমাণ কম, পাহাড় বেশী। পাহাড়গুলো অবশ্য এত ছোট যে একে টিলা বলাই সঙ্গত। পূব উপকূলের পাহাড় কিছুটা খাড়া, পশ্চিম উপকূল অপেক্ষাকৃত ঢালু। আড়াই হাজার ফিটের বেশী কোথাও কোন উঁচু চূড়া নেই। নর্থ আন্দামানের স্যাডল পিকই সর্বোচ্চ। পশ্চিম উপকূল বরাবর চলুঙ্গা পাহাড় শ্রেণী ; পূব উপকূলে হ্যারিয়েট পাহাড় বারাটাঙ্গ পাহাড়ের বুক চিরে নর্থ আন্দামানে গিয়ে পৌঁচেছে।

আন্দামানে কোন হ্রদ নেই, কোন প্রবহমান নদী নেই। ছোট সংকীর্ণ জলপ্রবাহ কোন কোন অঞ্চলে দেখা যায় প্রবল বৃষ্টির পরে। বারো মাস প্রবাহ আছে এমন নদীর কোন সন্ধান মিলেনি। মিডল

আন্দামানের হুটো নদী বাতাপুর ও বামলাঙ্গটা। গয়ার ফল্গু নদীর মিনি সংস্করণ বলা চলে। মাটির তলায় অগভীর কুয়ো খুঁড়লে যে জল পাওয়া যায় তা নোনা নয়। মিঠে জল বলে সাধারণ লোক পান করে।

বিষুব রেখার উত্তরে ৬° ও ১৪° ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে আন্দামান নিকোবরের অবস্থিতি ; ৯২° ও ৯৫° দ্রাঘিমার মধ্যে বিস্তৃতি। গোটা এলাকায় গ্রীষ্মমণ্ডলের আবহাওয়া। ঝড় ও ঘূর্ণিঝড় কখনও বেশী কখনও কম। চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এবং আশ্বিন কার্তিক অগ্রহায়ণে ঝড় বেশী, অন্যান্য মাসে কম। বৃষ্টিহীন মাস দক্ষিণ আন্দামানে বড় একটা পাবেন না। উত্তর আন্দামানের দিকে এগিয়ে যান বৃষ্টিপাত ক্রমশ কমবে। দক্ষিণ আন্দামান দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব উভয় মৌসুমী বায়ুর ঝাপটা পায়। বছর জুড়েই তাই বৃষ্টি। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু যখন বইতে থাকে তখন দিনের পর দিন একটানা বৃষ্টি। দেখতে দেখতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আসে। কখন ঘনঘোর বরষা, কখনও শরতের ঝুপঝাপ বারিপাত। মৌসুমী বায়ু যখন দিক পরিবর্তন করে, দক্ষিণা বাতাস যখন বন্ধ হয় উত্তর বায়ু বইতে থাকে, ঐ সময় ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব উঠে। মেঘে মেঘে সংঘর্ষ লাগে। বিদ্যুৎ চমকায়। বনভূমি মর্মরিত হয়ে উঠে। সাগরের জল উথালপাথাল করে। শিশুরা মায়ের বুক জড়িয়ে ধরে। সাগরের বুকে জাহাজ দুলে উঠে, কেঁপে উঠে, শিউরে উঠে।

আন্দামান যদিও গ্রীষ্মমণ্ডলে, সূর্যদেবের দহন তাপ এখানে গা সওয়া। সমুদ্রের বিরাম বিহীন সমীরণ আবহাওয়ায় সমতা বিনষ্ট হতে দেয়নি। শীত মোটে নেই, গরমও বেশী নয়। বছরে গড় তাপ ৭৪° হ'তে ৮৭° ফারেনহিটের মধ্যে ওঠানামা করে। অঘ্রাণের মাঝামাঝি হতে ফাল্গুনের মাঝামাঝি ঠাণ্ডা হাওয়া ; ফাল্গুনের শেষ থেকে বৈশাখের শেষ পর্যন্ত গরম বাতাস। জ্যৈষ্ঠের স্থরু থেকে আশ্বিনের মাঝামাঝি দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীর প্রভাব।

আশ্বিনের শেষ হ'তে অঘ্রাণের প্রথম পর্যন্ত চলে বায়ুর দিক বদলের পালা। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে পোর্ট ব্লেয়ারে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি, ৭০০ মি.লি.। শ্রাবণ-ভাদ্রে লং আয়ল্যাণ্ড ও মায়াবন্দরে বৃষ্টিপাত বেশী। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণ ধরে মায়াবন্দরে গড়ে ৬০০ হ'তে ৮০০ মিলি লিটার বৃষ্টিপাত হয়। হাটবেতে অঘ্রাণে বৃষ্টিপাত ৬০০ মিলি লিটার। কার নিকোবরে আশ্বিন-কার্তিকে বৃষ্টিপাত ৪৫০ মিলি লিটার কিন্তু আষাঢ়-শ্রাবণে ৩০০ মিলি লিটারের বেশী হয় না। পোর্টব্লেয়ারে আষাঢ়-শ্রাবণে বাতাসের গতিবেগ থাকে ঘণ্টায় ২১।২২ কি. মি., পৌষ-মাঘে ৫।৭ কি. মি.। বছর জুড়ে আকাশময় এখানে মেঘের ঘনঘটা। উপত্যকার মাটি তাই বড় বেশী স্যাঁতসেঁতে ও জবজবে। মাটির রং ফিকে হলুদ, আধপোড়া ইটের মত। গড়ন কর্দমাক্ত। বিশেষজ্ঞদের অভিমত সিলিকার পরিমাণ বেশী। সুন্দরবনের মত খাড়ি ও উপকূলের মাটি লবণাক্ত। পাহাড়ী দেশ সমতল ভাগ কম। অতিরিক্ত বৃষ্টির দরুণ ভূমিক্ষয় বেশী।

আন্দামান নিকোবর শৈলময় কিন্তু নিরাভরণ নয়। পাথরের বাহুল্য আছে, রুক্ষতা নেই। উপত্যকায় মাটি আছে তা শুষ্ক নয়, আর্দ্র। সমুদ্রের অগণিত অনুপ্রবেশ আছে, কিন্তু নদী নেই। এই দ্বীপপুঞ্জ প্রকৃতির এক বিচিত্র লীলাভূমি। ভারতের একটি বড় ল্যাবরেটরী। বহু বিষয় জানবার আছে এখানে। এখানকার একাধিক আদিবাসী গোষ্ঠীর জীবনেতিহাসের উৎস সন্ধান করতে অনেক নৃতত্ত্ববিদ ও মিশনারী হিমশিম খেয়েছেন। এখনও সে চেষ্টার বিরাম ঘটেনি। আন্দামান নিকোবর সাগরের প্রবাল রিফ, ঝিনুক, শঙ্খ, কাঁকড়া ও মাছ স্টাডির বিষয়। অরণ্যে অর্থকরী কাঠ, ঔষধি-লতাগুল্ম গবেষণার বিরাট ক্ষেত্র। জাতি ও বর্ণ বিভেদ, ধর্ম বিভেদ, ভাষাবিভেদের বেড়াজাল অপসরণ করে লোকালবর্ণ সমাজ কিভাবে ক্রমশ গড়ে উঠেছে উৎসুক সমাজবিজ্ঞানীর পক্ষে সেটা কম আকর্ষণীয় বিষয় নয়। রাবার চাষ, রেড পামওয়েলের চাষ, কমলা

মোসাম্বী, লবঙ্গ, এলাচ, গোলমরিচ, জায়ফল ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য মশলা চাষ কতটা সাফল্যজনকভাবে করা যেতে পারে সেটা কৃষি ও বন বিভাগের বিশেষজ্ঞদের স্টাডির বস্তু। অর্থকরী কোন ধাতু আছে কিনা ভূতত্ত্ববিদের অনুসন্ধানের বিষয়। ইংরেজ কি কি উন্নয়ন কাজ করেছে, কোন ধারায় প্রশাসন চালিয়েছে, কয়েদীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছে তা গবেষণার বিষয়। সাড়ে তিন বছরে জাপানের অবদান কতটুকু তার বিচারও কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এত জানবার আছে আন্দামান-নিকোবরে। এ যেন একটি খুদে ভারতবর্ষ।

মাত্র আড়াইশ' তিনশ' বছর আগে আন্দামান নিকোবরের নাম শুনলে দেশবিদেশের লোক শিউরে উঠতো। শুধু আদিম মানুষের দেশ নয়, জলদস্যুদের নিরাপদ ঘাঁটি ছিল এটি। আতঙ্ক, ভয়, আজগুবি কাহিনী ছড়ানো ছিল দ্বীপমালার গায়ে গায়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে এ-দ্বীপের তমসাবৃত যবনিকার উন্মোচন ঘটেনি। এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের ঐতিহাসিক পটভূমি খুবই সংক্ষিপ্ত। যেখানে সভ্যমানুষের অস্তিত্ব ছিল না তার ধারাবাহিক ইতিহাস বা ঘটনা প্রবাহের কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া সম্ভব নয়। বৃটিশের অধীনে আসবার পর চিফ্ কমিশনারদের শাসন ধারার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট মাত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে। বাণিজ্যপোতের নাবিকদের লোকমুখে শুনা কাহিনী ও অভিজ্ঞতার বিষয় কোন কোন পুঁথির পাতায় এখানে সেখানে উল্লিখিত আছে। জলদস্যুদের অতর্কিত আক্রমণ ও লুটপাটের কথা অতিরঞ্জিত করে শুনান হতো। ১৭৮৮ সালে এই দ্বীপপুঞ্জ বৃটিশের দখলে আসে। এ-সময়ের আগের কোন ইতিহাস নেই।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের সামুদ্রিক বাণিজ্য-পথের মুখে আন্দামান নিকোবরের অবস্থিতি। জেরেমি তাঁর ইন্দোচীনের ভূগোল বইতে গ্রেট আন্দামানকে 'বাজাকাটা' ও লিটল্

আন্দামানকে 'খলিন' নামে অভিহিত করেছেন। দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমির (Claude Ptolemy) বিবরণেও আন্দামানকে ঐ একই নামে চিহ্নিত করা আছে। তিনি স্পষ্টভাবেই লিখে গেছেন এখানকার সকল বাসিন্দাই আদিম মানুষ। এদের দেহ নগ্ন; তিনি নাম দেন 'আগমাটে' (Agmatae)। এখানে যে প্রচুর ঝিনুক ও শঙ্খ পাওয়া যায় সেকথা তিনিও উল্লেখ করেছেন। 'বাজাকাটা' 'খলিন' 'আগমাটে' এইসব উদ্ভট নামকরণের সূত্র কি তা আমার জানা নেই।

আরব পর্যটকগণ ভারত ও চীন সম্পর্কে উৎসুক হয়ে উঠেন নবম শতাব্দীতে। চীনদেশের বৌদ্ধভিক্ষু জলপথ ও স্থলপথে ভারতে আসবার টানে বেরিয়ে পড়েন। তাঁদের পথের বিবরণীর যে নোট রয়েছে তাতে আন্দামান নিকোবর স্থান পেয়েছে। মার্কোপোলো (Marco Polo, 1286 A. D.), ফ্রিয়ার অরডোরিক (Friar Ordoric 1322 A. D.), নিকোলো কোণ্টি (Nicolo Conti 1430 A. D.)—এঁরা সকলেই একটি কথা উল্লেখ করেছেন—এই দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দারা আদিম মানুষ। তারা বর্বর ও কদাকার। সভ্য মানুষকে ধরলে তার মাংস খেয়ে ফেলে।

অপরের মুখ থেকে শুনে এঁদের বিশ্বাস জন্মেছিল আন্দামান দ্বীপে প্রচুর রত্ন আছে। রত্নদ্বীপ (Island of Gold) বলে উল্লেখ করে গেছেন। রত্নের সন্ধানে জীবন বিপন্ন করেও পর্যটক বণিক ও নাবিক এখানে বার বার এসেছেন। মালয় শ্যাম ইন্দোচীনে আন্দামান সম্পর্কে যেসব উপকথা বহুল প্রচলিত ছিল তা থেকে এঁরা নোটে লিপিবদ্ধ করতেন। পোর্টম্যান (M. V. Portman) তাঁর A History of our Relations with the Andamanese গ্রন্থে লিখেছেন—মালয়ের জলদস্যুগণ আন্দামানকে দস্যুতা চালাবার প্রধান ঘাঁটি বানিয়েছিল। অতর্কিতে বাণিজ্যপোত এখান থেকে আক্রমণ করা সহজ ছিল। তাছাড়া আদিম মানুষদের ধরে নিয়ে শ্যাম, কম্বোডিয়া

ইন্দোচীনে দাসরূপে বিক্রী করা সুবিধাজনক ছিল। ঝড় তুফান ঘূর্ণিবায়ু ও আদিম মানুষের বর্বরতার রোমাঞ্চকর কাহিনী জলদস্যুরা প্রচার করায় এটা ভীতির দ্বীপ হয়ে উঠেছিল। আর্জ পর্যন্ত রত্নের কিন্তু কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

অনেকের ধারণা 'হনুমান' নাম রূপান্তরিত হয়ে আন্দামান হয়েছে। প্রচলিত অনুমান হনুমানের আদি নিবাস এই দ্বীপ। রামায়ণে নাকি এই রকম ইঙ্গিত রয়েছে। মালয়বাসীরা হনুমানকে 'হণ্ডুমান' বলে। হণ্ডুমান থেকে আন্দামান নামের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নয়।

প্রথম দিকে এ-দ্বীপের প্রতি ইংরেজ কোন নজর দেয়নি। ১৭৮৮ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস লেফটন্যান্ট ব্লেয়ার ও লেফটন্যান্ট কোলব্রুককে প্রাথমিক অনুসন্ধানের জন্য এই অঞ্চলে পাঠান। মালয় জলদস্যুর একটানা বিরক্তিকর কাযকলাপ, আন্দামান সমুদ্রে প্রায়ই জাহাজডুবি, নাবিকদের চরম দুর্গতি লর্ড কর্ণওয়ালিসকে চিন্তিত করে তুলে। পেনাল কলোনা গড়ে তোলার কথা তখন মাথায় আসে। অনুকুল রিপোর্টও এল। প্রথম আস্তানা স্থাপিত হলো দক্ষিণ আন্দামানের ছোট্ট একটি দ্বীপে। নামহীন দ্বীপের নামকরণ হলো চ্যাথাম। আজো এই নামেই পরিচিত। গ্রেট আন্দামানের উত্তরপূর্ব সীমান্তে এখন যেটা 'এরিয়াল বে' নামে পরিচিত সেটাকেই সেটেলমেন্টের পক্ষে অপেক্ষাকৃত ভাল জায়গা বলে প্রথমে মনে করা হয়েছিল। প্রধান কারণ ভারত সরকারের তদানীন্তন রাজধানী কলিকাতার এটা ছিল অনেকটা কাছে। পোর্টটিও স্বাভাবিক সুন্দর ও উপযুক্ত ছিল। নামকরণও করা হয় পোর্ট কর্ণওয়ালিস। দুঃখের বিষয় জলবায়ু তখন কারো সহ্য হলো না, অনেকের মৃত্যু ঘটলো। ফলে ১৭৯২ সালে সকল বসতি তুলে এনে পুনরায় চ্যাথাম দ্বীপের গায়ে বড় দ্বীপটায় বসানো হলো। এই দ্বীপটিই এখন পোর্ট ব্লেয়ার নামে পরিচিত এবং আন্দামান নিকোবরের হেড কোয়ার্টার। সে সময়

লোক আনা হয়েছিল নগণ্য। বেশী লোক বসাবার কোন পরিকল্পনাও তখন নেওয়া হয়নি। এই ভাবে প্রায় ৬০ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। ব্রহ্মদেশের সঙ্গে বৃটিশের যুদ্ধ বাধে ১৮২৫ সালে। এই যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে বৃটিশ নৌবহর ১৮২৪ সালে প্রথম ঘাঁটি স্থাপন করে পোর্ট ব্লেয়ারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও এখানকার নৌবহর ছিল ছোট ও দুর্বল। এই কারণেই জাপান অতিসহজেই বিনা যুদ্ধে দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নিয়েছিল।

১৮৩৭ সালে ভূতত্ত্ববিদ ডঃ হেলফার (Dr. Helfer) স্বর্ণের অনুসন্ধান চালাতে পোর্ট ব্লেয়ারে আসেন এবং দ্বীপে দ্বীপে ঘুরতে থাকেন। আদিম অধিবাসীদের হাতে তিনি নিহত হন।

গভীর অরণ্যে ঢাকা বন্য আদিম মানুষের দেশ, জলদস্যুর গোপন ঘাটি, আন্দামান সমুদ্রে ইংরেজ সৈন্য ভর্তি দুইটি বিস্ময়কর জাহাজ-ডুবি বৃটিশ সরকারের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠলো। বঙ্গোপসাগরের বুকে সবুজ এই দ্বীপগুলি যেন পায়ে কাঁটা হয়ে বিধে রইল। গুটি কয়েক লোক নিয়ে পোর্ট ব্লেয়ারে দখলীসত্ত্ব বজায় রাখা ছাড়া কোন স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবপর হয়নি। ইংরেজ ব্যবসায়ী জাত। যে জায়গা থেকে কোন মুনাফা আসে না এমন দায় ঘাড়ে নিয়ে আর কতদিন বসে থাকা যায়! এমন সময় ১৮৫৭ সালে উত্তর ভারত জুড়ে সিপাই বিদ্রোহ ঘটে গেল। বিভিন্ন প্রদেশের বহু সিপাই বন্দী হয়। এত দুর্ধর্ষ সিপাইদের কারারুদ্ধ করে রাখার মত নিরাপদ স্থান কোথায় মেনল্যাণ্ডে! আন্দামানে পেনাল কলোনী গড়ে তোলার কথা মাথায় এসেছিল প্রথম দিকে। এতদিনে সেই চিন্তা বাস্তবে রূপায়নের পথ পেল।

এই সালের শেষ দিকে দুইশত বন্দী সিপাই নিয়ে ডাঃ জে, পি, ওয়াকার (Dr. J. P. Walker) পোর্ট ব্লেয়ারে এসে উপস্থিত হন। পাঁচ মাসের মধ্যে বন্দীর সংখ্যা বেড়ে হয় ৭৭৩ জন। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সকলে বিদ্রোহী। ডাঃ ওয়াকারের অমানুষিক

অত্যাচার ও কঠোর শাসন এরা মাথা পেতে নেয়নি। তিন মাস অতিবাহিত হতে-না হতেই ২২৮ জন জঙ্গলে পালিয়ে গেল। অচেনা জায়গা, পথঘাট নেই, অসংখ্য সমুদ্রের খাড়ি, গহন অরণ্য। অনাহারে জলকষ্টে জীবন বিপন্ন প্রায়। এই সময় আন্দামানিজদের বিষাক্ত তীরে অধিকাংশই জীবন হারায়। ওয়াকারের অনুচর ৮৮ জন পলাতককে ধরে এনে ফাঁসি দেয়। সোয়া তু'শ বিদ্রোহী সিপাই আন্দামানের মাটিতে এইভাবে প্রথম বলি হয়।

মেনল্যাণ্ড থেকে হঠাৎ এত লোকের আগমনে আন্দামানিজরা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তাদের দেশ বেদখল হতে চলেছে। এই ষড়যন্ত্র নীরবে বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। ছোটখাটো অতর্কিত আক্রমণ তাদের প্রতিবাদের ইঙ্গিত বহন করে। অবশেষে ১৮৫৯ সালের মে মাসে সংঘবদ্ধ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। প্রায় ১৫০০ আদিবাসী আন্দামানিজ পোর্টব্লেয়ার শহরের আশেপাশের অরণ্যে লুকিয়ে জমায়েত হয়। ১৪ই মে রাশি রাশি তীরধনুক ও বর্শা নিয়ে এবারডিন আক্রমণ করে। আন্দামানিজদের সঙ্গে এই যুদ্ধ Battle of Aberdein নামে খ্যাত। আদিবাসীদের পরাজয় ঘটে, অনেকে নিহত হয়।

বিপর্যয়ের একটি প্রধান কারণ তুধনাথ তেওয়ারীর সতর্কতা মূলক সংবাদ প্রদান। জঙ্গলে পলাতক সিপাইদের মধ্যে একমাত্র তুধনাথ জীবিত ছিল। নগ্নদেহে লালমাটি গায়ে মেখে আন্দামানিজদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। ওদের ভাষাও সে আয়ত্ত করেছিল। সংঘবদ্ধ আক্রমণের শলাপরামর্শ জানতে পেরে তুধনাথ ১২ই মে একান্ত নিশ্চুপে দল ত্যাগ করে চলে আসে শহরে। আক্রমণ পরিকল্পনার পূর্ণ বিবরণ ডাঃ ওয়াকারকে জানিয়ে দেয়। এই সংবাদ সময় মত পাওয়ায় বহু লোকের জীবন রক্ষা পায়। পুরস্কার হিসাবে তুধনাথের পলায়নের অপরাধ মকুব হয়ে যায়।

সিপাই বিদ্রোহের পরে একটানা ১৪ বছর বন্দী শিবিরের

ভারপ্রাপ্ত অফিসার প্রশাসনের কাজ চালিয়েছেন। ডাঃ ওয়াকারের পরে কর্ণেল আই, সি, হটন (Colonel I. C. Haughton) ১৮৫৯ সালে দায়িত্বভার নিয়ে আসেন। হটন সুবিবেচক ও ভদ্র ছিলেন। ক্ষুব্ধ বন্দীদের ক্ষোভ তাঁর আচরণে প্রশমিত হয়ে আসে। আন্দামানিজদের পরাজয়ের গ্লানি, অসন্তোষ ও সন্দেহ দূর করার দিকে তিনি মন দেন। সরাসরি ভারত সরকারের হাতে না রেখে ১৮৬১ সালে এই দ্বীপপুঞ্জ ব্রহ্মদেশের চিফ্ কমিশনারের শাসনাধীনে দেওয়া হয়। কর্ণেল টাইটলার (Colonel Tytler) ১৮৬২ সালে মাত্র এক বছরের জন্য আসেন। পোর্ট ব্লেয়ারে তখন কয়েক হাজার বন্দী। সাউথ আন্দামানের জঙ্গল সাফাইএর কাজে টাইটলার এদের নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েন। এক বছরে প্রায় দেড়শ' একর জমি পরিষ্কার করে চাষযোগ্য করে তুলেন। আন্দামান দ্বীপে শস্য জন্মাবার এই প্রথম প্রচেষ্টা। বছর শেষে জেনারাল ম্যান (General Mann) এসে দায়িত্ব নিলেন। টাইটলারের আরব্ধ কাজ তিনি জোরকদমে চালু রাখেন। কয়েদীর সংখ্যা ৮৮৭৩; যথেষ্ট তাঁর লোকবল। তিন হাজার একর জঙ্গল ও জলা পরিষ্কার হলো। রাস্তা তৈরী হলো। পশুর মত খাটানো হলো বন্দীদের। তারা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়লো। ৮৭৬ একর জমি বন্দীদের মধ্যেই বিলি বন্দোবস্ত করে দিয়ে চাষ কাজের সূত্রপাত করা হলো। এই সময় লর্ড নেপিয়র পোর্টব্লেয়ার পরিদর্শন করেন। আদিম বাসিন্দাদের জন্য একটি হোম স্থাপনের পরামর্শ দেন। ভারত সরকার অর্থ মঞ্জুরও করেন। আন্দামানিজদের সঙ্গে সভ্য মানুষের সম্পর্ক মধুর করে তোলাই ছিল হোম স্থাপনের উদ্দেশ্য। ফল কিন্তু সম্পূর্ণ অশুভ হয়। সভ্য মানুষের সংশ্রবে এসে তারা কেবল ক্ষয়িষ্ণু হয়নি, আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে।

১৮৭২ সালে আন্দামানের প্রধান প্রশাসকের পদকে চিফ্ কমিশনারে উন্নীত করা হয়। এই পদে প্রথম এলেন জেনেরাল স্যার

ডোনাল্ড মার্টিন স্টিওয়ার্ড। ১৮৭২ হতে ১৯৪২ পর্যন্ত ৭০ বছরে ১৪ জন চিফ্ কমিশনার আন্দামানে এসেছেন। সামরিক বাহিনীর অফিসারদেরই প্রধানত এখানে পাঠানো হয়েছে। এদের প্রশাসনের ধারা ছিল একই রকম। মিলিটারি শাসন। বৈচিত্র্যহীন জীবন। স্টিওয়ার্ডের সময়ই শের আলী নামে এক পাঠান বন্দীর হাতে ভাইসরয় লর্ড মেয়ো হোপটাউন পরিদর্শন কালে নিহত হন। কর্ণেল ক্যাডেল এসে প্রথম বনবিভাগ খোলেন। অরণ্যময় আন্দামানে এ-যাবৎ বনবিভাগ ছিল না। স্যার রিচার্ড টেম্পলের সময় বিখ্যাত সেলুলার জেলের কাজ আরম্ভ হয়। ফোয়েনিক্স বের ডকইয়ার্ড ও ওয়ার্কশপের কলেবর তিনি বৃদ্ধি করেন। ১৯০১ সালে আন্দামানে প্রথম লোক গণনা হয়। টেম্পল নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজ সম্পন্ন করেন। আদিবাসীদের অনেক তথ্য এই লোক গণনায় জানা যায়। নারিকেল গাছের উপযুক্ত ক্ষেত্র আন্দামান নিকোবর। এতদিন পর্যন্ত এদিকে কোন প্রশাসক নজরই দেননি। কর্ণেল ডগলাস কয়েক হাজার একর জমিতে নারিকেল গাছ লাগাবার প্রকল্প গ্রহণ করেন। মেনল্যাণ্ডের খুনী কয়েদী এনে দ্বীপের লোকবৃদ্ধির প্রচেষ্টায় তিনি আপত্তি জানান। কিন্তু কর্ণেল বিডন এসে ১৪০০ কেরলের মালাবারবাসী মুসলমান মোপলা বিদ্রোহী বন্দীকে আন্দামানে বসত দেন। কিছু সংখ্যক দুর্ধর্ষ পাঞ্জাবী কয়েদীও গ্রহণ করেন। নারিকেল গাছ লাগানোর কার্যসূচী সরকারি তত্ত্বাবধানে না রেখে ব্যক্তিগত মালিকানায় বিলি করা সুরু করেন। কর্ণেল ফেরার এসে কয়েক হাজার পুরাতন কয়েদীদের বাস্তু জমি বিলি করে পুনর্বাসন ঘটান। বন্দীরা নিজ চেষ্টায় ঘরদোর তুলে গৃহজীবনে ব্রতী হয়। জমি পাবার আশায় বহু কয়েদী জেলের মেয়াদ শেষে আন্দামানে স্থায়ী-ভাবে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করে। মেনল্যাণ্ডে গিয়ে তাদের স্ত্রীপুত্র নিয়ে আসার অনুমতি দেওয়া হয়। বিবাহযোগ্য কয়েদী নারী পুরুষের মধ্যে বিবাহে উৎসাহ দেওয়ার নীতি গৃহীত হয়।

বছরের পর বছর কয়েদীর ভরণপোষণের দায় সরকারের উপর না রেখে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই ছিল উদ্দেশ্য।

দীর্ঘ মেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ড নিয়ে যেসব কয়েদী এখানে আসতো প্রথমদিকে দশ বছর অতিবাহিত হবার পর তাদের পুনর্বাসন দিবার বিষয় বিবেচনা করে দেখা হতো। ফেরার এই নিয়মের পরিবর্তন ঘটান। কোন বন্দী জেলের নিয়ম কানুন মেনে বশংবদ হয়ে চললে কয়েকমাস পরই কয়েদী পোষাক পরার হাত হতে রেহাই পেতে লাগলো। দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে জেলকর্তৃপক্ষের নির্দেশিত কাজ তাদের দেওয়া হতে লাগলো। নিজেদের আহার পরিধানের দায়দায়িত্ব কয়েদীদের নিজের স্কন্ধে এসে বর্তাল। জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করায় বর্মার অনেক কয়েদীকে এই সময় সেলুলার জেলে পাঠানো হয়।

চিফ্ কমিশনার লেফন্যান্ট কর্ণেল ব্রাউনিং, লেফন্যান্ট কর্ণেল ডগলাস, কর্ণেল বিডন, লেফন্যান্ট কর্ণেল ফেরার, মিঃ স্মিথ, স্যার কসগ্রেভ রাজনীতিক বন্দীদের দাবী ও সংগ্রামের মোকাবিলা করতে বিব্রত হয়ে উঠেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৩৮ হতে ১৯৪২ পর্যন্ত চিফ্ কমিশনার ছিলেন স্যার ওয়াটারফল। জাপানীদের হাতে তিনি বন্দী হন। ১৯৪২ সালের ২৩শে মার্চ হতে ১৯৪৫ সালের ৬ই অক্টোবর পর্যন্ত আন্দামান নিকোবর জাপানের দখলে ছিল। অক্টোবরে চিফ্ কমিশনার হয়ে আসেন মিঃ পেটারসন। ১৯৪৫ হ'তে ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রায় ২ বছর তিনি ছিলেন। ইনিই শেষ বৃটিশ চিফ্ কমিশনার। ১৯৪৭ সালে প্রথম ভারতীয় চিফ্ কমিশনার নিযুক্ত হন শ্রী আই. মজিদ, আই. সি. এস। এখন পর্যন্ত ১৩ জন ভারতীয় চিফ্ কমিশনার এই দ্বীপপুঞ্জে দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। বর্তমান চিফ্ কমিশনারের নাম শ্রী এস. এল্. শর্মা, আই. এ. এস।

আন্দামানের দিকে এখন প্রবল আকর্ষণ। সর্বস্তরে আগ্রহ।

নৃতত্ত্ববিদ আসছেন প্রাচীন আদিবাসীর জীবনধারা গবেষণা করতে ; ভূতত্ত্ববিদ আসছেন খনিজ তৈল বা অন্য রত্নসম্ভারের সন্ধানে ; কৃষিবিদ আসছেন উষ্ণ মণ্ডলের উপযোগী শস্য ফল ও মশলা চাষের সম্ভাবনা দেখতে ; প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞগণ আসছেন ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার বিষয় নিয়ে ; কাষ্ঠ ব্যবসায়ীগণ দুর্গম অরণ্যে ঘুরছেন দারুশিল্পের সন্ধানে। পোর্ট-ব্লেয়ার এখন একটি 'বিউটি স্পষ্ট'। টুরিষ্টদের অতি প্রিয় স্থান। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও পার্লামেন্টের সদস্যদের একটি আকর্ষণীয় ভ্রমণক্ষেত্র আন্দামান। কোন-না-কোন সমস্যা সংক্রান্ত অনুসন্ধান উপলক্ষ্য করে বছরে তাঁরা রাজকীয় মর্যাদায় ঘুরে বেড়িয়ে যান।

ভারতের বিরাট সমুদ্রতট প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আন্দামান-নিকোবরের গুরুত্ব এখন অপরিসীম। অবহেলিত দ্বীপ আজ প্রতিরক্ষায় এক বিরাট ভরসা। একদিকে ভারত মহাসাগর ; আর একদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের মুখ। বিদেশী নৌবহরের গতিবিধির উপর নজর রাখা এবং সুমাত্রা, যাভা, কম্বোডিয়া, ইন্দোচীন, কোরিয়া, চীন ও জাপানের দিকে জাহাজের আনাগোনা পর্যবেক্ষণ করার মত এত সুন্দর স্থান আর নেই। বহুজনের অজ্ঞাত ও সম্পূর্ণ অখ্যাত ভারত মহাসাগরের ছোট্ট দ্বীপ দিয়াগো গার্সিয়া আজ দক্ষিণ এশিয়াবাসীর দুঃস্বপ্ন। বৃটিশের সহযোগিতায় মার্কিন নৌঘাঁটি স্থাপিত হয়েছে এখানে। আন্দামানের গুরুত্ব এই কারণে বহুগুণ বেড়ে উঠেছে।

আদিম মানুষের দেশ আন্দামান নিকোবর ক্রমশ রূপান্তরিত হয়ে হলো কয়েদী নিবাস। এক নতুন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলো 'লোকাল বর্ণ'। স্বাধীনতার মূল্য দিয়ে এল কয়েক হাজার বাঙ্গালী উদ্বাস্তু। গ্রেট নিকোবরের জনমানবহীন অরণ্য মুছে দিয়ে অবসর-প্রাপ্ত জোয়ান বসতবাড়ি তুলছে ও চাষআবাদে মন দিচ্ছে। আজ

ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেতে কোন বাধা-নিষেধের দেউড়ি পেরুতে হয় না। নাগরিকের সর্বত্র অবাধগতি। আন্দামান স্বদেশের অঙ্গ হওয়া সত্বেও বিদেশ যাত্রার মতই প্রস্তুতি নিতে হয়। বসন্তের টিকা নাও, কলেরার ইনজেকশন নাও, ইনটারন্যাশানাল হেলথ্ সার্টিফিকেট সংগ্রহ কর, শিপিং করপোরেশনের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট আবেদন পাঠিয়ে প্যাসেজ ও কেবিন বুক কর, জাহাজ ছাড়ার তারিখ ও সময় জানার জন্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বিজ্ঞাপনের পাতায় নজর রাখ, শিপিং হাউসে গিয়ে টিকিট কাট—এত কাণ্ড করে আন্দামান যাওয়া। বিদেশীদের আন্দামান নিকোবরে প্রবেশের অনুমতি ১৯৪৭ সালের পর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কন্‌কনে শীতের সকাল। খিদিরপুর ২২নং জেটিতে ন'টার মধ্যেই আমরা এসে হাজির হয়েছি। সঙ্গে বড় মেয়ে জামাই—বকুল ও গুরুপদ। 'এম. ভি. আন্দামান' জাহাজ পাশে নোঙর করা। ইংরেজ শাসনের প্রথম আমলে এই জেটি থেকেই ছাড়তো রাজকীয় 'রোমানশিপ' ও 'মহারাজা'। এসব জাহাজ তখন বিদ্রোহী সিপাই, রাজনৈতিক বন্দী ও মারাত্মক খুনী আসামীদের নিয়ে যেত। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল এই ধারা। তখন সাধারণ যাত্রী কেউ যেত না। আজকের জাহাজ বন্দীবহন করে না, তার ডেক সবার জন্য অবারিত। তখনকার দিনে জাহাজের সকল অঙ্গ ছিল মর্মবেদনায় পীড়িত, আজ তার অঙ্গে অঙ্গে আনন্দ ও প্রশান্তি।

তখনও লোকের ভীড় বাড়েনি। 'বাঙ্কের' যাত্রী আমরা। রেলগাড়ীর বর্তমান দ্বিতীয় শ্রেণীর সামিল। থ্রি-টিয়ার স্লিপার নেই, সবই টু-টিয়ার। কেবিনে রিজার্ভেশন চলে, বাঙ্কে চলে না। মেডিকাল 'চেক্-আপ' হবার পর ছুটে গিয়ে সিট দখল করতে হয়। এখানে পোর্টারের দাবী অতিরিক্ত। চেষ্টা করেও পোর্টার বাদ দেওয়া গেল না; লগেজপত্র ছিল কিছু বেশী। লোয়ার ডেকের

আটটি প্রবেশ পথে বাঙ্ক যাত্রীদের জাহাজের পেটের মধ্যে নামতে হয়। শ্রেণীভেদ, জাতিভেদ, মর্যাদাভেদ মুছে ফেলে এখানে সবার রঙে রং মিলিয়ে কাটাতে হবে চার পাঁচটি রাত্রি। আমাদের সহযাত্রী রাঁচির উপজাতি,—কোরাপুট ও মধ্যভারতের মজুর—যারা পাথর ভেঙ্গে, জঙ্গল কেটে গড়ছে আন্দামানের ট্রাঙ্ক রোড, সরকারী কোয়ার্টার, আপিস ও স্কুল ; নানা রাজ্যের জোয়ান—যারা ভারতের প্রতিরক্ষা নিরাপদ রাখতে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে এই সব দ্বীপ থেকে ; পুনর্বাসনপ্রাপ্ত বাঙ্গালী উদ্বাস্তু—যারা আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মেনল্যাণ্ডে সাক্ষাৎ সেরে ফিরে চলেছেন নিজের নতুন বাসভূমিতে ; লোকালবর্ণ ছোট ব্যবসায়ী—যারা কলিকাতার বাজারে হরেক রকম সওদা কিনে ঘরে ফিরছেন। আর রয়েছেন একদল তরুণ—কেউ আন্দামানে চাকুরিরত, কেউ চাকুরির সন্ধানী, কিছু সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী। পূর্বে টুরিষ্টের সংখ্যা ছিল নগণ্য। ক্রমশ বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ টুরিষ্ট এ্যাসোসিয়েশনের একটি বড় দল আমাদের পাশেই আস্তানা পেতেছেন। বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক, ছোট্ট বাচ্চা ও নারী-পুরুষ সব বয়সের লোকই রয়েছেন দলে। একেবারে যেন একটি পরিবার! বছরে একবার, সুযোগ পেলে দু'বার এঁরা বেরিয়ে পড়েন ভারত দর্শনে। পথেই পরস্পরের মধ্যে সখ্যতা। সকলে বিপুল অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। এবারে এঁদের লক্ষ্য আন্দামান। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু ছাত্র ছিলেন আমাদের সহযাত্রী। বিশ্বভারতীর একদল ছেলেমেয়েও ছিলেন এই একই জাহাজের যাত্রী। সকলেই বাঙ্ক প্যাসেঞ্জার।

জাহাজে বাঙ্ক-যাত্রীর আস্তানাকে কোনমতেই অন্ধকূপের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। সেন্ট্রাল জেলের 'জালডিগ্রী'র সঙ্গে কিছুটা-মিল বরং রয়েছে। বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা আছে, পানীয় জলের একাধিক ট্যাঙ্ক আছে, জাহাজের গায়ে বসানো পুরু কাঁচের ছোট ছোট শার্শি আছে। মেঝেতে দিনে একবার করে ঝাড়ু পড়ে।

মন্দ কাটে না সময়। ইচ্ছে হলেই ডেকের উপরে গিয়ে বেড়ানো চলে, বসে গল্প করা চলে। হাস্যময়ী পরিবেশের মধ্যে একটিমাত্র বিষাদময় মুহূর্ত পায়খানা। সারি সারি কমন পায়খানা। জলের কোন অভাব নেই। অধিকাংশ সাধারণ যাত্রী পায়খানার ব্যবহার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। 'Life is adjustment —এই হিতোপদেশ জপতে জপতে জাহাজের দিনগুলি অতিক্রান্ত হয়।

কেবিন যাত্রীদের মধ্যে প্রায়ই সরকারী কর্মচারী ও দু'একজন মিশনারী—সিভিল অফিসার, মিলিটারী অফিসার, শিক্ষক, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ্, ওভারসিয়ার, পাদ্রী ইত্যাদি। খুব কম যাত্রীই নিজের টাকা খরচ করে কেবিনে যান। বছরে একবার মেনল্যাণ্ডে যাওয়া ও ফিরে আসার যাবতীয় খরচ বহন করেন নিয়োগকর্তা। কেবিনের সবকিছু ব্যবস্থাই সুন্দর ও আরামপ্রদ। কেবিন-প্যাসেঞ্জার সেলুন অথবা কমন ক্যাণ্টিনে খেতে পারেন। বাঙ্ক-প্যাসেঞ্জার সেলুনে খাবার অধিকারী নন। একটি জার্নিপিছু সেলুনের আহার রেট ৬৬ টাকা। ছোট বড় সবারই এক রেট। আগে লাগতো ৪২ টাকা। ক্যানটিনে জার্নিপিছু মিল চার্জ ২৮ টাকা। এখন শিপিং করপোরেশন আহার সরবরাহ করে—নিরামিষ মিল চার্জ ২-৮০ পয়সা, আমিষ ৩-৭০ পয়সা। কিছুদিন আগে ছিল—২-৫০ এবং ৩ টাকা। তখন কনট্রাক্টার আহার যোগাত। খাওয়াও ভাল ছিল। প্রয়োজন মত ভাত ডাল সবজি দিতে কার্পণ্য করতো না। এখন চার্জও বেশী, রান্নাও খারাপ; দ্বিতীয়বার ভাত চাইলে বাড়তি পয়সা গুণে দিতে হয়। হয়তো এতদিনে মিলচার্জ আর এক ধাপ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

বেলা এখন দু'টো। জাহাজ নোঙর তুললো। আপার ডেক লোয়ার ডেক ভর্তি যাত্রী। ধীরমন্থর গতিতে ডকের দু'টো গেট পেরিয়ে ভাগীরথীতে এসে পৌঁছতে দুটি ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। এখান থেকে সমুদ্রের মুখ পর্যন্ত জাহাজ চালাতে খুব সতর্কতার প্রয়োজন।

চালানও হয় ধীরে। ভাগীরথীর তলা নিয়ত পলি জমে উঁচু হয়ে উঠছে। ড্রেজার রোজই বালি কাটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। এই পথে পাইলট জাহাজ চালান। কোথায় নদী গভীর আর কোথায় অগভীর পাইলটের সব জানা। জোয়ার ভাটার দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। ভাটার টানে জলের গভীরতা নির্দিষ্ট সীমার নীচে নামামাত্র জাহাজ দাঁড় করিয়ে দিতে হয়। পরবর্তী জোয়ারের প্রতীক্ষায় বসে থাকা। থেমে থেমে সমুদ্রের মুখে পৌঁছতে পুরো দুই দিন লেগে যায়।

গার্ডেনরীচের ড্রাই ডক, শালিমার পেন্ট, বজবজের ডিপো পেরিয়ে হাওড়া-উলুবেড়ের জুট মিল ডানে রেখে জাহাজ চলছে। ডায়মণ্ডহারবার এল, হলদিয়ার নির্মিয়মান বিরাট ডকের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। সবই স্পষ্ট নজরে আসছে। নানা উপনদীর মিলনে ভাগীরথীর মুলধারা ক্রমশ প্রশস্ততর হচ্ছে। সহযাত্রীরা বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখিয়ে দিলেন ঐ দূরে বহু দূরে ছোট্ট দ্বীপ যেখানে মকরসংক্রান্তিতে মেলা বসে। এই তিথিতে ভারতের দূর-দূরান্ত প্রান্তের অগণিত যাত্রী আসেন সমুদ্রের সঙ্গে গঙ্গার লীন হয়ে যাবার দৃশ্যপট দেখতে। সাগর সঙ্গমে স্নান করে পাপস্খলন করেন ও পুণ্য সঞ্চয় করে নিয়ে যান! ভগীরথের দীর্ঘপথ পরিক্রমার এইখানে শেষ। লোকপ্রবাদ, কপিলমুনির সাধনপীঠ এখানে। ধর্মভূমি ভারত!

বামে সুন্দরবনের অরণ্যশোভা, দক্ষিণে মেদিনীপুরের চরণতল। জাহাজের গতি সমুদ্রপানে। যাত্রীরা চঞ্চল হয়ে উঠছে। ঐ যে দেখা যায় স্যাণ্ডহেড। পাইলট ক্যাপ্টেনের হাতে জাহাজের দায়িত্ব অর্পণ করে নেমে গেলেন। চলন্ত জাহাজ থেকে নেমে অপেক্ষমান বোটে গিয়ে উঠেন। পাইলটদের এটা হলটিং স্টেশন। কলিকাতাগামী জাহাজ তাঁরা চালিয়ে নিয়ে যান; আবার বিদেশগামী জাহাজ কলিকাতা থেকে এনে এই সমুদ্রের মুখে ছেড়ে দেন। ক্যাপ্টেন সমুদ্রপথে আমাদের জাহাজের গতি বাড়িয়ে দিলেন।

স্থলভূমি বিলীন হয়ে গেল। সামনে বামে ও ডানে যেদিকেই নজর যায় শুধু জল। এতক্ষণে কাদাগোলা গঙ্গা জল সমুদ্রের মুখে নীল হলো। জলের রং বদলে গেল। এবার জাহাজের বিরামহীন যাত্রা। পোর্টব্লেয়ার পৌঁছবার আগে আর বিরতি নেই। এ চলায় পথের ধূসর ধূলো নেই, মেঘের সঙ্গে পাঞ্জা কষে আকাশ ফুড়ে যাওয়া নেই; আছে ফেনিল জলের উচ্ছ্বাস। এ পথে ঘরের মঙ্গল শঙ্খধ্বনি কানে আসে না; সন্ধ্যার দীপালোক নজরে পড়ে না। এপ্রিল-মে মাসে চলার পথে কালবৈশাখী রুদ্রমূর্তি ধারণ করে; জুলাই আগষ্টে ঘূর্ণিপাক ও আকাশবৃষ্টি সঙ্গী হয়; ডিসেম্বর জানুয়ারীতে মৃদুমন্দ সমীরণ দেহ জুড়িয়ে দেয়। দুইটি দিন ও রাত্রি নির্মল বাতাস, নীল জলরাশি, উন্মুক্ত আকাশ ও অপরূপ আলো ঋতুভেদে নানা সাজে আবির্ভূত হয়। চোখ জুড়ানো ও মন ভুলানো এমন অনুভূতি মৃত্তিকার কোলে অপ্রাপ্য থেকে যায়। দিগন্ত পরিব্যাপ্ত জলরাশির বুকে ভেলার মত ভাসতে রোমাঞ্চ জাগে। মাটির কোন বন্ধন আর নেই। খাবার লোভে জাহাজের গায়ে গায়ে মেনল্যাণ্ডের যেক'টি পাখী এগিয়ে আসছিল তারা ফিরে গেল। সমুদ্রের জল ছিল নীল, এবার কাল হলো; যেন ব্লুব্ল্যাক কালি গোলা জল।

দুধারে সাবান গোলা ফেনার সৃষ্টি করে জাহাজ জল কেটে চলেছে। পৌষ-মাঘে বঙ্গোপসাগরের রূপ প্রশান্ত ও গম্ভীর; জল নিথর ও নিস্তরঙ্গ। আমাদের যাত্রা ছিল মধুর। বর্ষা-শরৎ-হেমন্তে এই সমুদ্র আলাদা মূর্তি ধারণ করে, কোন কোন দিন উন্মাদ হয়ে উঠে। সমুদ্র পীড়ায় যাত্রীরা শয্যা গ্রহণ করেন।

চলার পথে মাঝে মাঝে ডল্‌ফিন মাছ জাহাজের গায়ে গায়ে এগিয়ে চলে। ওরা সমুদ্র যাত্রীর পরম বন্ধু। বিপদের ইঙ্গিত পেলে ছুটে আসে সাহায্য করতে। তাই ডলফিন মাছ ধরা বা হত্যা করা নিষিদ্ধ। উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক জল থেকে উঠে কিছুটা উড়ে গিয়ে
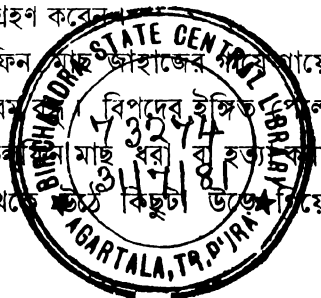
জলে হারিয়ে যায়। সুন্দর লাগে দেখতে। আপার ডেকে চেয়ারে বসে বই পড়া, গল্পগুজব করা, রেডিও শোনা, অনন্ত জলরাশির দিকে চেয়ে থাকা—কোথা দিয়ে দিন কেটে যায় মালুমই হয় না। রাতে আহারের পর হাউজি খেলা।

কলিকাতা-পোর্টব্লেয়ার সার্ভিসে শিপিং করপোরেশন ছোট জাহাজ রেখেছে। ছয়-সাত শতের বেশী যাত্রী নেয় না। এরা জান-মাল দুই-ই বহন করে। যাবার সময় গম, চিনি, ডাল, সবজি ইত্যাদি নিয়ে যায়; ফেরার পথে চেরা কাঠ নিয়ে আসে। একেবারে উপরের অংশে থাকেন ক্যাপ্টেন এবং তার একান্ত সহযোগী স্টাফ। ক্যাপ্টেন জাহাজের সর্বত্র নির্দেশ পাঠান। তাঁর পাশে রয়েছে কম্পাস, রাডার আর সুইচ বোর্ড; অন্য কোন যন্ত্রের বাহুল্য নেই। যন্ত্রপাতি সব রয়েছে জাহাজের তলায়। ডিউটিরত নীচের স্টাফের সঙ্গে ক্যাপ্টেন সংযোগ রাখেন সুইচ টিপে। স্টার্ট দেওয়া, জাহাজের গতি কম বেশী করা, বাঁক নেওয়া, নোঙ্গর ফেলা, হুশিয়ার করা—সব কিছু খুঁটিনাটি আদেশ যাচ্ছে এখান থেকে। যাত্রীর চোখের অন্তরালে কী বিপুল ও বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড চলছে! এক তরুণ কর্মীর সঙ্গে একদিন নেমে গেলাম ডেক থেকে নীচে একেবারে তলার মেশিন ঘরে। মেশিন ও যন্ত্রপাতির সমারোহ যেকোন মানুষকে স্তম্ভিত করবে। একটা চলমান সম্পূর্ণ কারখানা। তলায় না নামলে জানাই যেত না একটি মাঝারি জাহাজেও কেন এতগুলি ইঞ্জিনিয়ার, ফোরম্যান, মেসিনম্যান ইত্যাদি নিয়োগ করতে হয়। এদের সদা-সতর্ক দৃষ্টির কথা সাধারণ যাত্রীদের অজ্ঞাতই থেকে যায়।

দিনরাত একটানা যাত্রা। নীচে জল উপরে আকাশ; আর কিছু নেই। অকুল সমুদ্রে পাখীও আসে না। কোন বন্দরে দাঁড়ানো নেই। দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির উপরে ভেলার মত একখানি ছোট জাহাজ বেগে এগিয়ে চলছে। শুধু জল আর জল। মনে হচ্ছে এখন—

"The world of waters is home,
And merry men are we."

চারদিন শেষ হয়ে এল এমন সময় কোকোদ্বীপ নজরে এল। বর্মার একেবারে গায়ে। পণ্ডিত নেহেরু এটা ব্রহ্মদেশকে দান করেছেন। কোকো থেকে উত্তর আন্দামানের ল্যাণ্ডফল দ্বীপের দূরত্ব মাত্র শ'দেড়েক কিলোমিটার। ডান দিকে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত মেঘের মত আবছা দ্বীপমালার আভাস। ঐটাই নর্থ ও মিডল আন্দামান। দ্বীপগুলো পেরুতে প্রায় দেড়দিন অতিবাহিত হলো। সাউথ আন্দামানের লাইট হাউস আমরা দেখতে পেলাম। জাহাজের গতি মন্থর হলো। পোর্টব্লেয়ারের খাড়িতে প্রবেশ করলো। লগেজপত্র বেঁধে যাত্রীরা ইতিমধ্যেই ডেকের উপর এসে হাজির। সকলেই চান আগে নামতে। চ্যাথামে জেটি ছোট। সেখানে জাহাজ ভিড়ে আছে। তাই জাহাজ নিতে হলো হ্যাডোর নতুন জেটিতে। হ্যাডোর জেটি বিরাট; এখানে সামরিক ও অসামরিক একাধিক বড় জাহাজ ভিড়তে পারে। সিঁড়ি লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে হুড়োহুড়ি সুরু হয়ে গেল। ভিড় কমলে সন্তর্পণে নেমেই দেখি প্রদীপ জীপ নিয়ে হাজির। গোধূলি লগ্নের আগেই আন্দামানের মাটিতে পা পড়লো। সেলুলার জেল-গম্বুজের মাথায় জাতীয় পতাকা তখনও বাতাসে উড়ছিল। চ্যাথাম কজ-ওয়ে বাঁয়ে রেখে আমরা বাসার দিকে রওনা দিলাম।

প্রদীপ-বাসনার অতিথি আমি। সন্ধ্যায় চায়ের টেবিলে বসে ওদের জানালাম—"আমি কিন্তু কাল ভোরে সবার আগে সেলুলার জেল দেখতে যেতে চাই। এই মুক্তিতীর্থ দর্শনের প্রবল টানে সাগর পাড়ি দিয়ে আন্দামান এসেছি।" 'সাগর ঘেরা এই পাষাণ কারা' ভবিষ্যতে আমার মত বহু টুরিষ্টকে টেনে আনবে। ওরা সমস্বরে আপত্তি জানালো—"না না, একটু পরিবর্তন করুন প্রোগ্রামে। কাল সকালে চলুন কারবিনস্ কোভের সাগর জলে সবাই নেয়ে

আসি। পরদিন যাবেন সেলুলার জেল দেখতে। সাগরে নাইবার মত এত সুন্দর সি-বীচ আন্দামানে আর নেই।" সেটাই স্থির হলো। সকালের বাসে সদলবলে নামলাম কারবিনস্ কোভের সরকারী নারিকেল বাগিচার ছায়ায়। এবারডিন থেকে এক ঘণ্টার পথ। এয়ারপোর্টের পাশ দিয়ে পিচ ঢালা রাস্তা। নিঝুম গ্রাম্য পরিবেশ। পাশে ধান ক্ষেত, নারিকেল বাগিচা, দুপাশে পাহাড়ের টিলা। মাঝখানে ছোট্ট সি-বীচ। অগভীর সমুদ্রে অনুচ্চ তরঙ্গ। নিশ্চিন্ত স্নানের মনোরম স্থান। পুরীর সমুদ্রের মত এখানে গম্ভীর তরঙ্গের ফেনিল গর্জন নেই। আবার দীঘার মত এতটা শান্তও নয়। নিরালা সুন্দর পরিবেশ। পাশে চমৎকার টুরিষ্ট হোম। আকর্ষনীয় পিক্‌নিক্ স্পট। আমাদের জাহাজের ওয়েলফেয়ার অফিসার, ওয়ারলেস অফিসার, তরুণ ইঞ্জিনিয়ার সকলেই এসেছেন সমুদ্র স্নানে। সপ্তাহ ব্যাপী একটানা জাহাজ বাসের ক্লান্তি বিলীন হলো সমুদ্রের জলে। পাশেই জেলেরা মাছ ধরছিল। একটি সুরমাই মাছ মিলে গেল। সুরমাই সুস্বাদু, তাই চাহিদা বেশী কিন্তু মিলে কম।

পরদিন সকালে বাসে চেপে জেলখানার প্রধান ফটকের সামনে এসে নামলাম। বিরাট ফটক, প্রকাণ্ড চৌহদ্দি। পূর্বের সে গৌরবও নেই, কর্মচাঞ্চল্যও নেই! শুধু অতীতের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একজন শান্ত্রী ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন। সমস্ত দেহ মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। মনে হলো আজকের কারা প্রাচীর আমার কানে কানে যেন বলছে ঃ

"দেখেছি অনেক, সহেছি অনেক, লিখেছি অনেক লেখা।"

১৮৫৭ সালে সিপাই বিদ্রোহী বন্দী এনে যে কারা শিবিরের উদ্বোধন, বিখ্যাত সেলুলার জেল নির্মাণের মধ্যে যে সুরক্ষার প্রয়াস, ত্রিশ বছরের যে কর্মচাঞ্চল্য, ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে শেষ রাজনৈতিক বন্দীদের মেনল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিয়ে যে নিরাভরণ ও

বিমর্ষ পরিণতি, স্বাধীনতার পরে অতীতের স্মৃতি মুছে দিবার যে চেষ্টা—তার একশ' বছরের অখণ্ড ইতিবৃত্ত মানসপটে ভেসে উঠলো।

॥ তিন ॥

পোর্টব্লেয়ারের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দর্শনীয় স্থান সেলুলার জেল। বর্তমানে জাতীয় স্মৃতি সৌধে রূপান্তরিত হয়েছে। প্যারিসের ব্যাস্টিল কারাগার যেমন ফরাসী সম্রাটের নির্যাতনের জ্বলন্ত সাক্ষী, তেমনি ভারতে নিষ্ঠুর বৃটিশ শাসনের নীরব সাক্ষী সেলুলার জেল। লোক প্রবাদ, এটা ছিল পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম জেল। দুঃসাহসী মরণজয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিভৃতে যেমন আবদ্ধ করে রাখা হতো, তেমনি নির্বাসন প্রাপ্ত ভয়ঙ্কর ডাকাত, মারাত্মক খুনী, কুখ্যাত গুণ্ডা, নৃশংস হত্যাকারী নারী ও পুরুষদের এখানে পাঠানো হতো। কয়েক হাজার মানুষের ক্রুদ্ধ ক্ষোভ, হতাশ নিঃশ্বাস, নিদারুণ মর্মবেদনা আজও দেয়ালে অলিন্দে অনুভব করা যায়।

প্রথম দিকে বন্দীশিবির নির্মাণ করা হয়েছিল সাউথ আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপে। ১৮৯০ সালে মিঃ লীল ও মিঃ লেথব্রিজ পেনাল সেটলমেণ্ট পরিদর্শন করতে আসেন। মারাত্মক বন্দীদের বিভিন্ন দ্বীপের শিবিরে আটক রাখা তাঁরা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। বিশেষ সংরক্ষিত জেলে উপযুক্ত পাহারায় ভয়ঙ্কর বন্দীদের আবদ্ধ করে রাখার পরামর্শ দিয়ে জেল নির্মাণের সুপারিশ করে যান। চিফ্ কমিশনার স্যার রিচার্ড টেম্পল এই সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৯৬ সালে সেলুলার জেলের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। প্ল্যান তৈরী হলো—মাঝখানে থাকবে চারতলা গম্বুজ। গম্বুজকে কেন্দ্রে রেখে সাতদিকে সাতটি উইং বা শাখা প্রসারিত থাকবে। প্রতিটি উইং হবে ত্রিতল। আর সকল উইংকে বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে থাকবে বিরাট উঁচু প্রাচীর। গম্বুজের মাথায় রাইফেলধারী সিপাই পাহারা দিবে। রেলিং ঘেরা

লম্বা করিডরে লণ্ঠন হাতে ওয়ার্ডেন সারা রাত টহল দিবে। দোতলা ও তিনতলায় এক সঙ্গে তিনজন ওয়ার্ডেন পায়চারি করবে। ওয়ার্ডেন বদল হবে মাঝরাতে। সর্ববিষয়ে সুরক্ষিত কারাগার গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বিপুল উদ্যমে কাজও শুরু হয়ে যায়। আন্দামানের মাটি ইট তৈরীর অনুপযোগী। জাহাজ ভর্তি ইট আসে রেঙ্গুন থেকে; লোহা লক্কর আসে বিলাত থেকে; আর চুনসুরকি আসে কলিকাতা থেকে। দশ বছর ধরে বিরাম বিহীন চেষ্টা চলে। সমুদ্রের গা ঘেঁষে খাড়াই উঁচু টিলা আটলান্টা পয়েন্টের মাথায় বিস্তৃত সমতলভূমি নির্বাচিত করা হলো এই জেলের জন্য। ১৯০৬ সালে চিফ্ কমিশনার মিঃ টুসনের সময় কারাগারের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়।

সবক'টি উইং মিলিয়ে সেলের সংখ্যা ৬৯৮। এক নম্বরে ১০৫; দুই নম্বরে ১০২; তিন নম্বরে ১৫৬; চার নম্বরে ৫৩; পাঁচ নম্বরে ৯৬; ছয় নম্বরে ৬০ এবং সাত নম্বরে ১২৬টি সেল। প্রতিটি সেল লম্বায় ১১'৬" ও প্রস্থে ৮'৩" এবং উচ্চতায় ৯ ফিট। এক একজন বন্দীকে বছরের পর বছর কাটাতে হতো এই সেলে। ফাঁসির আসামীর জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা ছিল চারটি রিজার্ভ কনডেমণ্ড সেল (condemned cell)। সেলগুলোর দেয়াল করা হয় অস্বাভাবিক চওড়া; লোহার দরজাগুলোও তেমনি মোটা। একটি বন্দীশালায় এত বেশী সংখ্যক সেল থাকার জন্যই নামকরণ করা হয়েছিল "সেলুলার জেল"। 'ডেন্জারাস্' কয়েদীদের ব্যারাকে আবদ্ধ রাখা নিরাপদ না। এই কারণে কারাগারটি সেলময় করা হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা ভাষা ও নানা ধর্মের রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক বন্দীর সমাবেশে জেলখানা "ক্ষুদে ভারতের" রূপ নেয়।

১৯০৭, ১৯০৮ ও ১৯০৯ সাল। বাংলা, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী ও পাঞ্জাবে চরমপন্থী রাজনীতি সক্রিয় হয়ে উঠে। আলিপুর

বোমার মামলার প্রথম রাজনৈতিক বন্দীর দল সেলুলার জেলে উপস্থিত হলেন। প্রথম দলে ছিলেন—(১) বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, (২) উল্লাসকর দত্ত, (৩) হেমচন্দ্র দাস, (৪) হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, (৫) ইন্দুভূষণ রায়, (৬) বিভূতিভূষণ সরকার, (৭) অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য। ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক বন্দীদের সেলুলার জেলে পাঠিয়ে দিবার আদেশ এই সময় সকল প্রদেশে চলে যায়। গণেশপন্থ সাভারকর ও বিনায়ক দামোদর সাভারকর—দুই ভাইকে মহারাষ্ট্র হতে সেলুলার জেলে আজীবন কারাভোগের জন্য আনা হয় ১৯১১ সালে। দেশাত্ববোধক কবিতার বই 'লাঘু অভিনব ভারত মেলা' প্রকাশ করার অভিযোগে গণেশপন্থকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বিনায়ক দামোদরকে ১ম ও ২য় নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করে ডবল যাবজ্জীবন ভোগের দণ্ড দেওয়া হয়। ছোট ভাই রামকৃষ্ণ সাভারকরকে লর্ড মিন্টোর গায়ে বোমা নিক্ষেপ করার সন্দেহে রাজদ্রোহের অভিযোগে কলকাতায় গ্রেপ্তার করা হয়। তখন তিনি ১৯ বছরের যুবক ; কলিকাতায় ডাক্তারি পড়ছিলেন। উত্তরপ্রদেশ থেকে ভয়ঙ্কর দুই রাজবন্দী রামহরি ও হতিলাল বর্মাকে পাঠানো হলো। বাংলার দ্বিতীয় দলে এলেন উপেন ব্যানার্জী, সুধীর সরকার, ননীগোপাল মুখার্জী, হেমচন্দ্র কানুনগো ইত্যাদি অনেকে। ঢাকা থেকে এলেন পুলিনবিহারী দাশ ও সুরেশ চন্দ্র। নাসিক থেকে এলেন শ্রীওয়ামান রাও যোশী। ভারতবাসীর চোখে সেলুলার জেল বিপুল মর্যাদা পেল। "স্বরাজ্য" পত্রিকা প্রকাশ করেন উত্তরপ্রদেশের বিপ্লবীরা। বাংলায় বের হলো—'যুগান্তর', "বন্দেমাতরম্", "নবশক্তি", "সন্ধ্যা"। মহারাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত হলো—"কাল" ও "কেশরী"। সকলের লেখনিতে বিদ্রোহের আহ্বান। নয়টি পত্রিকার সম্পাদক দণ্ডিত হলেন! তাদের মধ্যে চারজন সেলুলার জেলে প্রেরিত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক রাজবন্দীকে আন্দামানে পাঠানো হয়।

প্রথম দিকে—সাধারণ কয়েদীর সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদের কোনই পার্থক্য করা হয় না। 'এস, এস, মহারাজা' জাহাজ চল্লিশ দিনের ব্যবধানে একবার কলকাতায় আসতো; একবার মাদ্রাজ ও দুবার রেঙ্গুন যেত! বন্দীরা পেঁৗছামাত্র মাউন্ট হ্যারিয়েটের নীচে কোয়ারেনটাইন কাম্পে এনে দু'সপ্তাহ আটক করে রাখা হতো। প্লেগ জাতীয় কোন ছোঁয়াচে রোগ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য এই সতর্কতা। সেলুলার জেলে প্রেরণের অনুমতি মিলতো ১৬ দিনের দিন। জেলের নথীভুক্ত করার পর বন্দীদের ফাইলে বসিয়ে গলায় লোহার হাসুলীতে পরানো হতো নূতন নম্বর। 'ডি' অক্ষরটি সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হতো। 'ডি' এর অর্থ ডেন্‌জারাস্‌'। প্রধানতঃ 'ডি' ক্লাসের জন্যই তৈরী হয়েছিল সেলুলার জেল, ভাইপার ও চ্যাথাম বন্দী নিবাস। ভাইপারে পাঠানো হতো 'চেনগ্যাং'। বন্দীদের সাধারণত চারটি স্তরে কারাভোগ করানো হতো। প্রথম ছ'মাস প্রত্যেকে ছোট ছোট নির্জন খুপরি ঘরে কাটাতো। তারপর ১৮ মাস কাটতো ব্যারাকে অপর কয়েদীদের সঙ্গে। ব্যারাকে ১৮ মাস অতিবাহিত হবার পর কড়া পাহারায় বাইরে পাঠানো হতো নানা ধরণের শ্রমসাধ্য কাজে। এইভাবে কেটে যেত বছর তিন চার। প্রতি স্তরেই বন্দীদের আনুগত্য ও আচরণের উপরে কড়া নজর থাকতো। বিরূপ রিপোর্ট না থাকলে বাইরে অপরাধী শ্রমিকরূপে গণ্য হতো এবং নামমাত্র মজুরি কাজের বিনিময়ে জুটতো। দশ বছর ভালভাবে অতিক্রান্ত হলে ১১ বছরের মাথায় সেলফ্‌ সাপোর্টারের তালিকায় নাম উঠতো। সেলফ্‌ সাপোর্টার মানে মুক্ত কয়েদী। মাঝখানে জেল রিপোর্ট খারাপ এলে মুক্ত কয়েদী হবার সম্ভাবনা বিলম্বিত হতো এবং শাস্তির বোঝা ঘাড়ে চাপতো। হিষ্ট্রী টিকিটে কাজের নির্দেশ, শাস্তির আদেশ দিয়ে যেতেন জেলার সাহেব। কাউকে ছ'মাস পৃথক নির্জন বাস, কাউকে দু'পাউণ্ড পাটের দড়ি পাকান, কাউকে এক বছর লক্‌-আপ, কাউকে ঘানীঘর, কাউকে

দু'বছর বিশেষ শাস্তি, কাউকে এক সপ্তাহ খাড়া হাতকড়ি ইত্যাদি। নারিকেল ছোবড়ার দড়ি সবাইকে পাকাতে হতো। ঘানীতে নারিকেল ও সরিষা পিষে নির্দিষ্ট পরিমাণ তেল বের করার নির্দেশ ছিল সবার উপরে। পাথুরে মাটি কেটে রাস্তা ও ঘরবাড়ি তৈরীর কাজে সবাইকে মজুরের মত খাটানো হতো! 'জঙ্গল কাজ' থেকে কারো রেহাই ছিল না। রোদবৃষ্টির মধ্যে জঙ্গল সাফাই, নারিকেল চারা রোপন, মাটি কাটা, পাথর ভাঙ্গা, বাগান করা, রবার চাষ ইত্যাদি জঙ্গল কাজের অধীন ছিল। জেলের ভিতরে ও বাইরে অমানুষিক পরিশ্রমে জর্জরিত করা হতো। বাইরের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করতো প্রধানত টিণ্ডাল ও পেটি অফিসার বা জমাদার। এদের হাতে থাকতো কর্মবিভাগের দায়িত্ব। পাঠান ও পাঞ্জাবী মুসলমান কয়েদীদের এই দুই পদ একচেটিয়া ছিল। জঙ্গল কাজ পরিচালনায় এদের ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট। বন্দীদের বিরুদ্ধে এদের অভিযোগ চূড়ান্ত বলে কর্তৃপক্ষের নিকট গৃহীত হতো।

ভারতের বড়লাট লর্ড মেয়ো ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আন্দামান পরিদর্শনে আসেন। মাউন্ট হেরিয়েট পরিদর্শন সেরে হোপ-টাউন জেটির দিকে যখন সদলবলে এগিয়ে চলেছেন ওয়াহাবী আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদী সাজায় দণ্ডিত পাঠান-সন্তান শের আলী ছুটে এসে হাতের ছোড়া লর্ড মেয়োর বুকে বিদ্ধ করে দেয়। এই সবলদেহী দীর্ঘকায় পাঠান কয়েদীর জবানবন্দী জেলখানায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদের একটি নজির হয়ে আছে। ফাঁসির রজ্জু তাঁর জীবনাবসান ঘটায় বটে, কিন্তু তার এই দুর্ধর্ষ সাহসিকতায় জেলকর্তৃপক্ষের চোখ খুলে যায়। পাঠান কয়েদীদের খুশি রাখার দিকে আগ্রহ বেড়ে উঠে। 'টিণ্ডাল' "জমাদার" নিয়োগের ক্ষেত্রে পাঠান কয়েদী একচেটিয়া অধিকার পেতে লাগলো। শৃঙ্খলাভঙ্গের কোন নজির পাঁচ বৎসর না থাকলে সেই কয়েদী মাসে বার আনা এবং দশ বছর পর মাসে এক টাকা বেতন পাবে স্থির হয়ে

গেল। লেখাপড়া জানা বন্দী writer বা মুন্সীর কাজ পেতে লাগলো। পেটি অফিসার পাঠান মুসলমান—খরদাবাদ খাঁ, করম খাঁ; হেড জমাদার মির্জা খাঁ, মুন্সী গোলাম রসুল ও জেলার মিঃ ব্যারী সাহেবের দাপট ও নিষ্ঠুর উৎপীড়ন বন্দীদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিল। প্রথম দিকে রাজবন্দীরাও এদের হাতে সমভাবে নির্যাতিত হতেন। জঙ্গল কাজের জন্য যখন যাদের নির্বাচন করা হতো তাদের জিম্মা নিতে টিণ্ডাল ও পেটি-অফিসার একদিন আগে এবারডিন স্টেশনে আসতো। ৭০।৮০ জনের একটি ব্যাচ এদের জিম্মায় কয়েক দিনের জন্য চলে যেত। নতুন শিবিরে এনে জমাদার ও মুন্সী দশবারটি গ্রুপে ভাগ করে প্রতিদিন কাজে নিযুক্ত করতো। রাস্তা তৈরী, গভীর অরণ্য সাফাই, জাহাজে মালপত্র তোলা-নামানো, ঝাড়ু দেওয়া ইত্যাদি ছিল নিত্যদিনের কাজ। নির্দিষ্ট কাজ অসমাপ্ত রাখলে শাস্তিভোগ ছিল অবধারিত।

লোনা জলে থালা ধুয়ে পরিষ্কার করতে একটু দেরী ঘটায় টিণ্ডাল ও জমাদারের সঙ্গে একদিন বচসা হলো। সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট চলে গেল জেলার সাহেবের কাছে। সুপারিন্টেডেন্টের বিচারে আদেশ হলো অবনী চক্রবর্তী, সুধীর চন্দ্র দে ও পাঞ্জাবী নন্দগোপালের এক সপ্তাহ খাড়া হাত কড়া। নিজ নিজ সেলে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে হাতকড়া লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। সুদর্শন যুবক নন্দগোপাল এলাহাবাদের 'স্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদক। ঘানীর কাজে অরাজী হন। আবার পেলেন জেল শাস্তি। চুঁচুড়ার দৃঢ়চেতা তরুণ ননীগোপাল জেলকর্তৃপক্ষের বর্বরোচিত আচরণের প্রতিবাদ জানালেন। শাস্তি পেলেন চটের কাপড় পরে থাকতে হবে। প্রতিরোধ করলেন। জোর করে তাঁর প্যাণ্ট ও কুর্তা কেড়ে নিয়ে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় সেলে ঢোকান হলো। আমোদ প্রিয় উল্লাসকর দত্তকে জ্বর অবস্থায় খাড়া হাতকড়ার দণ্ড দেওয়ায় মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিল। দিনের পর দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, নির্যাতন ও

অসম্মানে ইন্দুভূষণ রায় সেলের মধ্যে একরাতে আত্মহত্যা করলেন। উত্তর প্রদেশের রাজবন্দী হতিলালের মৃত্যু ঘটলো।

১৯১২-১৩ সালে রাজবন্দীদের দুঃখভোগের কাহিনী অত্যন্ত করুণ। "হতভাগ্য কয়েদীরা রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, ম্যালেরিয়া-ডিসেণ্ট্রির সহিত লড়াই করিয়া জঙ্গল কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরগুলি পত্তন করে। এই সহরগুলি সেই রাজনৈতিক কয়েদীদের মৃত স্তূপ হইতে সৃষ্ট।"* অতিষ্ঠ হয়ে রাজবন্দীরা অনশন গ্রহণ করলেন। তাঁদের দাবী তিনটি—(১) পরিমাণমত আহার চাই, আহার্যবস্তু সুখাদ্য হওয়া চাই; (২) কষ্টকর দৈহিক খাটুনি হতে নিষ্কৃতি চাই; (৩) রাজবন্দীদের পরস্পরের মধ্যে মেলামেশার অধিকার চাই। অনশন বেশী দিন স্থায়ী হতে পারেনি। অনশনকারী বন্দীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়—হাতকড়ি, ডাণ্ডাবেরী, বেত্রাঘাত, চটবস্ত্র, নির্জন সেল বাস। এত শাস্তি সত্বেও ননীগোপাল অটল রয়ে গেলেন। স্যার পারসি লুকাস জেলের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য এলেন। বন্দীদের অভিযোগ সহানুভূতির সঙ্গে শুনলেন। জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটা রফাও করে যান। একটানা ৭২ দিন অভুক্ত থাকার পর ননীগোপাল অনশন ভাঙ্গলেন। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের নির্বাসন দণ্ড নিয়ে সেলুলার জেলে যারা ছিলেন এমন ২৯ জন বন্দীকে জেলের বাইরে চলাফেরার অনুমতি দেওয়া হলো। বন্দীরা বই ও সংবাদপত্র পাঠের সুযোগ পেলেন। শ্রমসাধ্য কাজের পরিবর্তে হাল্কা ধরণের কাজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। সাভারকর দুই ভাই ও পুলিনবিহারী দাশ মহাশয়কে কখনও সেলের বাইরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এঁদের উপর খুব কড়া নজর ছিল। যে সেলে দীর্ঘদিন বিনায়ক দামোদর সাভারকর আবদ্ধ ছিলেন তা এখনও বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রাখা আছে। তাঁর

* ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ)—"জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম" থেকে উদ্ধৃত। তিনি আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দী ছিলেন।

সেলের মধ্যে দাঁড়িয়ে শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী কবিতার কয়েকটি লাইন আমার কাছে জীবন্ত হয়ে উঠে—

"Whoever is too great must lonely live
Adorned, he walks in mighty solitude

....

His only comrade is the strength within."

ক'দিন যেতে-না-যেতেই চিফ্ কমিশনার ডগ্লাসের আদেশে রাজবন্দীদের বাইরে ঘোরাফেরার অনুমতি বাতিল করে দেওয়া হয়। বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ এসেছে—বিপ্লবীরা বোমার আঘাতে সরকারি কর্মচারীদের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করছেন। সাধারণ কয়েদীদের এঁরা হাতিয়াররূপে ব্যবহার করার ফন্দি আঁটছেন। রাজবন্দীদের জ্বালাতনে জেলের শৃঙ্খলা বিনষ্টপ্রায়। কঠোর প্রশাসন শিথিল করতে হয়েছে অনেক। ডগলাস সাহেব চিন্তিত, ভীত ও আতঙ্কিত। ভারত সরকারের কাছে জরুরী অনুরোধ গেল—স্বল্পমেয়াদে দণ্ডিত বন্দীদের নিজ নিজ প্রদেশের জেলে ফেরত নেওয়া হোক। ১৯১৩ সালের শেষ নাগাদ ভারত সরকার রেজিনালড ক্র্যাডক সাহেবকে জেল পরিদর্শনের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। তাঁর বিরূপ মন্তব্যে বন্দীরা আরো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তার রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নেন—যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী ছাড়া অন্য কাউকে সেলুলার জেলে রাখা হবে না। আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্রের বন্দী, ঢাকা ষড়যন্ত্রের পুলিনবিহারী দাশ ও সুরেশ চন্দ্র, নাসিক ষড়যন্ত্রের সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয় ও যোশী ছাড়া নির্বাসিত অন্যান্য রাজবন্দীদের মেনল্যাণ্ডের কারাগারে ফেরত পাঠিয়ে দিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

কিন্তু দুর্ভাগ্য বন্দীদের। ১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। রাজবন্দীদের ফেরত পাঠাবার সিদ্ধান্ত স্থগিত রইল। বরং আরো স্বাধীনতা সংগ্রামীর আন্দামানে আসবার সম্ভাবনা প্রবল

হয়ে উঠলো। ১৯১৫ সালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় গদর পার্টির বাবা সোহন সিং সহ পঞ্চাশজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বহু শিখ সৈন্যকে রাজনৈতিক অপরাধে সেলুলার জেলে প্রেরণ করা হয়। আর সাতজন আসামী—বক্শিস সিং, বিষ্ণুগণেশ পিঙ্গলে, ইশার সিং এর পুত্র সুরেন সিং, বুর সিং-এর পুত্র সুরেন সিং, হরনাম সিং (শিয়ালকোট), জগত সিং ও কার্তার সিং--১৯১৫ সালের ১৭ই নভেম্বর ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ হারান। বালেশ্বরে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে সম্মুখ সমরে যতীন মুখার্জী ও চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীর মৃত্যু ঘটে। মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেন দাশগুপ্তের ১৯১৫ সালের ২২শে নভেম্বর ফাঁসি হয়। আর জ্যোতিশ চন্দ্র পাল ১৪ বৎসরের নির্বাসন দণ্ড নিয়ে সেলুলার জেলে আসেন। ১৯১৫-১৬ সালে বাংলার অনুশীলন দলের নেতৃস্থানীয় ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী (মহারাজ), প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, রমেশচন্দ্র আচার্য ও শচীন সান্ন্যাল সেলুলার জেলে আসেন। এইরকম ১৫।২০ জন বাঙ্গালী বন্দীকে আন্দামান পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জেল সরগরম। সরকার অনুমোদিত সুযোগ-সুবিধাগুলি জেল কর্তৃপক্ষ রাজবন্দীদের দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। অভদ্র ব্যবহার স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে উঠলো। মার্জিত ভাষায় কথা বলা তাদের স্বভাববিরুদ্ধ।

১৯১৪ সালে এপ্রিল মাসে চিফ কমিশনারের পরিদর্শনের সময় তাকে রুগ্ন ও অক্ষম লোকের আহার সরবরাহের প্রতিবাদে বারীন ঘোষ অভিযোগ করেন। অভিযোগের উত্তরে চিফ কমিশনারের মন্তব্য লক্ষ্য করার মতঃ "Barindra Kr. Ghose complained to me that he ought not to be given invalid diet when he refuses to work....... Obviously the reason of the order is that if a man does not work he does not need so much to eat and I do not think he has any reasonable ground for complaint as his health does not appear to be suffering. The remedy is in his own hands—if he works he will get full diet." (৮. ৪. ১৯১৪ তারিখের Jail Visitors' Book হতে উদ্ধৃত)।

'বারীন ঘোষের অভিযোগ শ্রমসাধ্য কাজ করতে অস্বীকার করলেই তাকে অক্ষম ব্যক্তির জন্য বরাদ্দ খাদ্য দেওয়ার আদেশ হবে—এটা সঙ্গত নয়। এই আদেশের কারণ সুস্পষ্ট। যদি কোন ব্যক্তি কাজ না করে তার অতটা খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। তার অভিযোগের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। তার দৈহিক কোন অসুস্থতা আছে বলেও মনে হয় না। প্রতিকার তার হাতেই রয়েছে। যদি সে কাজ করে তাকে পুরো আহারই দেওয়া হবে।'

জেলারের সঙ্গে একদিন ঝাঁসীর ভাই পরমানন্দ ও বাংলার আশুতোষ লাহিড়ীর বচসাও ঘুষি বিনিময়ে শেষ হয়। ইংরেজ অফিসারকে দু'হাতে ধরে মাটিতে আছাড় দিয়ে পরমানন্দ বুঝিয়ে দিলেন অভদ্রতার পরিণাম কতদূর গড়াতে পারে। পরদিন সাজার নির্দেশ এল—এঁদের হাত-পা বেঁধে দাঁড় করিয়ে প্রত্যেককে ত্রিশ ঘা বেত মারা হবে। গদর পার্টির সর্দার পৃথ্বি সিংহ প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ—অন্ধকার কুঠুরিতে এঁকে দীর্ঘদিন আবদ্ধ করে রাখ। আমেরিকা হতে প্রকাশিত 'গদর' পত্রিকার সম্পাদক জগৎরাম ও তাঁর সাথী কয়েকজন বন্দী রবিবার দিন জেলখানার লনে মোয়ার চালাবার আদেশ অমান্য করলেন। শাস্তি পেলেন ছ'মাস ডাণ্ডাবেড়ি ও নির্জন সেল বাস। জ্যোতিষ পালের মস্তিষ্ক বিকার দেখা দিল। লয়ালপুরের খালসা স্কুলের শিক্ষক ছত্রসিংহকে ছোট্ট গারদের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হলো। খাওয়া পায়খানা শোয়া সব ঐ এতটুকু জায়গার মধ্যে। দিনকয়েকের মধ্যে এতবড় তেজী পুরুষ শীর্ণ হয়ে গেলেন। দুই তিন মাস নানা রোগ ভোগের পর মৃত্যু ঘটল।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত গদর পার্টির কর্মী লুধিয়ানা জেলার সর্দার ভানসিং জেলের ভিতরে নির্যাতন ও অত্যাচার প্রতিরোধের সংগ্রামে সম্মুখ সারিতে দাঁড়িয়ে জেল

কর্তৃপক্ষের প্রতিটি অন্যায় আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করতেন। এক দিন জেলারের সঙ্গে তাঁর খুব বচসা। পরিণতি তিন নম্বর ইয়ার্ডের এক সেলে সিগ্রিগেশন। তারপর জোয়ান জোয়ান সেপাই ও সাধারণ কয়েদী দিয়ে সকলের চোখের আড়ালে তাঁর উপরে অমানুষিক বর্বর অত্যাচার; ফলে সুরু হয় রক্তবমি। কয়েক দিনের মধ্যেই জীবন দীপ নিভে যায়। তিনি মুহূর্তের জন্যও একচুল নত হননি। তাঁর এই মৃত্যু স্মরণ করিয়ে দেয় আত্মা শাশ্বত; ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। দেহকে হনন করে আত্মাকে বিনাশ করা যায় না। জেলকর্তৃপক্ষ প্রচার করলেন রক্ত আমাশয়ে ভানসিং-এর মৃত্যু ঘটেছে। মিথ্যা প্রচার সত্যকে ছাইচাপা দিয়ে রাখতে পারে না। সত্য স্বপ্রকাশ। ভানসিং-এর মর্মান্তিক মৃত্যু বরণ বন্দীদের অনশনের পথে টেনে নিয়ে গেল। এই অবস্থায় চিফ্‌ কমিশনার মিঃ টেলারের মন্তব্য হৃদয়হীন নিষ্ঠুর বৃটিশ শাসনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত :—"There are 34 seditionists on strike, two of whom refuse to eat. I have interviewed each man in the presence of Major Marry. The alleged cause in the case of Bhan Singh—another seditionist of the worst type. The man was ordered fetters and he resisted when they were applied. I am satisfied that no needless force was used. The man bit a soldier orderly and a jailor. He subsequently was admitted to the hospital for dysentery and the strike was engineered by other seditionist convicts........Bhan Singh is well known in the jail as an insolent and insubordinate convict and his case met with no sympathy among the convicts". (Remarks in Jail Visitors Book on 11.11.1917).

"৩৪ জন রাজদ্রোহী কয়েদীর মধ্যে ৩২ জন অনশন ভাঙ্গলেও দুইজন কিছুতেই আহার গ্রহণে স্বীকৃত হচ্ছে না। আর একজন জঘন্য চরিত্রের রাজদ্রোহী ভানসিং-এর আকস্মিক মৃত্যু এর কারণ।

তাকে হাতকড়ি ও ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে দিবার আদেশ হয়েছিল। পরাবার সময় সে বাধা দেয়। সে জেলার ও সৈনিক পিওনকে কামড়ে দেয়। তার প্রতি অপ্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগ যে করা হয়নি এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। পরে তাকে আমাশয়ের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনার সংবাদে অন্যান্য রাজদ্রোহী বন্দীগণ অনশন আরম্ভ করে দেয়। তার ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতা সম্পর্কে সকলেই অবহিত ছিল। কয়েদীরাও তার এই আচরণে সমর্থন জানায়নি।"

জেলার নিজ গরজে অনেক বুঝিয়ে ৩২ জনকে কয়েকদিন পরে নিবৃত্ত করেন, কিন্তু দুইজন বন্দী যখন কিছুতেই অনশন ভাঙ্গতে রাজী হলেন না তখন চিফ্ কমিশনারকে আসতে হয় এবং পরিদর্শনান্তে মন্তব্য লিখেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র কেসের বিচারে ফাঁসীর আদেশ পায় ২৪ জন আসামী। সাতজন ফাঁসীর রজ্জু গলায় পড়েন। বাকী ১৭ জনের মৃত্যুদণ্ড মকুব করে শেষ পর্যন্ত যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হয়। সকলকেই সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। এঁরা হলেন— হোসিয়ারপুরের জগৎরাম, বলবন্ত সিং, হরনাম সিং (২); অমৃতসরের কেশর সিং, হিরদারাম, কালা সিং; ফিরোজপুরের নিধন সিং; আম্বালার পৃথ্বি সিং; ভাকনার রুলা সিং, রামসরণ দাস, পরমানন্দ; ঝাঁসীর ভাই পরমানন্দ, ওয়াসওয়াস সিং।

১৯১৪-১৫-১৬ সাল। যুদ্ধের আবহাওয়া বিশ্বময়। একের পর এক রাজদ্রোহী বন্দীর আগমনে সেলুলার জেল উত্তপ্ত। ১৯১৭ সালে বর্মা ষড়যন্ত্র কেসের (মান্দালয় সাপ্লিমেণ্টারী) রাজদ্রোহী অপরাধী হোসিয়ারপুরের পণ্ডিত রামরক্ষা আজীবন কারা ভোগের দণ্ড নিয়ে জেলে এলেন। এই মামলার অপর তিনজন আসামী 'ফৈয়জাবাদের আলি আমেদ, লুধিয়ানার অমর সিং ও জয়পুরের মুজতবা হুসেনের ফাঁসী হয়। রামরক্ষা ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।

চীন, শ্যাম, জাপান, বর্মা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। উপবীত খুলে ফেলার নির্দেশ পেলেন তিনি। দৃঢ় প্রতিবাদ জানালেন। কোন ফল হলো না। প্রতিবাদে আহার ও জলপান বন্ধ করে দিলেন। জেলকর্তৃপক্ষ অনমনীয় রইল। ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে এগিয়ে গেলেন তিনি।

নির্মম নির্যাতনের রোমাঞ্চকর বহু ঘটনায় কারা কাহিনীর প্রথম পর্ব রঞ্জিত। জেলকর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভদ্র ব্যবহার আদায় করতে, নিতান্ত সাধারণ সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে রাজবন্দীদের পদে পদে আত্মঘাতী সংগ্রামে নামতে হয়েছে। যুদ্ধে ইংরেজের জয়লাভ শাসকগোষ্ঠীর মনে সাহস ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিল। বিভিন্ন জেলের অবস্থা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে 'ভারতীয় জেল কমিটি' স্যার আলেকজেণ্ডার কারতুকে চেয়ারম্যান করে গঠিত হলো। ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি সেলুলার জেল পরিদর্শন করেন। জেলে তখন আট শত বন্দী। স্যার কারভুর মন্তব্যর সামান্য অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। জেলের তৎকালীন পরিস্থিতির কিছুটা আঁচ করা যাবে।

(1) The staff provided for the medical administration of this prison is inadequate.......He has medical charge of the entire settlement with 12,000 convicts, has to supervise several out-lying hospitals besides other duties which come upon him as Superintendent of the Jail, S.M.O. and civil surgeon. It is impossible for one man to do all this.

(2) No Weighment Register is kept in this Jail and no fort-nightly or monthly statement of weighments is prepared. A Weighment Register is, I believe, invariably kept in Indian Central Jails and is, I consider, most desirable.

(3) I noticed a convict employed on the Oil Mill who was obviously not fit for such severe labour and I learnt that if a

man is placed as fit for 'hard' labour, he is liable to be placed without further discrimination on the hardest forms such as the oil mill. I think that when men of inferior physique are passed as fit for 'hard' labour, a special note should be added specifying that they should not be put on the more severe forms.

(4) I saw two convicts undergoing the punishment of wall handcuffs. Their hands were fastened to the wall at too high level, thus adding much to the severity of punishment. A clear order regulating the height the wall staples in relation to the stature of the prisoner should be laid down in writing and enforced".

(১) এই জেলে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে যে ষ্টাফ রয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। ....বার হাজার কয়েদী নিবাসের চিকিৎসার ভার আছে এই একজন চিকিৎসকের উপরে। জেল সুপারিনটেনডেন্ট, এস. এম. ও এবং সিভিল সার্জেনের কাজ ছাড়াও তাকে আশপাশের কয়েকটি হাসপাতালের কাজ সুপারভাইজ করতে হয়। একজন ব্যক্তির পক্ষে এতগুলি কাজ করা অসম্ভব ব্যাপাব।

(২) এই জেলে দৈহিক ওজনের কোন রেজিষ্টার রাখা হয় না। পাক্ষিক বা মাসিক ওজন তালিকা তৈরী করা হয় না। আমার ধারণা ভারতের সকল সেন্ট্রাল জেলেই কয়েদীদের দৈহিক ওজনের চার্ট রাখা হয়। এর অত্যন্ত প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

(৩) ঘানীঘরে যে কয়েদীকে কাজ দেওয়া হয়েছে আমি লক্ষ্য করলাম এত কঠোর পরিশ্রম করার মত তার দৈহিক যোগ্যতা নেই। আমি জানতে পারলাম কোন কয়েদী 'কঠিন' কাজের যোগ্য বলে একবার বিবেচিত হলে তাকে ঘানী বা অনুরূপ কঠিনতম কাজে নির্বিচারে নিয়োগ করা হয়। দৈহিক গঠন যাদের ততটা সবল নয় এমন ব্যক্তি 'কঠিন' কাজের যোগ্য বলে বিবেচিত হলে—সঙ্গে সঙ্গে

এমন নোট দেওয়া দরকার যেন খুব কঠিন ধরণের কাজে তাদের নিয়োগ করা না হয়।

(৪) দেয়াল-হাতকড়ির সাজা প্রাপ্ত দুইজন কয়েদীকে আমি দেখলাম। তাদের হাত দেয়ালের অনেকটা উঁচুতে বাঁধায় কঠোর শাস্তি আরো বহুগুণ বেড়ে গেছে। কয়েদীর দৈহিক গঠন অনুসারে দেওয়ালের উচ্চতার বিষয় লিখিতভাবে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা বাঞ্ছনীয় এবং আদেশ যাতে যথাযথ প্রতিপালিত হয় তা লক্ষ্য রাখা উচিত।

স্যার কারডুর রিপোর্ট অনতিবিলম্বে কার্যকরী করা হয়। যাবজ্জীবন নির্বাসনের বন্দী ছাড়া সকল রাজবন্দীদের ১৯২১ সালের মধ্যেই ভারতের কারাগারে ফেরৎ পাঠানো হল। সেলুলার জেলের রাজবন্দীর সংখ্যা অনেক কমে গেল। তারপর বার বছরের মধ্যে নতুন রাজবন্দীর ঝক্কি সেলুলার জেলকে আর নিতে হয়নি। অমনোযোগে বহু সেলের পলস্তারা খসলো। ছাদে ফাটল ধরলো। হ্যারিকেন নিবলো। ভীতিপ্রদ কান-খাজুরা সেলের আনাচে-কানাচে বাসা বাঁধলো। রুক্ষ জেল রুক্ষতর হলো। নির্বাসিত অরাজনৈতিক কয়েদীদের বড়ই মনঃকষ্ট। রাজবন্দীদের সংখ্যা বেশী থাকলে জেলকর্তৃপক্ষের অত্যাচার অবিচারের হাত হতে তারাও অনেক রেহাই পেয়ে যায়। এখন কারো টুঁ শব্দটি করার জো নেই। কোন ব্যাপারে মুখ খুলে আপত্তি জানালেই পানিশমেন্ট।

১৯৩০-৩১-৩২ সাল লবণ সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ-এ সারা ভারত তোলপাড়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কন্যাকুমারী হ'তে হিমালয় পর্যন্ত ভারত উথল-পাথল। অহিংসায় আস্থাহীন বিপ্লবী সংগ্রামীরা এই জনজাগরণের পুরো সুযোগ নেবার জন্য উন্মুখ। দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র কেসে ১৯৩০ সালে ভগত সিং, শিবরাম রাজগুরু ও সুকদেবের ফাঁসী হয়ে গেল ; বাকী আটজন আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে সেলুলার জেলে পাঠানো হলো। একই সালে

বাংলার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন আর একটি দুঃসাহসী অভিযান! অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টায় রাজনীতিক ডাকাতির সংখ্যা এই সময় খুব বেড়ে উঠে। অত্যাচারী পুলিশ অফিসারদের হত্যা করার দিকে প্রবল ঝোঁক এসে যায়। হাজার হাজার তরুণের কারাবরণে দেশের সব জেল ভর্তি। নতুন কয়েকটি বন্দীশিবির খুলতে হয়েছে; তাতেও কুলচ্ছে না। বিরামবিহীন তরঙ্গ। সরকার প্রমাদ গুণলেন। বিপ্লবী বন্দীদের সঙ্গে সত্যাগ্রহী নবাগত তরুণদের সংস্পর্শ ঘটলে দেশে যে আগুন জ্বলে উঠবে তা নেবান স্থকঠিন হবে। তাই সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী রাজবন্দীদের সেলুলার জেলে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিতে হলো। ১৯৩২ সালের মাঝামাঝি হ'তে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার, বাংলা ও মাদ্রাজের প্রায় তিনশত বিপ্লবীকে সেলুলার জেলে আবদ্ধ রাখার কাজ স্থরু হয়ে গেল! বাব্বর আকালী কেস, লাহোর ষড়যন্ত্র কেস, কাকোরী ষড়যন্ত্র কেস, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন কেস—এমনি বহু কেসের বিপ্লবী এসে পৌঁছলেন সেলুলার জেলে। কারাগার আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠলো।

বিগত ১০।১২ বছরের শান্ত পরিবেশে পুনরায় ঘূর্ণিঝড় উঠলো। চিফ্‌ কমিশনারের কাছে রাজবন্দীদের দাবী গেল—ভাল খাদ্য চাই, সেলে আলো চাই, পত্রিকা ও বইপুঁথি পড়ার স্থযোগ চাই। বন্দীদের দাবী গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা হলো না। ১৯৩৩ সালের ১৩ই মে ২৯ জন বন্দী অনশন আরম্ভ করলেন। অনশনের প্রথম দিনেই জামা-কাপড়, এমন কি ডিভিসন টু প্রিজনারদের টুথ ব্রাস ও টুথ-পাউডার কেড়ে নেওয়া হলো। সকলকেই জাঙ্গিয়া কোর্তা পরিয়ে দেওয়া হলো। ছ'দিনের দিন বিকাল থেকে জোর করে নাকের ভিতর পাইপ ঢুকিয়ে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা নেওয়া হলো। সে এক পৈশাচিক কাণ্ড। জোর করে চিৎ করে হাত-পা-মাথা চেপে চৌকির সাথে বেঁধে দেওয়া হতো। এই অবস্থায় ডাক্তার নাকের মধ্যে নল ঢুকিয়ে দুধ পেটে দেবার চেষ্টা করতেন। ভগত সিংএর সহকারী

হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মির কর্মী মহাবীর সিং বাধা দিলেন। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে নলটা ফুসফুসের পথে চলে যায়। ফুসফুসে দুধ ঢেলে দেবার ফলে অসহ্য যন্ত্রণায় ১৭ই মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রাতের অন্ধকারে পাথর বেঁধে তাঁর মৃতদেহ সাগর জলে নিক্ষেপ করা হয়। ঐ একই জুলুমে ২৬শে মে প্রাণ ত্যাগ করেন অনুশীলন দলের কর্মী ময়মনসিংহ রাজনৈতিক ডাকাতির দণ্ডিত বন্দী মোহন কিশোর নমোদাস। ২৮শে মে গানের কলি কণ্ঠে নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মোহিত মৈত্রেয়। পাবনার নতুন ভারেঙ্গা গ্রামে ছিল তাঁর বাড়ী। যুগান্তর দলের রংপুর-শাখার কর্মী। অস্ত্র আইনে পাঁচ বছরের সাজা নিয়ে সেলুলার জেলে আসেন। পর পর তিন জনের মৃত্যু সত্বেও বন্দীরা অটল রইলেন। ক্ষোভে দুঃখে তারা নির্বাক, কিন্তু প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়। সকল অনশনবন্দীকে একটানা ২৪ ঘণ্টা সেলে আবদ্ধ করে রাখার হুকুম হলো। ৪০ দিনের দিন পাঞ্জাব জেল-সমূহের আই. জি. কর্ণেল বেকার এলেন সরেজমিনে তদন্ত করতে। এ-যাবৎ অনশনরত বন্দীগণ শুধু জলপান করছিলেন। সেলে জল-রাখার কলসীতে বেকার সাহেব দুধ রাখার আদেশ দিলেন। জলের তৃষ্ণায় বন্দীরা দুধ খেতে বাধ্য হবেন। কোন কোন ক্ষুব্ধ বন্দী কলসী ভেঙ্গে প্রস্রাব করে রাখলেন। পিপাসায় অনেকে জ্ঞান হারালেন। কিন্তু কেউ নতিস্বীকার করলেন না। ৪৩ দিন পেরিয়ে গেল। কর্ণেল বেকার বিফল মনে দিল্লী ফিরলেন। ৪৫ দিন পরে চিফ্‌-কমিশনার উদ্যোগী হয়ে মীমাংসায় পৌঁছলেন। সেলের গায়ে বৈদ্যুতিক আলো জ্বললো, চৌকির সঙ্গে বিছানাপত্র দেবার ব্যবস্থা হলো, খাদ্যের সরবরাহে পরিবর্তন এল, বাঙ্গালীদের একদিন অন্তর একদিন মাছ জুটলো। এই অনশনের পর হতে বন্দীরা নানারূপ সুযোগ-সুবিধা পেতে লাগলেন। কারা-কানুন শিথিল হলো, পরিবর্তিত হলো। কাজের ঘণ্টা কমলো। কঠিন কাজ দেবার পরিবর্তে সাধ্যায়ত্ব কাজে নিযুক্ত করার বিধান চালু হলো। জেলের

মধ্যে খেলাধুলা, গান-বাজনা, নাটকের আয়োজন হতে লাগলো। পড়াশুনার দিকে প্রবল আগ্রহ দেখা দিল। নিয়মিত বহু পত্রিকা ও নানা বিষয়ের বই কেনা চলতে লাগলো। অতীতের রাজনৈতিক কার্যধারার মুল্যায়নের সময় এসেছে বলে বন্দীগণ মনে করলেন। ব্যক্তি-শৌর্যের পরিবর্তে গণ-সংগ্রামের পথ এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শ মনকে আকৃষ্ট করলো। গোটা জেলে এক বিরাট মানসিক আলোড়ন-বিলোড়ন দেখা দিল। নতুন জীবনের আস্বাদ পাবার জন্য প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠলো। জেলের সূচনায় যে কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা ছিল এতদিনে তার বহু পরিবর্তন ঘটে গেল। নিষ্প্রভ কারাজীবনে আনন্দের বন্যা এল।

কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আশাতীত পরিবর্তন ঘটে গেল। নতুন শাসন সংস্কার অনুযায়ী অচিরেই কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করতে চলেছে। বন্দীদের মনে হলো তাদের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার এটা একটি উত্তম সময়। দেশের মাটিতে শুধু প্রত্যাবর্তন করা নয়, সচেষ্ট হলে মেয়াদ শেষের আগেই মুক্তি পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। মেনল্যাণ্ডে ফিরে যাবার জন্য সকলের মনই ব্যাকুল।

সেলুলার জেলের রাজবন্দীদের ভারত সরকার রাজনৈতিক বন্দী (political prisoners.) বলে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হননি। কখনও বলা হয়েছে seditionist রাজদ্রোহী; কখনও terrorist সন্ত্রাসবাদী; কখনও dangerous ভয়ঙ্কর; কখনও বা permanently incarcerated prisoner—যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত বন্দী। উদ্‌গ্রীব বন্দীগণ তাঁদের ইচ্ছা লিখিতভাবে চিফ্‌-কমিশনার ও ভারত সরকারকে জানালেন। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে গভর্ণর জেনারেলের হোম মেম্বার স্যার হেনরী ক্রেক সেলুলার জেল পরিদর্শন করেন।

স্যার হেনরী মন্তব্যে লিখে যান—মেনল্যাণ্ডের জেলের তুলনায় সেলুলার জেলে রাজদ্রোহী বন্দীরা অনেক সুখে ও আরামে বাস

করছেন। তাঁর মন্তব্যের বিষয় ১৯৩৭ সালে বন্দীদের গোচরে এল। স্বভাবতই তাঁরা বিক্ষুব্ধ হলেন। ভারত সরকারের নিকট এক স্মারকলিপি পাঠালেন—এত সুখ ও আরাম তাঁরা চান না; কষ্টের মধ্যেও মেনল্যাণ্ডের জেলে ফিরে যেতে ইচ্ছুক। তাঁরা একটি তারিখও নির্দিষ্ট করে দিলেন। ২৪শে জুলাই-এর মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া না হলে ঐ তারিখ থেকে গণ-অনশন সুরু হবে। ১৮ই জুলাই চিফ্ কমিশনার মিঃ কস্‌গ্রেভকে জানিয়ে দেওয়া হলো বন্দীদের দাবী মেনে না নিলে ২৪শে জুলাই হ'তে গণ-অনশন আরম্ভ হচ্ছে। ২৩শে জুলাই মিঃ কস্‌গ্রেভ বন্দীদের ধমকানি দিয়ে এক নোট পাঠান। এখানে নোটের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো—

"As some of you have on 18th July addressed a petition to me saying that you propose going on hunger strike on 24th July, if you do not receive a favourable reply by that date. I take this opportunity of warning you that any of you going on hunger strike will, in addition to being liable to be prosecuted u/s 52 of the Prison Act, forfeit all remissions of sentences with retrospective effect and will be deprived for six months of all concessions as regards letters, interviews, library, receiving money and playing games. Further, prisoners in B class going on hunger strike will forfeit all concessions given to that class including lights in their cells, while prisoners in C class will also forfeit all concessions such as lights in their cells".

"In view of this serious warning from me, I hope that you all will abandon the idea of hunger striking and continue by good behaviour to earn remissions of your sentence".

"আপনাদের মধ্যে কয়েকজন ১৮ই জুলাই আমার কাছে একখানি চিঠি পাঠিয়েছেন। ২৪ তারিখের ভেতরে সরকারের তরফ থেকে

যদি কোন সন্তোষজনক জবাব না পান তাহলে ঐ তারিখ থেকে অনশন আরম্ভ করবেন বলে জানিয়েছেন। আপনাদের আমি সতর্ক করে দিচ্ছি যদি কেউ অনশন করেন তবে তার পূর্ব সঞ্চিত ও ভবিষ্যতের সমস্ত রেমিশন বাতিল করে দেওয়া হবে। চিঠি পাঠানো ও প্রাপ্তি, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, লাইব্রেরীর পুঁথি পড়া, টাকা গ্রহণ ও খেলাধুলা—সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ছয়মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। তাছাড়া প্রিজন অ্যাক্টের u/s 52 ধারায় তাদের অভিযুক্ত করা হবে। বি-ক্লাস প্রিজনারদের সেলের আলোসহ সব রকম সুযোগ যা এতদিন পেয়ে আসছেন সমস্ত বাতিল করে দেওয়া হবে। সি-ক্লাস প্রিজনারদের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ; সেলে আলো রাখা হবে না।

"আমি-যে বিশেষভাবে সাবধান করে দিলাম তাতে আশাকরি অনশনের পরিকল্পনা সকলেই পরিত্যাগ করবেন। সদাচরণের দ্বারা নিজেদের রেমিশান অর্জনের পথ উন্মুক্ত রাখুন।"

নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে অনশন আরম্ভ হয়ে গেল। প্রথমে ১৮৩ জন যোগ দেন। দিনকয়েকের মধ্যে সংখ্যা বেড়ে ২৩০ জনে পৌঁছল। এবার কারাবিধির বিরুদ্ধে অনশন নয়, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দাবীতে অনশন। এই গণ-অনশনের সংগ্রাম-কৌশল আলাদা। মেনল্যাণ্ডের সংবাদপত্রসমূহ সেলুলার জেলে গণ-অনশনের সংবাদ ফলাও করে প্রকাশ করলো। বন্দীদের নিজপ্রদেশে ফিরিয়ে আনবার আন্দোলন ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। দেউলী, হিজলী, বহরমপুর, আলিপুর, দম্‌দম্‌, বকসার, মেদিনীপুর ইত্যাদি সকল জেলে সেলুলার জেলবন্দীর দাবীর প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন আরম্ভ করলেন। দেশের নেতৃবর্গ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী সেলুলার জেলে তারবার্তা পাঠালেন। আন্দামান বন্দীদের দাবী যাতে ভারত সরকার মেনে নেন সে চেষ্টা তিনি করবেন বলে গান্ধীজী প্রতিশ্রুতি দিলেন। চিফ্‌-কমিশনার

মিঃ কস্‌গ্রেভের সুর নরম হলো। ৪৫ দিনের দিন অনশনের অবসান ঘটলো।

ভারত গভর্ণমেন্ট আন্দামানের সমস্ত রাজবন্দীদের মেনল্যাণ্ডে ফিরিয়ে আনতে সম্মত হলেন। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস হতে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারীর মধ্যে তিন দলে ২৯৪ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশের মাটিতে ফিরে এলেন এবং মুক্তি পেলেন। সেলুলার জেলের এক অঙ্কের যবনিকা পড়লো। রাজবন্দীর অভাবে জেলে শান্তি ফিরলো। সাধারণ কয়েদীরা মনমরা হলো। অনেক সেল খালি পড়ে রইল। শাসক গোষ্ঠী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

১৯৩৭ সালের গণ-অনশনের পর সাড়ে পাঁচ বছর সেলুলার জেলের কারা-কাহিনী গতানুগতিক। অন্যান্য কারাগারের মতই রুটিন বাঁধা নীরব দিনলিপি। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে অভাবনীয় রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটলো। আন্দামান নিকোবর জাপানের অধিকারে চলে গেল। মিলিটারী শাসক তিন বছরে ৮০০ হ'তে ১০০০ স্থানীয় বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরলো। পোর্ট-ব্লেয়ারের বিশিষ্ট ব্যক্তি, হাসপাতালের ডাক্তার, গভর্ণমেন্ট সার্ভেন্ট, ব্যবসায়ী কেউই জাপানীদের কোপ এড়াতে পারেন নি। মিথ্যা সন্দেহে অনেকেই অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করেছেন জেলে। ইংরাজী জানা সকলকেই গুপ্তচর বলে সন্দেহ জেগেছিল মিলিটারী শাসকদের মনে। এদিকে যতসব গুণ্ডা, ডাকাত ও খুনী কয়েদীদের প্রথমেই জেল থেকে ছেড়ে দেয় জাপানী কর্তৃপক্ষ। গোটা দ্বীপপুঞ্জে সন্ত্রাসের রাজত্ব। অপ্রত্যাশিত ও অভাবিত নিত্য নতুন ব্যক্তিকে ধরে এনে সেলে পোরা হতে লাগলো। ১৯৪৩ সালের শেষে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেলুলার জেল ঘুরে ঘুরে দেখেন। জেলে তখন অনেক বন্দী। তারা নেতাজীকে একান্তে পাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করছিল। নির্যাতনের কাহিনী পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে এই আশঙ্কায় জাপানী শাসক নেতাজীর পরিদর্শনের সময় সাময়িক ভাবে

অধিকাংশ বন্দীকে অন্যত্র সরিয়ে রাখে। ১৯৪২ হ'তে '৪৫ সাল পর্যন্ত তিন বছর অচিন্ত্যনীয় অত্যাচারের রক্ত-রাঙ্গা অগণিত কাহিনীতে সেলুলার জেল রঞ্জিত হয়ে উঠে।

প্রতিরক্ষা সুরক্ষিত করার জন্য ইটের প্রয়োজন দেখা দিলে জেলের তিন ও চার নম্বর উইং ভেঙ্গে ফেলা হয়। জাপানীরা জেলে বোমা ফেলেনি। এটা মিথ্যা প্রচার। এই ইট দিয়ে পোর্টব্লেয়ার ও আশেপাশে তৈরী হয় প্রতিরোধের উপযোগী ট্রেঞ্চ, ব্যাফল্‌ওয়াল ও সৈন্যদের পাহারা দানের নিরাপদ ঘাঁটি। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে পুনরায় পট পরিবর্তন হলো। বৃটিশ আবার আন্দামান নিকোবর অধিগ্রহণ করলো। জাপানীরা যাদের বন্দী করে রেখেছিল তারা মুক্তি পেল। যাঁরা জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল তাদের ধরে সেলুলার জেলে আবদ্ধ করলো। সেলুলার জেলের এক সংক্ষিপ্ত বৈচিত্র্যময় অধ্যায় এইভাবে শেষ হয়।

বহু সহস্র স্বাধীনতা সংগ্রামীর পদধূলিতে পোর্টব্লেয়ারের মাটি পবিত্র। সারা ভারতের বিপ্লবীর দেহ স্পর্শে সেলুলার জেল ধন্য। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের বিদ্রোহী সিপাইদের নিয়ে বন্দী শিবিরের পত্তন। ১৮৮৯ সালে পুণার বাসুদেব বলবন্ত ফাডকের একান্ত অনুরাগী ৭০।৮০ জন নির্বাসিত হয়ে আসেন এখানে। তারপর এসেছেন ওয়াহবী বিদ্রোহী, বঙ্গভঙ্গ রোধের বিদ্রোহী, মোপলা ও থারতয়াডী বিদ্রোহী, নাসিক ও লাহোর ষড়যন্ত্র এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের রাজদ্রোহী। আত্মত্যাগ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের উজ্জ্বল সাক্ষী সেলুলার জেল। লোকচক্ষুর অন্তরালে কত বন্দী মৃত্যু বরণ করেছেন। কত বন্দী উন্নত মস্তকে নির্মম নির্যাতন সহ্য করেছেন। এক নম্বর উইঙের দোতলা তেতলার সেলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখবার সময় মুক্তি সংগ্রামের রক্তরাঙ্গা কাহিনী ছায়াছবির মত মানসপটে দাগ কেটে দেয়। গম্বুজগাত্রে শ্বেতপাথররে ফলকে রাজবন্দীদের নামের তালিকায় চোখ বুলালে আত্মগৌরবে

বুক ভরে উঠে। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাঙ্গালী রাজবন্দীর সংখ্যা কত বেশী! এইসব মরণজয়ী দুর্জয় সাহসী বেপরোয়া ত্যাগী বিপ্লবীদের দু'হাত মাথায় তুলে প্রণতি জানিয়েছি। সেলুলার জেলের পবিত্র ধূলি তুলে ললাটে তিলক পরেছি। মুক্তি-তীর্থ সেলুলার জেল! মনে মনে উপলব্ধি করেছি বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা ধরণীর ধূলায় তো নিষ্ফল হয়নি। ভারত স্বাধীন হয়েছে। স্বমহিমায় দেশ আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সেলুলার জেলের টাওয়ারের মাথায় দাঁড়িয়ে ভারাক্রান্ত চিত্তে একটি প্রশ্নই বার বার মনে জেগেছে—আজ কেন বাঙ্গালী ত্যাগে, শৌর্যে, বিদ্যায়, কৃচ্ছ্র-সাধনে, দেশগঠনে পশ্চাতে পড়ে যাচ্ছে—যার অতীত এত গৌরবময়!

১৯৪৬ হ'তে ১৯৪৮ সাল—এই বাইশ বছর সেলুলার জেলের চরম দুর্দিনের মধ্যে কেটেছে। দিনে দিনে অবলুপ্তি প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। দরকারি নথিপত্র বিনষ্ট। সকল অঙ্গে মলিনতার ছাপ। সরকারের তাচ্ছিল্য ও অবহেলা। নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় প্রাচীন এক কারাগার!

অধিকার ফিরে পাবার পর যে ক'দিন বৃটিশ রাজত্ব ছিল সেলুলার জেলের দিকে তারা আর ফিরে তাকায় নি। এই জেল পরাধীন ভারতে যে মুক্তি-তীর্থের এক উজ্জ্বল ভূমিকা নিয়েছিল স্বাধীন ভারত সরকার সে-স্বীকৃতি দেওয়ার কথা উপলব্ধি করেনি। মুক্তি সংগ্রামের দীপ্যমান এই স্মারকচিহ্নের বিলুপ্তি ঘটানো দিল্লীর একদল উচ্চমহলের অভিসন্ধি ছিল। বোমা ফেলে জাপানীরা গম্বুজসহ জেলটি ধ্বংস করেছে—এই মিথ্যা অপবাদ সুকৌশলে প্রচার করেছে শাসকগোষ্ঠী। জাপানীরা ভেঙ্গেছিল ঠিকই—শুধু দুই ও তিন নম্বর উইং। সেন্ট্রাল টাওয়ারের মাথা ধ্বসে যায় ১৯৪১ সালের ভূমিকম্পে। স্বাধীন ভারতের পরিচালকবর্গ ও আন্দামানের তৎকালীন চিফ্-কমিশনার জেলের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারের কথা চিন্তাও করেননি; বরং চার ও পাঁচ নম্বর উইং বিনা দ্বিধায় ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন।

সিপাই বিদ্রোহের সময় থেকে নেতাজীর আজাদ হিন্দ সরকার গঠন পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপের সঙ্গে সেলুলার জেল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেখানে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশপ্রেমিকগণ বন্দীজীবন কাটিয়েছেন, আত্মোৎসর্গ করেছেন; উত্তরকালে যে কারাগার তরুণদের মনে দেশপ্রেমের দীপশিখা জ্বালাবে সেই গৌরবমণ্ডিত স্মারক ধ্বংস হতে দেওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। বাইশ বছর ধরে নির্বিকার চিত্তে এই অপরাধ অনুসৃত হয়েছে।

সেলুলার জেলের সম্পূর্ণ অবয়ব একমাত্র ছবিতে ছাড়া এখন আর দেখবার উপায় নেই। দুই, তিন, চার ও পাঁচ নম্বর উইং নিশ্চিহ্ন। একনম্বর উইং বর্তমানে ডিস্ট্রিক্ট জেল; ছয় নম্বর উইং ব্যাচেলার কর্মচারীদের মেস; সাতনম্বর উইংয়ের ১০টি সেল জেলের রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, আর বাকীটা মেডিকাল স্টোর। জেলের প্রবেশ মুখের ভবনটির একতলা দখল করে রয়েছে—জেলরক্ষীদের পরিবারবর্গ। ভগ্ন অন্যান্য উইংগুলির ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে বিরাট হাসপাতাল গড়ে তোলার কাজ স্বরু হয়ে যায় ১৯৪০-৪১ সালে। আধুনিক সব রকম ব্যবস্থাপনাসহ ১৯৪৪ সালে হাসপাতালের উদ্বোধন হয়। দ্বারোদ্ঘাটন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। সভাপতিত্ব করেন উপরাষ্ট্রপতি—ডঃ জাকির হোসেন। নামকরণ হয়েছে—"গোবিন্দ বল্লভ পন্থ স্মৃতি হাসপাতাল"। "শহীদ স্মৃতি হাসপাতাল" নামে অভিহিত করলে বোধকরি যথোচিত স্ববিবেচনার পরিচয় মিলতো। কিন্তু সেদিন নেতাদের মানসপটে এ-কথা জাগেনি। জেলের এই অনভিপ্রেত রূপান্তর তাদের মনে কোনরূপ দাগ কাটেনি।

আন্দামান নির্বাসিত প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দীদের মৈত্রীসংঘ ১৯৪৮ সালের ৮ই এপ্রিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দৃষ্টি সেলুলার জেলের দিকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হন এবং কারাগারের অস্তিত্ব বিলুপ্তির সুপরিকল্পিত প্রয়াস বন্ধ করতে অনুরোধ জানান।

জেলের যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তাকে অবিলম্বে জাতীয় স্মৃতিসৌধে রূপান্তরিত করার অনুরোধ জানিয়ে ১০৬ জন প্রাক্তন আন্দামান বন্দীর সহিযুক্ত এক স্মারকলিপি দাখিল করা হয়। ভারতবাসী আজ যে স্বাধীনতার মুক্তবায়ু উপভোগ করছে তার কঠিন কঠোর এক উৎস মুখের সঙ্গে উত্তরকালে নাগরিকগণের যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখা হোক—প্রধান মন্ত্রীর নিকট এই ছিল তাঁদের দাবী ও অনুরোধ। ১৯৫৮ সালের ২রা মার্চ কলিকাতায় সারা ভারতের আন্দামান নির্বাসিত প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দীগণ এক সমাবেশে মিলিত হন। পোর্ট ব্লেয়ারে একটি 'পাইলট টিম' পাঠাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাঁচজনের এক দল এই সালেই ২০-২৫শে মার্চ সেলুলার জেল পরিদর্শন করেন। এই টিমে ছিলেন—সর্বশ্রী বিশ্বনাথ মাথুর, বিনয়কুমার বসু, বিজয় ব্যানার্জী, সমর ঘোষ ও বঙ্গেশ্বর রায়। দিল্লী ও কলিকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে জেলের মর্মান্তিক দুরবস্থার কথা এঁরা দেশবাসীর গোচরে আনেন। ঠিক এক বছর পর ৮ই এপ্রিল (১৯৫৯) আন্দামান নির্বাসিত প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দীদের মৈত্রীসংঘের প্রতিনিধি প্রধান মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করেন। সর্বশ্রী বিশ্বনাথ মাথুর, দেবকুমার দাশ, খুশিরাম মেহতা, বিনয়কুমার বসু ও বঙ্গেশ্বর রায়কে নিয়ে প্রতিনিধিদল গঠিত হয়েছিল। এবারও তাঁরা নির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ স্মারকলিপি দাখিল করেন। এক মাসের মধ্যে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রবিভাগ মৈত্রীসংঘকে ভারতসরকারের সিদ্ধান্ত জ্ঞাত করেন। সেন্ট্রাল টাওয়ার সহ সেলুলার জেলের তিনটি উইং জাতীয় স্মৃতিসৌধে রূপান্তরিত করা হবে।

প্রস্তাবিত জাতীয় স্মৃতি-সৌধের যথোপযুক্ত প্ল্যান ও প্রোগ্রাম দাখিল করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের নির্দেশে Expert Team (Committee) ১৯৫৯ সালের ১৩-১৭ই অক্টোবর জেল দেখতে আসেন। মৈত্রীসংঘের দুইজন প্রতিনিধি পরিদর্শন কালে উপস্থিত

ছিলেন। Expert Team-এর সুপারিশের প্রধান অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

Principal recommendations of the expert Team (committee) on preservation of Cellular Jail as National Memorial are as follows :

(i) "In view of the unique importance of the Cellular Jail in the history of India's freedom-struggle the surviving portions of the Cellular Jail consisting of the entrance gate-way, the existing wings (Nos. 1, 6 and 7) together with the central watch-tower and the remains enclosed by it should be maintained as a National Memorial, and used as an institution of national importance. (On account of the fact that the construction of the Jail commenced as late as 1896 and thus the building is not older than a hundred years, it cannot be 'protected' as an Ancient Monument and brought under the purview of A. M. & A. S. R. Act, 1957).

(ii) Consistent with above recommendations, the committee considered the question of having the present jail removed out of the building. It, however, felt that the present jail should continue to be located in the building but it should be shifted from wing No 1 to wing No. 6 which is at present being used as a Bachelor's Mess. The retention of the jail in wing No. 6 is suggested with a view to imparting a grim character to the entire precincts. Such a use is warranted as the Celluar Jail was not exclusively used for political prisoners and there was almost an unbroken continuity of such a use. Further, this would remind to the convicts of the noble cause for which the earlier inmates of the jail had sacrificed their lives and may help in reforming their character. However, the

দেশপ্রেমের এক তাজমহল বানানো হোক—আন্দামান নির্বাসিত প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দীদের মৈত্রী সংঘের এই আবেদনের পশ্চাতে দেশবাসীর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

॥ চার ॥

আন্দামান নিকোবরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এখানকার বহুবিচিত্র মানুষ। ছোট্ট দ্বীপপুঞ্জের বিচিত্র মানুষকে জানার আছে অনেক। একাধিক আদিম মানব গোষ্ঠীর নমুনা দেখতে পাওয়া যায় এখানে। কত কাহিনী, কত কৌতূহল, কত বিস্ময় ছড়িয়ে আছে দেশে-বিদেশে এদের জীবন-যাত্রা নিয়ে। আবার নানা ভাষা, নানা ধর্ম ও নানা বর্ণের সভ্য মানুষের সংমিশ্রণ ঘটেছে এই দ্বীপপুঞ্জের মাটিতে। যেন একটি মিনি 'ভারতবর্ষ'! স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ববঙ্গের বহু উদ্বাস্তু বাঙ্গালী এই বহু মানুষের ধারায় এসে মিলিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের 'ভার্জিন সয়েল' এতদিনে দ্রুত সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে।

আন্দামান নিকোবরের বর্তমান অধিবাসীদের তিন ভাগে ভাগ করে বুঝতে হবে—(১) একাধিক আদিবাসী গোষ্ঠী (aborigins) (২) লোকাল বর্‌ন্ (local born) নবাগত উদ্বাস্তু (later settlers)। আদিবাসী ছাড়া সকলেই মূলত বহিরাগত। আন্দামানের আদিবাসী আন্দামানিজ, জারোয়া, ওঙ্গে ও সেণ্টেনালিজ; নিকোবরে-নিকোবরী ও শম্‌পেন। একমাত্র নিকোবরী ছাড়া আর সকলেই সভ্য দুনিয়া থেকে বিযুক্ত। নিকোবরীরা চলতি যুগের সঙ্গে পা ফেলে নিজেদের বিকাশ ঘটিয়েছে। অন্যেরা বিনষ্টের মুখে। এক একটি গোষ্ঠী এক একটি দ্বীপে ছড়িয়ে রয়েছে। কয়েদী বসতির সূত্রপাতের আগে এরাই ছিল দ্বীপপুঞ্জের সাবেকি বাসিন্দা।

আদিবাসী : আন্দামানিজ—আন্দামানের প্রধান দু'টি অংশ—গ্রেট আন্দামান ও লিট্‌ল আন্দামান। গ্রেট আন্দামানের আবার তিনটি অংশ—নর্থ, মিডল ও সাউথ। গ্রেট আন্দামানের আদিবাসী 'আন্দামানী'। সাউথ ও মিডল আন্দামানের গভীর অরণ্যে ছিল এদের বাস। লিটল আন্দামানের আদিবাসী 'ওঙ্গে'। কোন কোন পণ্ডিতের অনুমান ওঙ্গেদের একটি শাখা জারোয়া; আর একটি শাখা সেন্টিনেলিজ। ঘটনাচক্রে কোন সময় নিজ গোষ্ঠী ও বাসভূমি ছেড়ে অন্য দ্বীপে বাস করতে আরম্ভ করে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অনেক নৃতত্ত্ববিদ এ মত মেনে নেননি। এ-যাবৎ নৃতাত্ত্বিক জরীপ যা হয়েছে তা এদের সংখ্যা ও বসবাসের এলাকা নিয়ে।

আন্দামানিজ ও জারোয়াদের গতিবিধি গভীর অরণ্যে। এরা প্রধানতঃ অরণ্যচারী এরেম্‌টাগা। সেন্টেনেলিজ ও ওঙ্গেরা অরণ্যে থাকলেও প্রধানত সমুদ্রতীরের আশেপাশে বাস করে। এরা তাই এরিয়োটো। আন্দামানিজরা আজ পৃথিবী থেকে মুছে যেতে বসেছে। হয়তো আর বছর কয়েক পরে শুধুমাত্র ইতিহাসের পাতায় এদের নাম উল্লেখ থাকবে। অতীতে গ্রেট আন্দামানে আন্দামানীই ছিল প্রধান অধিবাসী। বাণিজ্য জাহাজের নাবিক, সমুদ্রগামী অনুসন্ধানীর দল এদের নামে শিউরে উঠতো। নৃশংস নরঘাতক হিসাবে এদের নামে দেশ-বিদেশে প্রচারিত হয়েছে। আন্দামানিজদের বাসভূমি ইংরেজ দখলে গেলেও পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। কয়েদী উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হবার পর থেকে জঙ্গল সাফাই-এর কাজ সুরু হয়ে যায়। আন্দামানিজরা যায় চটে। সংখ্যায় তখন তারা অনেক। নিজেদের রাজ্য বেদখল হোক কে চায়! শলাপরামর্শ চলতে থাকে। একদিন তীর-ধনুক বল্লম নিয়ে অতর্কিতে দলবদ্ধভাবে সেটেলমেন্টের এবারডিন আক্রমণ করে। কিন্তু যুদ্ধে হেরে যায়। পরাজয়ের গ্লানি তারা আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

এরপর আন্দামান এ্যাডমিনিসট্রেশন বৈরী আন্দামানীদের মন জয় করতে উদ্যোগী হয়। 'আন্দামান হোম' স্থাপিত হলো। মিশনারীরা এলেন। কিন্তু সুফল দেখা দেয়নি। জংলীদের সভ্য করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এরা বশে এসে যায় বটে, তবে সভ্য মানুষের দোষ-ত্রুটি অনাচার সব দিনে দিনে আয়ত্ত করে নিল।

১৯০১ সালে আদম সুমারীর সময় আন্দামান নিকোবরেও লোক-গণনা করা হয়। রিপোর্টে এই দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে—সে সময় মোট জনসংখ্যা ছিল ২৪,৬৪৯ জন। আন্দামানিজ ১৮৮২, নিকোবরিজ ৬,৫১১ এবং বন্দীবাসিন্দার সংখ্যা ১৬,২৫৬ জন। আন্দামানিজদের সংখ্যা যে দ্রুত কমে যাচ্ছে তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। মাত্র একটি জেনারেশন আগেও তাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার ছিল। স্থানীয় গেজেটিয়ারে দেখা যায় অনেক দিন ধরে, এখনকার আদিম মানুষের সংখ্যা স্থিতিশীল হয়ে উঠেছিল। আন্দামানিজরা অনেকগুলি ট্রাইবে বিভক্ত ছিল। যেমন, চারিয়ার, কোরা, তাবো, ইয়েরে, কেডে, জুওয়াই, কোল, বোজিগিয়ার, বালাওয়া, বিয়া, জারোয়া, ওঙ্গে। কেডে ও জুওয়াই ছিল দুটি বড় ট্রাইব। জারোয়া এখনও আন্দামানের আতঙ্ক। ওঙ্গেরা নিরীহ। লিটল আন্দামানে বাস। এরাও শেষ হয়ে আসছে। অন্যান্য ট্রাইবের এখন আর কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। নারী-পুরুষের সংখ্যা এই সময় ছিল প্রায় সমান সমান। ট্রাইবদের দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু হয়ে যাবার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেকে বলেন—সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগের আক্রমণ, বহুসংখ্যক সভ্য মানুষের সংগে হঠাৎ সংযোগ, বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বনজঙ্গল পরিষ্কার করায় আচমকা রোদ ও বাতাসের প্রভাব, অতিরিক্ত তামাক পাতা খাওয়া —সব মিলে তাদের মৃত্যু হার বাড়িয়েছে এবং বংশবৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া বহিরাগত নিউমোনিয়া ১৮৬৮ সালে, সিফিলিস

১৮৭৬ সালে, হামজ্বর ১৮৭৭ সালে ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ১৮৯২ সালে এপিডেমিক আকারে দেখা দেয়।

বারীন ঘোষ মহাশয় তাঁর The Tale of My Ex le গ্রন্থে আন্দামানীর সংখ্যা উল্লেখ করেছেন ৮।১০ হাজার। দশ বারটি উপজাতি শাখায় এঁরা বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক শাখার ভাষা ছিল নাকি আলাদা। ইয়ারে ও কেডে সবচেয়ে বড় গ্রুপ ছিল। দক্ষিণ আন্দামানে যে শাখা থাকতো তাদের সংঘশক্তি ছিল প্রবল। প্রায় সব শাখাই বর্তমানে লোপ পেয়ে গেছে। সব শাখারই বংশ-বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গেছে। ১৯৫১ সালের সেন্সাসে দেখা যায় দক্ষিণ আন্দামানের স্ট্রেট দ্বীপে এখন মাত্র ২৪ জন আন্দামানী বাস করে। ১৫ জন পুরুষ, ৯ জন নারী। অন্য কোন দ্বীপে সামান্য কিছু আছে কিনা সঠিক বলা সম্ভব নয়। নিরীহ সরল মুখ এদের। বৈরী নয়, সভ্য মানুষের বশীভূত। চাষ-আবাদ কিছু করে না। সরকার ফ্রি রেশন সরবরাহ করছেন। কখনও কোন শিকার ধরলে পোর্ট ব্লেয়ারে নিয়ে আসে। বেচে দিয়ে বিড়ি, সুখা, আফিং, মদ কিনে নিয়ে যায়। আন্দামানীদের দু'চার জন এখন বুশ পুলিশে কাজ করে। জামা-কাপড়ও পরে। পোর্ট ব্লেয়ার শহরে যদিও যাতায়াত করে, কিন্তু এখানে থাকতে চায় না। আজকের আন্দামানিজ যে ক'জন রয়েছে তাদের দেখে এদের পূর্ব পুরুষদের আচার-আচরণ সম্পর্কে ধারণা করা যাবে না।

সভ্যজাতির সংশ্রবে এসে একটি আদিম জাতি কী ভাবে ধ্বংস হয়ে গেল তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত এই আন্দামানীরা। নিজ বাসভূমে আজ তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

জারোয়াঃ সাউথ ও মিডল আন্দামানে পশ্চিম উপকূল বরাবর গভীর জঙ্গলে জারোয়ার বাস। সভ্য মানুষের প্রতি ওদের ভয়ানক আক্রোশ। এলাকার ধারে কাছে সভ্য মানুষ ঢুকলে তার আর রক্ষা নেই। সঙ্গে সঙ্গে তীর মেরে দেবে। অব্যর্থ ওদের লক্ষ্য।

নিশ্চিত মৃত্যু। হাতে ছ'ফুট লম্বা তীর ধনুক থাকে। ওদের এলাকার নাকি একটি বিশেষ চিহ্ন আছে যা সাধারণ মানুষ অনেক সময় বুঝতে পারে না। মার্বল ও প্যাডক কাঠের ঘন বনাঞ্চল জারোয়াদের প্রিয় স্থান। কাঠ দুটি বিশেষ মূল্যবান। এই কাঠের উপরে সভ্য মানুষের দারুণ লোভ। জারোয়ার ভীষণ ক্ষোভ। বনজঙ্গল পরিষ্কার হোক—এটা তারা চায় না। দক্ষিণ হতে উত্তর আন্দামান পর্যন্ত বিরাট ট্রাঙ্ক রোড তৈরী হচ্ছে। জারোয়ার এলাকা ভেদ করে অথবা পাশ দিয়ে রাস্তা নিয়ে যেতে হয়েছে। বহু গাছ ও জঙ্গল কাটা পড়েছে। এই রাস্তা তৈরীর সময় জারোয়াদের অতর্কিত আক্রমণে প্রতি বছরই একাধিক শ্রমিক তীরের আঘাতে মারা যায়। বন বিভাগ ও পূর্ত বিভাগের কর্মীদের বড় ভয়ে ভয়ে পথ চলতে হয়। যেসব উদ্বাস্তুদের জারোয়া এলাকার কাছে বসতি দেওয়া হয়েছে তাদের কয়েকজন জারোয়ার তীরে প্রাণ হারিয়েছে। জারোয়ার গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিব থাকবার জন্য সরকার বুশ পুলিশ (Bush Police) নিয়োগ করেছেন। জারোয়াদের আক্রমণ করার নির্দেশ নেই সরকারের। তাদের ক্রমশঃ বন্ধু করে তোলাই সরকারী নীতি। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ওদের বৈরী ভাব দূর করা যায়নি। পুলিশের গুলিবিদ্ধ হয়ে সময় সময় দু' একটি জারোয়া মারা যায়। যুথবদ্ধ জারোয়া তৎক্ষণাৎ মৃতদেহ সরিয়ে ফেলে। পুলিশ এ-যাবৎ কোন মৃতদেহ সংগ্রহ করতে পারেনি। শুনা যায় জাপানী অধিকারের সময় গুপ্তচর অনুসন্ধানের কাজে রত কয়েকজন জাপানী জারোয়ার তীরে নিহত হয়। ক্রুদ্ধ মিলিটারী শাসক প্লেন থেকে বোমা ফেলে কিছু জারোয়া মেরে ফেলে। নারিকেল জারোয়াদের একটি প্রিয় খাদ্য। সভ্য মানুষের নারিকেল সংগ্রহের চেষ্টায় তারা ক্ষুব্ধ। ফল-মূল যেমন খায়, তেমনি শূকর হরিণ মাছ শিকার করে খায়। সভ্য মানুষকে তারা একেবারে সহ্য করতে পারে না।

১৯৩৪ সালে তিনজন জারোয়া ধরা পড়েছিল। সেলুলার জেলে

কিছুদিন আটক রাখা হয়। কাল কুচকুচে মানুষ। মাথায় থোকা থোকা কোঁকড়ানো চুল। মুখে দাড়িগোঁফ নেই। পাঁচ ফুট মত লম্বা। গা খালি। নৃতত্ত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ ওদের ভাষা বুঝবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। খাওয়ার জিনিস দিয়ে পোষাক পরিচ্ছদ দিয়ে কিছুতেই ওদের মন জয় করা সম্ভবপর হয়নি। এদিকে প্রকৃতির পরিবেশ থেকে ছিনিয়ে আনায় ওদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। শেষ পর্যন্ত পুনয়ায় জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। জারোয়ার সংখ্যা কত বলবার উপায় নেই।

আর একটি গ্রূপ সেণ্টিনেলিস দ্বীপে বাস করে। এরাও বৈরী উপজাতি। সেণ্টিনেলিজ নামে পরিচিত। এদের কয়েকজন ছাড়া ঐ-দ্বীপে আর কেউ বাস করে না। এদের সংখ্যাও অজ্ঞাত, তবে খুবই কম এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এদেরও বশে আনা সম্ভবপর হয়নি।

লিটল্ আন্দামানে আদিম মানুষের যে গ্রূপ বাস করে তারা ওঙ্গে নামে পরিচিত। যথাস্থানে এদের বিষয় আলোচনা করা হবে।

লোকাল বর্ন্ ঃ—পোর্ট ব্লেয়ারের পর মায়াবন্দর বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাব-ডিভিসন। ডিগলীপুর, মায়াবন্দর ও রঙ্গত— এই তিনটি তহশীল নিয়ে গঠিত। মায়াবন্দরের এরিয়া সবচেয়ে বড় ১৩৪৮ বর্গ কি. মি. ; রঙ্গত ১০৯৮ বর্গ কি. মি. ; ডিগলীপুর ছোট ৮৮৪ বর্গ কি. মি.। ঠিক শহর বলতে যা বোঝায়—এখানে তার পরিচয় পাওয়া মুশকিল। তহশিল আপিসসহ আরো গুটিকতক সরকারী আপিস আছে। পাকা কোয়ার্টারে অফিসারগণ বাস করেন। হাই ও প্রাইমারী স্কুল আছে। হাসপাতাল আছে। পিচ ঢালা পাকা রাস্তা হালে হয়েছে। এসব উন্নতিই ১৯৪৭ সালের পর। আগে ছিল কাঠ রপ্তানীর একটি বড় গঞ্জ। মিডল আন্দামানের সমস্ত কাঠ চালান যেত এই বন্দর থেকে। বর্তমানে নর্থ ও মিডল আন্দামানের এ্যাসিট্যান্ট কমিশনারের আপিস এখানে।

স্বাধীনতা লাভের বেশ কিছুদিন আগে শুধু মায়াবন্দরের জঙ্গল নয়, গোটা নর্থ আন্দামানের অরণ্য বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকায় একশ' বছরের ইজারা দেওয়া হয় পি. সি. রায় এণ্ড কোম্পানীকে। পি. সি. রায় ছিলেন তখন এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় কাঠের কারবারী। ব্রহ্মদেশে ছিল তাঁর বড় কারবার। নিজের হাতি ও লোকলস্কর, নিজের স-মিল, নিজের জাহাজ বোট। একেবারে জমজমাট কারবার। বাঙ্গালী বহুক্ষেত্রেই ভারতে পথপ্রদর্শকের কাজ করেছে; ব্যবসাক্ষেত্রেও করেছে। পি. সি. রায়ের এই কাঠের কারবার বেশী দিন টেকেনি। এখন সবই বন্ধ। যে যার মত লুটেপুটে নিয়েছে। বন্দরে রয়েছে কিছু ধ্বংসাবশেষ।

মায়াবন্দর শহরের গেষ্ট হাউস, সরকারী আপিস ও কোয়াটারের পাশ দিয়ে বিকালে পাকা রাস্তায় হাঁটছি। সঙ্গে বকুল ও বাসনা। উৎসুক মন নিয়ে সব দেখছি ও খোঁজখবর নিচ্ছি। বাজারের কাছে এক ভদ্রলোক বললেন, "একটু এগিয়ে গিয়ে হাসপাতালটা দেখে আসুন। ডাঃ সেনগুপ্ত বেশ অমায়িক লোক।" মাইল খানেক পথ চলার পর দেখতে পেলাম টিলার উপরে হাসপাতাল। হাসপাতালে যাবার পথেই স্টাফ কোয়াটার। লোকে ডাক্তারবাবুর কোয়াটার চিনিয়ে দিল। বারান্দায় একটি তরুণ বসে ছিল। গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ডাঃ সেনগুপ্ত কোথায়?" ছেলেটি আমার বাংলা প্রশ্নের জবাব দিল হিন্দীতে, "বৈঠিয়ে, আভি আয়েঙ্গে।" বিস্ময়ের সঙ্গে এবার হিন্দীতে প্রশ্ন করলাম, "উনকি বিবি?" জবাব পেলাম, "বাথরুমমে গোসল করতি, আভি আয়েগী।" পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, "সায়দ, ডাঃ সাহব আপকা রিস্তেদার হতে হৈঁ?" ছেলেটি বললো; "জী হাঁ, উনকি বিবি মেরি বহিন।" আমি চেয়ারে এবার আঁটসাঁট করে বসে পড়লাম। ক'দিন যাবৎ যা খুঁজে ফিরছি এবার তার প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে গেল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যে তথ্য উদ্ঘাটন করলাম তা সংক্ষেপে এই—ছেলেটির নাম ইকবাল দে।

ওরা ছ'বোন, দু'ভাই। বড় ভাই-এর নাম অনন্তরাম দে। বোনদের নাম—গুলসান, রোসান, হাসান, আলাম, প্রেম ও ফুল। এদের পিতা পূর্ণলাল দে ও মাতা রহমান। পূর্ণলালের পিতা সীতারাম দে, মাতার নাম ছেলেটি বলতে পারেনি। সীতারাম বাঙ্গালী। নির্বাসিত কয়েদী হয়ে আন্দামানে এসেছিল। এক অবাঙ্গালী মুসলমান মেয়ে কয়েদীকে শাদী করে ফ্রি কনভিক্ট হিসেবে সাউথ আন্দামানে সংসার পাতে। ডাঃ অসিতকুমার সেনগুপ্ত মেনল্যাণ্ড থেকে আন্দামানে এসে চাকুরি নেন। রোসানকে বিয়ে করে গৃহী হয়েছেন। তাঁদের কয়েকটি কাচ্চাবাচ্চা। রোসানের মুখের ভাষা হিন্দী, লেখার ভাষা উর্দু। মায়াবন্দরে এক স্কুলে তিনি শিক্ষয়িত্রী। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তারবাবু এসে গেলেন। রোসানও স্নান সেরে এসে বসলেন। কয়েক মিনিট গল্পগুজব করে লোকাল বর্‌ন্ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

কয়েদী হয়ে এসে যারা পাকাপাকিভাবে এখানে বাসা বেঁধেছে তাদের বংশধরগণ লোকাল বর্‌ন্ নামে পরিচিত। ফ্রি-কনভিক্টদের বংশধরগণ লোকাল বর্‌ন্। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত আন্দামানের অধিবাসী বলতে এই সব লোকাল বর্‌ন্‌দেরই বোঝাত। আদিবাসী প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে যারা সেট্‌লার হয়েছে তাদের অধিকাংশই বাঙ্গালী উদ্বাস্তু। আন্দামানে কনভিক্ট সেটেলমেন্ট-এর সূত্রপাতেই স্যার স্ট্যাম্‌ফোর্ড র‍্যাফলস্ (Sir Stamford Raffles) প্রবর্তিত নিয়মাবলী চালু করা হয়। এই নিয়মগুলি ছিল বাস্তব বুদ্ধি প্রসূত—(১) কয়েদীদের মধ্য থেকেই তাদের তদারক করার লোক ঠিক করা, (২) কিছুকাল কারাভোগের পর কয়েদীদের সেলফ্ সাপোর্টার (Self supporter) হতে সাহায্য করা, (৩) একটা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হবার পর কয়েদীদের বিবাহে উৎসাহিত করা, (৪) পেনাল সেটেলমেন্টে কয়েদীদের পাকাপাকি বাসিন্দা বানান। আন্দামানে কয়েদী আসতো দু'রকম—'টারম্

কনভিক্ট' এবং 'লাইফ-কনভিক্ট'। সাত বছরের বেশী ও পঁচিশ বছরের কম মেয়াদের কনভিক্টদের বলা হতো 'টারম্-কনভিক্ট'। পঁচিশ বছর বা তার বেশী সময়ের সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বলা হতো 'লাইফ-কনভিক্ট'।

প্রথম ছ'মাস সব কয়েদীকে জেলের মধ্যে একাধিক কঠিন কাজের মধ্যে ঘুরিয়ে নেওয়া হতো, যেমন, ঘানীটানা, নারকেলের ছোবড়া পেটানো ইত্যাদি। ছ'মাস পর কয়েদীরা জেলের বাইরে আসার সুযোগ পেত। এই সময় টিণ্ডাল, পেটি-অফিসার ও জমাদারের তত্ত্বাবধানে তাদের রাস্তা তৈরী, জঙ্গলকাটা, পাথর ভাঙ্গা, জলা পরিষ্কার—এই ধরণের কাজে নিয়োগ করা হতো। দিনের শেষে বিভিন্ন ব্যারাকে তালাবদ্ধ থাকতো। আজকের তক্তকে ঝক্ঝকে হ্যাডো, ডিলানিপুর, ফোয়েনিক্স বে, এবারডিন, জংলীঘাট এলাকায় হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে বহু কয়েদীর অশ্রু ঝরেছে। সেলুলার জেলে আসবার পর তিন বছরের মধ্যে যাদের কোন জেল পানিশমেণ্ট হয়নি এবং যাদের সদব্যবহারের রেকর্ড থাকতো এমন টারম্ কনভিক্টদের তিন বছর পর জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হতো। নিজেদের ইচ্ছামত তারা জীবিকা বেছে নিতে পারতো। কেউ ব্যবসা সুরু করতো, কেউ সরকারী আপিস কোয়াটারে জন মজুর খাটতো, কেউ চাষআবাদে ঝুঁকতো। সেলফ্-সাপোর্টার বা লিভ টিকিট এই সময় কাছে রাখতে হতো। কয়েদীর পোষাক পরার বিড়ম্বনা হতে রেহাই পেত। শুধুমাত্র হাজিরা দেওয়া ছাড়া জেলখানার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকতো না। তাদের গতিবিধি কিন্তু একেবারে নিয়ন্ত্রণ মুক্ত ছিল না। জংলীঘাটের সেলফ্-সাপোর্টার হ্যাডো বা ডিলানিপুর ইচ্ছা করলেই যেতে পারতো না। যাবার প্রয়োজন কোন কারণে দেখা দিলে অনুমতি নিতে হতো। বিভিন্ন এলাকায় গণ্ডীবদ্ধ জীবনের মধ্যে তারা নতুন জীবন গুছিয়ে তোলার পন্থা খুঁজতো। ইনটার্ণমেণ্টের মেয়াদ শেষ হলে তারা ফ্রিম্যান রূপে

আন্দামানের বাসিন্দা হয়ে যেত। পোর্ট ব্লেয়ারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে এখনও অনেকে আছে যারা সেলফ্-সাপোর্টার হয়ে জীবন স্থরু করেছিল। কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে দীর্ঘমেয়াদী বন্দীরা নানা ধরণের কাজ শিখতো। পাঁচ বছর পর মাসে বার আনা এবং দশ বছর পর মাসে এক টাকা বেতন পেত। লেখাপড়া জানা কয়েদীর রাইটার বা মুন্সীর কাজ জুটতো। দশ বছরের মধ্যে যদি কোন কয়েদী জেলদণ্ডের হাত থেকে মুক্ত থাকতে পারতো এবং ৩০ টাকা জমা দিত তাকে কিছু চাষযোগ্য জমি দিয়ে স্বাধীনভাবে বসবাসের স্থযোগ দেওয়া হতো।

'টিকিট লিভ' প্রাপ্ত কয়েদী মেয়ে বিবাহ করে স্বাভাবিক জীবনে আস্থক এটাই ছিল কর্তৃপক্ষের ঘোষিত নীতি। বর্তমান লোকাল বর্‌ন্‌দের পূর্বপুরুষগণ যেভাবে সংসার পেতেছে তাকে বিবাহ, শাদী বা নিকা যে কোন নামে অভিহিত করতে পারা যায়। মজার রীতি চালু করা হয়েছিল।

চিফ্-কমিশনার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারের সামনে মাসে একদিন পুরুষ ও মেয়ে কয়েদীদের প্যারেডে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো। যে স্থানে এই অভিনব প্যারেড অনুষ্ঠিত হতো সে অঞ্চলটা এখনও শাদীপুর নামে পরিচিত। প্রত্যেক কয়েদীর রেকর্ড কার্ড চেক্ করার পর 'বর'দের কনে পছন্দ করতে নির্দেশ দেওয়া হতো। এই প্যারেডে বিভিন্ন প্রদেশের 'কয়েদী' থাকতো—তাদের ধর্ম ও ভাষাও এক থাকতো না। কনের তরফ থেকে আপত্তি না উঠলে তক্ষুনি উভয়কে স্বামী-স্ত্রী বলে ঘোষণা করা হতো। একই জায়গায় বসে একই দিনে অনেক শাদী হয়ে যেত। এই দম্পতির নাম রেজিষ্ট্রী খাতায় উঠে যেত। বিভিন্ন প্রদেশবাসী ও একাধিক ধর্ম ও ভাষার নারী-পুরুষের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের মধ্যে দিয়ে যে শঙ্কর জাতির সৃষ্টি হয়েছে তারাই লোকাল বর্‌ন্‌ নামে পরিচিত। পাখতুন পাঞ্জাবী তামিল তেলেগু মালয়ালী বাঙ্গালী বিহারী কালচারের সংমিশ্রণ ঘটেছে

এখানে। দীর্ঘদিন একসঙ্গে বসবাসের ফলে একটি জাতীয় মনোভাব গড়ে উঠেছে। মেনল্যাণ্ডের ধর্মবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আন্দামানে নেই। লোকাল বর্‌ন্‌দের ধর্মবিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বিবাহে তেমন আঁট নেই। স্ত্রীপুরুষের অবাধ মেলমেশায় কোন নিন্দা নেই। বিবাহ বিচ্ছেদে কোন বিস্ময় নেই। মরালিটি বা নৈতিক চরিত্র নিয়ে তারা আমাদের মত মাথা ঘামায় না। আজকাল লোকাল বর্‌ন্‌দের ছেলেমেয়ে নানা বিষয়ে শিক্ষিত হয়ে উঠছে। উচ্চ শিক্ষার জন্য মেনল্যাণ্ডেও যাচ্ছে। সহজেই আন্দামান সরকারের কাজে নিযুক্ত হচ্ছে। মূল ভারত ভূখণ্ড হতে আগত সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে লোকাল বর্‌ন্‌দের এ-যাবৎ যে একটা ব্যবধান ছিল, সামাজিকতায় ইতস্ততঃ ছিল তাও ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। লোকাল বর্‌ন্‌দের বাড়ী আছে, খেত খামার আছে, গরু মোষ আছে, নারিকেল বাগিচা আছে। এখন কেউ-ই বড় একটা দুঃস্থ নয়। দুর্গাপ্রসাদ, দাতুলাল, যোগেশচন্দ্র, গোপীনাথ—এরা সকলেই পোর্ট ব্লেয়ারের অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হয়েছিলেন। কিছু-সংখ্যক কয়েদী মেনল্যাণ্ড থেকে বিবাহিত স্ত্রী এনে আন্দামানে স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছে।

লোকাল বর্‌ন্‌দের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মালাবারের (কেরল) মোপলা সম্প্রদায়। ১৯২১ সালে মালাবার বিদ্রোহে অংশ নেবার দরুণ দক্ষিণ আন্দামানে নির্বাসিত হয়ে আসে ১৪০০ জন। কেউ বলেন আরো বেশী, প্রায় পাঁচ হাজার। মালাবারের মুসলমান মোপলা নামে পরিচিত। খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে মোপলা বিদ্রোহের সংযোগ থাকা অস্বাভাবিক নয়। বিদ্রোহের নায়কগণ সকলেই মুসলমান। নির্বাসিত বিদ্রোহী সিপাই নামপুক্কু হাজী এখনও জীবিত আছেন। ছ'মাস কারাভোগের পর এদের সেলফ্-সাপোর্টার টিকিট ইস্যু করার ব্যবস্থা হয়। আগে টিকিট দেওয়া সীমাবদ্ধ ছিল অন্যান্য কয়েদীদের মধ্যে। মোপলাগণ এখানে স্থায়ী-ভাবে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় মেনল্যাণ্ড থেকে স্ত্রীপুত্র

আনবার অনুমতি পায়। টিকিট প্রাপ্ত মোপলারা নিজ হাতে নিজ পরিশ্রমে জঙ্গল পরিষ্কার করে বাসস্থান গড়ে তুলে। মাছ ধরায় পটু, আবার চাষ আবাদও জানতো। উইমবার্লিগঞ্জে এরা বসতি পায়। আন্দামানের অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে এরা সংমিশ্রণ ঘটায়নি। এরা যে এলাকায় বসেছে সেখানকার গ্রামগঞ্জের নামকরণ কেরলের গ্রামের সঙ্গে মিলে যায়। দক্ষিণ আন্দামানের মান্নার ঘাট, মানজেরী কালিকট, মাল্লাপুরম, বিবেকানন্দপুরম্ মোপলা এলাকা।

আন্দামানের মোপলার সংখ্যা ছ'হাজারের কম নয়। ১৯৩৪ সালের স্মারক গ্রন্থে সাড়ে পাঁচ হাজার বলে উল্লেখ ছিল। প্রথমদিকে শিক্ষার দিকে উৎসাহ ছিল না। এখন মেয়ে পুরুষ সমান উদ্যমে স্কুল-কলেজে পড়ছে। শিক্ষিত মোপলা যুবক সরকারী অপিসে কাজ করছেন। নিজেদের ধর্মকর্ম ও সামাজিক আচার আচরণ অনেকটা বজায় রেখেছে। তারা সংঘবদ্ধ বলেই অনেকগুলি সংঘ সমিতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। মালাবার মুসলিম জমায়েত, কেরালা মুসলিম এসোসিয়েশন, শিয়া যুবজন সংঘম—মোপলা সম্প্রদায়ের সংগঠন। এরা ব্যবসায়ে অগ্রসর। পোর্ট ব্লেয়ারের ও দক্ষিণ আন্দামানের হোটেল রেষ্টুরেন্টের মালিক মোপলা। এরা আপন সমাজ, সভ্যতা ও কৃষ্টি আজো বজায় রেখেছে এবং যুগের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি।

মধ্য ও উত্তর ভারতে ভান্টু নামে এক অপরাধ প্রবণ জাতির বাস আছে। দেশে এদের পেশা চুরি ডাকাতি খুনখারাবি। সমাজের অবাঞ্ছিত লোক এরা। এদের একদল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নিয়ে আন্দামানে আসে। হরিজনদের মত হিন্দুসমাজে এরা কিছুটা অপাংক্তেয়। এই কারণে কিছু সংখ্যক খৃষ্টান হয়ে গেছে। এরাও জোতজমি পেয়ে চাষবাসে মন দিয়েছে। এদের সংখ্যা কম, বাসও করে পৃথকভাবে।

আন্দামানের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের

অনেকটা মিল আছে। বর্মা থেকে যেসব কয়েদীদের পাঠানো হয় তাদের দুটো শাখা ছিল "বর্মনস্" ও "কারেনস্"। ১৯০৭-৮ সালে প্রথম কিছু কয়েদী আসে। ১৯২৩ সালে আরো অনেক কয়েদীকে পাঠানো হয়। রেঙ্গুন থেকে মাত্র ৫৮০ কি. মি. দূরে হওয়ার ফলে পোর্ট ব্লেয়ারে বেশ কিছু সংখ্যক বর্মী স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশে আসে। মৈমিও ও হারবার্টাবাদে এরা খোতজমি পায় এবং চাষের কাজকেই প্রধানতঃ জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে। স্বাধীনতার পরে আগ্রহ প্রকাশ করায় অনেক বর্মীকে ব্রহ্মদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারেনদের প্রধান বাসস্থান মায়াবন্দরের ওয়েবী অঞ্চলে। এখানে কমলালেবু ও মোসাম্বী ভাল জন্মে। কারেরা খৃষ্টান; এদের নিজস্ব স্কুল ও গির্জা আছে। মিশনারীদের কাছে শিক্ষিত হচ্ছে। এরা সুশৃঙ্খল ভদ্র ও বিনয়ী সম্প্রদায় রূপে একটি সমাজ গড়ে তুলেছে। বেশীর ভাগ ঘরদোর ব্রহ্মদেশের অনুকরণে গঠিত। প্রধান উপজীবিকা চাষ আবাদ। বর্মীদের মত অধিক সংখ্যায় এরা ফিরে যায়নি।

সব ধরণের নির্বাসিত কয়েদীদের বংশধরগণই আন্দামানের লোকাল বর্‌ন্ বাসিন্দা। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত আন্দামানের অধিবাসী বলতে এদেরই বোঝাত এবং এরাই সাউথ আন্দামানের প্রধান বাসিন্দা।

"উদ্বাস্তু বাঙ্গালী"ঃ স্বাধীনতার পরে দ্রুত যে রূপান্তর ঘটে গেছে তাতে আন্দামানের অধিবাসীদের মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে বড় অংশ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। তারা বহিরাগত ও নবাগত। আন্দামানে এ-যাবৎ লোকসংখ্যা ছিল কম। পতিত জমির কোন অভাব ছিল না। দক্ষিণবঙ্গ ও আন্দামানের ভূ-প্রকৃতি কিন্তু একরকম নয়। বাংলাদেশে এত ঘন অরণ্য কোথাও ছিল না। পাহাড় উপত্যকার সংমিশ্রণ ছিল না। এসব সত্বেও নর্থ ও মিডল আন্দামানে প্রচুর উদ্বাস্তু বসতি স্থাপন করেছে। স্বাধীনতার পূর্বে এ-সব অঞ্চলে লোকাল বর্‌ন্‌দের সংখ্যাও নগণ্য ছিল। প্রায় সকলেরই উপজীবিকা কৃষি। ধান প্রধান শস্য। সবজিও মন্দ হয় না। নিজ সমাজের

মধ্যে বিবাহাদি দিতে কোন অসুবিধা ঘটছে না। অবাঙ্গালীর বসত কাছে-ভিতে নেই। সাউথ আন্দামানের অবস্থা স্বতন্ত্র। এখানকার উন্নতি ঘটেছে আগে; লোকাল বর্ণদের সংখ্যাও উদ্বাস্তুদের তুলনায় বেশী। উদ্বাস্তু পরিবার ও লোকাল বর্ণ পরিবার পাশাপাশি গ্রামে বাস করে। স্থানে স্থানে উভয়ের মধ্যে জটিল সমস্যা মাথা তুলছে, আবার পরস্পর মানিয়ে নেবার চেষ্টাও চলছে। মিডল ও নর্থ আন্দামানের যা কিছু উন্নতি হালে হচ্ছে, উদ্বাস্তুদের বসতি গড়ার পর।

দেশভাগের ফলে বিরাম বিহীন পূর্ব-বঙ্গের উদ্বাস্তু আগমনে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক ও সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত করে তোলে। বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের সেটেলমেন্টের পক্ষে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ উপযুক্ত হবে বলে তখন মনে হয়। শ্রী এইচ. আর. শিবদশানী ডেলিগেশন উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কার্যকরী স্কিম তৈরী করলেন। স্থির হলো—পাঁচ হাজার কৃষক পরিবার আন্দামানে বসানো সম্ভব হবে। প্রত্যেক পরিবার পাঁচ একর পরিষ্কার ধানী জমি পাবে এবং পাঁচ একর অপরিষ্কৃত জমি পাবে বাড়ী ও ফলবাগানের জন্য। তাছাড়া পরিবার পিছু প্রাথমিক সাহায্য স্বরূপ ১০৫০ টাকা এবং ঋণস্বরূপ দেওয়া হবে ১৭৩০ টাকা। ঋণের টাকা চার ভাগে ভাগ করা হয়—গৃহ-নির্মাণ বাবদ আট শত; লাঙ্গল বলদ বাবদ সাত শত, বাসনপত্র বাবদ এক শত এবং বীজক্রয় বাবদ এক শত টাকা।

উদ্বাস্তুদের ক্ষেত বাগিচা ও বাড়ীর জন্য কতকটা জায়গা দেওয়া সম্ভবপর হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলো। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আয়তন ২৫০৮ বর্গ মাইল। মোটামুটি হিসাব করা হলো ১৩০০ বর্গ মাইল অরণ্য রাখতেই হবে। ৫০০ বর্গমাইল আদিবাসীদের বিচরণ ভূমি থাকবে। ব্যারেন আয়ল্যাণ্ড ও নারকোণ্ডাম আয়ল্যাণ্ড দুটিতে মৃত আগ্নেয়গিরি এবং যে সব ক্ষুদ্র দ্বীপ মানব বসতির অযোগ্য তার আয়তন ৪৩৫ বর্গ মাইল। জলাভূমি ৫২ বর্গ মাইল। সুতরাং বসত

দেওয়ার অনুপযুক্ত ২২৮২ বর্গমাইল। উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিতরণ করার মত জমি পাওয়া যাবে ২২৬ বর্গমাইল অর্থাৎ ১৪২, ৩৭০ একর। কাগজপত্রে হিসেব পাকা হয়ে গেল।

এবার ভাবনা এল সুপরিকল্পিতভাবে উদ্বাস্তু সেটেলমেণ্ট করাতে হলে কি ধরণের প্রস্তুতি চাই। বনভূমি সাফ করতে হবে। যাতায়াতের রাস্তা তৈরী করতে হবে। বাস ট্রাক লরি আসবে। অস্থায়ী রিসেপশন ক্যাম্প নির্মাণ করতে হবে। সরকারের তরফে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করতে হবে। আন্দামানে আসবার জন্য উদ্বাস্তুদের মনে আগ্রহ জাগাতে হবে। পেনাল সেটেলমেণ্ট এইভাবে উদ্বাস্তু সেটেলমেণ্টে রূপান্তরিত হতে চললো। ১৯৪৯ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় প্রথম দল রওনা দিল। যে মহারাজা জাহাজে এতদিন বন্দী যাতায়াত করেছে তাতে এবার একশ'টি ছিন্নমূল পরিবার নতুন জীবনের সন্ধানে সমুদ্রযাত্রী। বরিশাল, খুলনা কুমিল্লা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম জেলার প্রাক্তন অধিবাসী। কেউ চাষী, কেউ জেলে, কেউ কুমোর, কেউ খুদে ব্যবসায়ী, কেউ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। বিভিন্ন রুচি, বিভিন্ন আর্থিক অবস্থা, বিভিন্ন পেশার লোক সাউথ আন্দামানের অস্থায়ী রিসেপশন ক্যাম্প মংলুটন, মানপুর ও হামফ্রেগঞ্জে এসে জমায়েত হলো। প্রথম দিকে সরকারী ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি ছিল অনেক। ক্যাম্পের ঘরগুলো অত্যন্ত খারাপ। কাছে ভিতে জল নেই, চাষের জমি সব আগাছায় ভর্তি, কৃষি মজুর অমিল। পোর্ট ব্লেয়ার ছাড়া বাজার নেই; যাতায়াতের কোন যানবাহন নেই। কয়েক মাইল দূরের পথ পোর্ট ব্লেয়ার। শিক্ষিত মধ্যবিত্তগণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। পদে পদে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে লাগলেন। সরকারী কর্মচারীরা উত্যক্ত হয়ে অনিচ্ছুকদের পুনরায় ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

সে সময় ছিন্নমূল মানুষের উত্তেজনা একেবারে অহেতুক ছিল না। জঙ্গল পরিষ্কারের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল ফরেষ্ট বিভাগের উপরে।

অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে কাজ করায় যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি হয়। এই সঙ্গে ছিল হাতির অভাব, কাঠের মন্দা বাজার, চালান দেওয়ার জাহাজের অভাব—সব মিলে বিশৃঙ্খলার মাত্রা বাড়িয়েছে। ব্যারাকের ধাঁচে রিসেপশন ক্যাম্পগুলি নির্মিত হয়েছিল অত্যন্ত অস্থায়ী ধরণের। দীর্ঘদিন এই ক্যাম্পে বাস করা খুবই কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া সরকারী কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে দরদী মনের কোন প্রকাশ ছিল না। হৃদয়হীন যান্ত্রিক আচরণ উদ্বাস্তুদের মনকে পীড়িত করা অস্বাভাবিক নয়; বিশেষতঃ যেখানে নানারূপ রঙিন আশার প্রলোভন দেখিয়ে লোক আনা হয়েছে। একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন আন্দামান সম্পর্কে আতঙ্ক দীর্ঘদিনের। দেশের কুখ্যাত অপরাধীর আস্তানা এটা। মেনল্যাণ্ডের সংগে যোগাযোগ খুব কম। সংযোগহীন হয়ে থাকতে মন টানে না। তার উপরে রয়েছে আদিম মানুষের নৃশংসতার কাহিনী। এই সব আশঙ্কা ও ভীতি দূর করে উদ্বাস্তু পরিবারকে এখানে আসতে রাজী করান প্রথমদিকে সুকঠিন কাজ ছিল।

চাষী ব্যবসায়ী ধোপা নাপিত পুরোহিত কামার কুমার শিক্ষিত ব্যক্তি এক জায়গায় বসিয়ে এক একটা সুন্দর গ্রাম গড়ে তুলবার কথা প্রথমদিকে চিন্তা করা হয়েছিল। প্রথম অভিজ্ঞতার ধাক্কাতেই সে চিন্তা পরিত্যক্ত হয়। দ্বিতীয় দফায় যাদের আনা হলো—তাদের সকলকেই নিজহাতে চাষ কাজ করতে হবে এই কথা সুস্পষ্টভাবে বলে আনা হলো। পরবর্তী সময়ে চাষী ছাড়া অন্য পেশার লোক বড় একটা আনা হয়নি। এইভাবে ক্রমে ক্রমে পাঁচ হাজার পরিবার বিভিন্ন দ্বীপে বাসা বেঁধেছে। অধিকাংশই অশিক্ষিত ও নমঃশূদ্র। হার্বাটাবাদ, শৌলদারী, মংলুটন, তিরুর গ্রাম এখন পুরাপুরি উদ্বাস্তু গ্রাম। অবশ্য গ্রাম বলতে যা বুঝি এগুলো তা নয়। ধানী জমির পাশে পাশে কিছু পরিবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসানো হয়েছে। প্রথম দিকে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী গেছে, এখন সকলেই সুখে ও

সচ্ছলতার মধ্যে আছে। ক্রমশ বাজার হয়েছে, দোকান পাট হয়েছে, স্কুল হয়েছে, ডাক্তারখানা হয়েছে। পাকা রাস্তায় সরকারী পরিবহনের বাস চলে। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য মাছ ভাত। পশ্চিম-বঙ্গে সেটা এখন দুরাশা মাত্র। আন্দামানে মাছ ভাত সহজলভ্য। কলা, পেঁপে, বরবটি, কুমড়ো ফলছে। সুপুরি, নারিকেল ও কাঁঠালের বাগিচা রয়েছে অনেক বাড়িতে।

মিডল্ আন্দামানের রঙ্গত, বেতাপুর, বকুলতলা পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু বসতির পক্ষে উত্তম স্থান। এই অঞ্চলে আদিবাসী নেই। বকুলতলার দিকে সামান্য থাকলেও থাকতে পারে। লোকাল বর্ণদের বসতি নেই। অনেকগুলি বড় উপত্যকা বাতাপুর নদী বরাবর রয়েছে। নদীতে তেমন জল থাকে না। সাউথ আন্দামানের তুলনায় বৃষ্টির পরিমাণ এখানে কম। জমিগুলি ধানচাষের উপযুক্ত। ফসল হচ্ছেও ভাল। এই কারণে বহু উদ্বাস্তু পরিবারকে এ-অঞ্চলে বসানো হয়েছে। ১৯৫১ সালের লোক গণনায় দেখা গেছে ১৫ হাজারেরও বেশী লোক রঙ্গত তহশীলে বাস করছে। ঘরে ঘরে লাউকুমড়ো শাকসবজি দেখেছি। ঠিক বাংলাদেশের মতো। রঙ্গত বাজারে ঘুরলে পূর্ব-বঙ্গের একটি বড় গঞ্জে ঘুরছি বলে মনে হয়। ব্লক আপিস, পি. ডবলু. ডি. আপিস, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, পোষ্ট আপিস, গেষ্ট হাউস আছে। পাকা রাস্তায় বাস চলে। জেটি থেকে রঙ্গত বাজার ৪ থেকে ৫ কি. মি. পথ। ডায়নামো চালিয়ে রাত দশটা পর্যন্ত বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ করা হয়। এখানে যারা বসত নিয়েছে তারা মেনল্যাণ্ড থেকে আত্মীয়স্বজন নিয়ে আসছে। দোকান পাট বাড়ছে। লোক সংখ্যাও বেড়ে উঠছে। বিরাট বাঙ্গালী উদ্বাস্তু এলাকা। বকুলতলা থেকে পাকা রাস্তা বরাবর উদ্বাস্তু গ্রাম— দশরথপুর, কৌশল্যানগর, ঊর্মিলাপুর, শক্তিগড় ইত্যাদি।

নর্থ আন্দামানের ডিগলিপুর তহশীল আর একটি বড় উদ্বাস্তু বসতি। ২১টি রেভিন্যু গ্রাম নিয়ে এই তহশীল। ডিগলিপুর

ব্লকের মধ্যে মাত্র ৩০টি গ্রাম—ডিগলিপুরের ২১টি ও মায়াবন্দর তহশীলের ৯টি। ডিগলিপুর তহশীলে সীতানগর, সুভাষগ্রাম, রামকৃষ্ণ গ্রাম ও মাধাপুর খুব বড় উদ্বাস্তু বসতি। মায়া বন্দর তহশীলের নবগ্রাম, পান্নাগড়, কিশোরীনগর, কালীঘাট বড় বসতি। বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর, নোয়াখালির লোকে ভর্তি। এ-সব গ্রামের শতকরা ৯০ জন পূর্ব-বঙ্গের লোক। বাকী দশজন কেরল ও তামিলনাড়ুর ভূমিহীন চাষী সম্প্রদায়। এ-অঞ্চলে যে পাকা রাস্তা তৈরী হচ্ছে তাতে মজুর খাটছে রাঁচী ও দক্ষিণ ভারতের লোক; কিছু আছে উড়িষ্যা ও মধ্যভারতেব মজুর। স্বাধীনতার আগে এ-অঞ্চলে কোন পাকা রাস্তা বা পাকা বাড়ী ছিল না। গত কয়েক বছরে সরকারী কোয়ার্টার হয়েছে, ব্লক আপিস হয়েছে, স্কুল হয়েছে, বাজার বসেছে। কালীঘাট দ্বীপে প্রথম উদ্বাস্তু আসে ১৯৫৩ সালে। এ-অঞ্চলে উন্নয়ন কাজের গতি বড় মন্থর। গত ২২।২৩ বছরে ৩০ কি. মি. রাস্তাও পাকা হয়নি। জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ী হাঁটাপথে সাইকেল চালানও শক্ত। এরিয়েল বে জেটি থেকে পাঁচ মাইল পাহাড়ী পাকা পথে উত্তরদিকে এগিয়ে গেলে ডিগলিপুর ব্লক ও তহশীল আপিস ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পৌঁছান যাবে। নির্দিষ্ট সময়ে বাস চলে। এরিয়েল বে বন্দরটি সুন্দর, তিন দিকে পাহাড় ঘেরা। একটি নৌবহর নিরাপদে রাখা চলে। এখনও বড় জাহাজ ভেড়ার মত জেটি তৈরী হয়নি। আন্দামানের সবচেয়ে বড় পাহাড় স্যাডল পিক এ-অঞ্চলে। স্যাডল পিকের কোলে ডিগলিপুর। সম্পূর্ণ উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চল। দেখে মনে হলো সকলে সুখেই আছে। এখানে ধান, আখ, কলাই ভাল জন্মে। কলা, কাঁঠাল, সব্‌জি সুন্দর হচ্ছে। মাছ খুব সস্তা। কৃষকদের উদ্‌বৃত্ত শস্য সরকার কিনে নেন। চাষ ও ছোট দোকান পাট ছাড়া উদ্বাস্তুদের মধ্যে কোন শিল্পোদ্যোগ দেখিনি।

ডিগলিপুর ও এরিয়েল বে'র মধ্যে ১০ কি. মি., ডিগলিপুর ও

মিলনগ্রামের মধ্যে ১০ কি. মি. এবং এরিয়েল বে ও কালীপুরের মধ্যে ১২ কি. মি. পাকারাস্তা পি., ডবলু, ডি তৈরী করেছে। এই ব্লকে ২৫টি জুনিয়ার বেসিক, তিনটি সিনিয়র বেসিক, একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। একটি হাসপাতাল ও ১১টি ডিসপেনসারী আছে। পাঁচটি পশু চিকিৎসার আউট পোষ্ট আছে। এই ব্লকের লোকসংখ্যা মাত্র ১২।১৩ হাজার। অবাঙ্গালী সেট্‌লার ও লোকাল বর্ণ এ-অঞ্চলে খুব কম বাস করে। প্রথমদিকে উদ্বাস্তু আগন্তুকদের খুব বিরোধিতা করেছে। ক্রমশ সে বৈরীভাব দূর হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে বিবাহের সংবাদও দু'একটি ইদানীং শোনা যাচ্ছে। বিশ্বময় সর্বত্র এই একই মানব প্রকৃতি।

ডিগলিপুরের সমুদ্রের খাড়ি ও নদীতে কুমীরের উৎপাত ভয়ানক। প্রতিবছর কুমীরের পেটে যেমন ২।৪ জন মানুষ যায় তেমনি একাধিক কুমীরও মানুষের আঘাতে মারা পড়ে। কুমীরের চামড়ার খুব চাহিদা।

আন্দামানের অধিবাসীদের মধ্যে এখন একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় বাঙালী। অধিকাংশ পরিবারই সরকার প্রতিশ্রুত পাঁচ একর খেতান জমির পরিবর্তে চার একর চাষের জমি পেয়েছে। সকলের মনেই চাপা ক্ষোভ।

॥ পাঁচ ॥

গোটা দ্বীপপুঞ্জে সহর বলতে একটি—পোর্ট ব্লেয়ার। মায়া বন্দর, রঙ্গত, ডিগলিপুর, কার নিকোবর, নানকৌরী, ক্যাম্বেল বে, হাট বে প্রধানত সি-পোর্ট ও গঞ্জ। বড় জোর উপনগরী বলা যেতে পারে। ১৯৫২ সালের পর থেকে এ-সব অঞ্চলের উন্নয়ন প্রকল্প কোথাও মন্থর কোথাও দ্রুত তালে চলছে। পোর্ট ব্লেয়ারের দূরত্ব কলকাতা হতে ১২৫৫ কি. মি. এবং মাদ্রাজ হতে ১১৯১ কি. মি. এবং রেঙ্গুনের

পথ এর অর্ধেক। সহরটি ছোট হলেও পুরোপুরি আধুনিক। ডিগ্রী কলেজ, বেসিক ট্রেনিং কলেজ, অনেকগুলি হাই ও বেসিক স্কুল, রেডিও স্টেশন, স্টেট ব্যাঙ্ক, ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী, একাধিক টুরিষ্ট হোম, কয়েকটি সিনেমা হাউস, হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, হাসপাতাল, এয়ার পোর্ট সবই আছে। সরকারী আপিস ও কোয়ার্টার এবং বাড়ী ঘরদোর অধিকাংশই কাঠের। ইদানীং সিমেন্ট কনক্রিটের কাজ বাড়ছে। নতুন নতুন কোয়ার্টার তৈরী হচ্ছে—আর্মি-কোয়ার্টার, নেভি-কোয়ার্টার, সিভিল-কোয়ার্টার। ছবির মত দেখতে।

স্বাধীনতার পর উন্নয়ন কাজের গতিবেগ কয়েকগুণ বেড়েছে। পিচঢালা পাকা রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যানবাহনের বিড়ম্বনা কম। ঠেলাগাড়ি, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, টানা রিক্সা বা সাইকেল রিক্সা, প্রাইভেট বাস কিছুই নেই। রাষ্ট্রীয় পরিবহনের ষ্টেটবাস সহরের বিভিন্ন অংশে চলাফেরা করে। গ্রামের সঙ্গে সহরের সংযোগও রাখছে স্টেটবাস। অনেকে মোটর সাইকেল ও স্কুটার কিনছেন। প্রাইভেট কার ও জিপ আছে। বাসের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। কিছু ট্যাক্সি আছে, মালিক সব বড় বড় ব্যবসায়ী। মালিকের নির্দেশে ট্যাক্সিচালক যাত্রীদের কাছে মিটারের ন্যায়সঙ্গত ভাড়ার সঙ্গে বেশ কিছু বাড়তি টাকা চেয়ে বসে। খুশিমত ভাড়ার দাবীতে যাত্রীরা বড়ই অসহায় বোধ করেন। স্থানীয় সরকারী মহল এ-বিষয়ে নির্বিকার ও উদাসীন।

পোর্ট ব্লেয়ারের লোক-সংখ্যা আটাশ উনত্রিশ হাজার। সাউথ আন্দামানে যত লোকের বাস তার শতকরা প্রায় ৪৪ জনই পোর্ট ব্লেয়ার ও সহরতলীতে বাস করে। যত পুরুষ তার অর্ধেক নারী। এটা কেবল পোর্ট ব্লেয়ারের সমস্যা নয়, গোটা আন্দামান ও নিকোবর এই সমস্যায় হাহাকার করছে। অনেক স্থানেই নারী-পুরুষের রেশিও প্রায় অর্ধেক। ১৯৫১ সালের লোক গণনায় দেখা গেছে এক হাজার পুরুষে ৬৪৪ জন নারী। এই কারণে সমাজ

জীবন কিছুটা পঙ্কিল, চরিত্র কিছুটা শিথিল। নারীর সতীত্ব ততটা গুরুত্ব পায় না। শুধু পোর্ট ব্লেয়ার নয়, আন্দামানের জনগোষ্ঠী এমন সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে যার অতীত ঐতিহ্যের কোন পটভূমি নেই, উন্নত কৃষ্টির কোন বাঁধুনি নেই, শিক্ষার ধারাবাহিক কোন চর্চা নেই। বহিরাগত সরকারী কর্মচারী ও তাদের বৌ ঝি সম্ভবত এই কারণেই লোকাল বর্ণদের সঙ্গ কিছুটা এড়িয়ে চলেন।

সব ধর্মাবলম্বীর সাক্ষাৎ পাবেন পোর্ট ব্লেয়ারে। হিন্দু দেবমন্দির আছে, খৃষ্টানদের গির্জা আছে, মুসলমানের মসজিদ আছে, শিখের গুরুদ্বোরা আছে, বর্মীদের ফুঙ্গিচাঙ্গ আছে। রামকৃষ্ণ সেন্টারের নিজস্ব একটি গৃহ হয়েছে। সাউথ পয়েন্ট পাহাড়ের গায়ে নিরালায় রাধাগোবিন্দের মন্দিরটি সুন্দর। সাধারণের চোখের আড়ালে হ্যাডোতে গলির মধ্যে তিরুপতির একটি ছোট মন্দির দেখেছি। ডিলানিপুরের ফুঙ্গিচাঙ্গে একটি বৌদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বৌদ্ধশ্রমণ যাঁরা এখানে আছেন তাঁরা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন না। ছোট্ট জায়গায় বহু ভাষাভাষী লোকের চমৎকার সমাবেশ। বাংলা, হিন্দী, উর্দু, নিকোবরী, মালয়ালম, তামিল, তেলেগু, বর্মিজ, গুরুমুখী ভাষী লোকের সঙ্গে আপনাকে মেলামেশা করতে হবে, পাশাপাশি বাস করতে হবে। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধর্মের অপার মিলন ঘটেছে পোর্ট ব্লেয়ারে। সহরে অনেকগুলি ক্লাব আছে। বাঙ্গালীদের 'অতুল স্মৃতি সমিতি'; তামিল, তেলেগু, মালয়ালিজ ও কর্ণাটকবাসীদের প্রত্যেকের পৃথক ক্লাব। অফিসারদের 'আন্দামান ক্লাব'। হিন্দী সাহিত্য পরিষদকেও ক্লাব বলা চলে। ক্লাবগুলো নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে সংযোগ রাখে, বছরে একাধিক উৎসব অনুষ্ঠান ও অভিনয় করে। বহিরাগত টুরিষ্টদের সাময়িক আশ্রয় দেয়। ক্লাবগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তুলছে।

এবারডিন বাজারকে দিল্লীর কনট প্লেস অথবা কলিকাতার চৌরঙ্গীর

সঙ্গে তুলনা করতে পারেন। তফাৎ—এটা মিনি সংস্করণ। দোকান ঘরগুলো যে কোন পাহাড়ী সহরের বাজারের অনুরূপ। বাজারের মাঝখানে ক্লক টাওয়ার। ক্লক টাওয়ারকে ঘিরে কোন রাস্তা গেছে সেলুলার জেল ও হাসপাতালের দিকে ; কোনটি ডিস্ট্রিক্ট জজের কোর্ট হয়ে সেক্রেটারিয়েটের দিকে ; কোনটি মেরিন ড্রাইভের দিকে ; কোনটা ডিলানিপুর হ্যাডো হয়ে চ্যাথাম জেটির দিকে ; কোনটি গোলঘর এয়ারপোর্ট হয়ে ধনিখাড়ি মংলুটন শোলদারীর দিকে ; কোনটি চিড়িয়াটাপুর দিকে। সব রুটেই বাস নির্দিষ্ট সময় অনুসরণ করে চলে এবং সহর ও গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। বছর কয়েক পরে এবারডিন বাজারে বাসে চাপলে একেবারে নর্থ আন্দামানের ডিগলিপুর বাজারে গিয়ে নামা যাবে। আন্দামান ট্রাঙ্ক রোডের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে।

জাদোয়েত আন্দামান-নিকোবরের সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী। গুজরাটী মুসলমান আকুজি পরিবারের মালিক। অনেকগুলি কারবার এদের একচেটিয়া। জাদোয়েত নামে চলে কনজুমার গুডসের কারবার ; আন্দামান এনটারপ্রাইজার্স নামে চলে অটোমোবিলের ব্যবসা ; আইল্যাণ্ড ট্রেডার্স নামে চলে ট্রানস্পোর্ট বিজিনেস। দ্বীপে দ্বীপে জিনিস আদান-প্রদানের জন্য এদের নিজস্ব বোট ও জাহাজ আছে। নিকোবরে এরা বিরাট ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন এবং সুন্দর কাজ করছেন ও দু'হাতে পয়সা কুড়িয়ে নিচ্ছেন।

এবারডিন বাজারে গুটিকয়েক বড় দোকান আছে যা হাতে গোণা যায়। যে কোন একটিতে ঢুকে পড়লে সংসারের যাবতীয় জিনিস ব্যাগে পুরে বেরিয়ে আসতে পারবেন। চাল ডাল আটা ময়দা তেল নুন মশলাপাতি থেকে সুরু করে তেল সাবান স্নো পাউডার, ছেলেমেয়ের খাতা কলম কালি ইস্তক ঔষধপত্র যা আপনার দরকার একই দোকানে পেয়ে যাবেন। গুরুস্বামী, কৃষ্ণস্বামী, আরুমুগম, থাঙ্গাভেলু, পোর্ট ব্লেয়ারের নামকরা ব্যবসায়ী। সকলেই সাউথ

ইণ্ডিয়ান। কো-অপারেটিভ স্টোরটিও বেশ বড়। ছোট-বড় দোকান পাট হোটেল রেষ্টুরেন্ট যা দেখছি সবই তামিল, কেরলবাসী ও লোকাল বর্ণদের। পোষাক-পরিচ্ছদ মুদিখানা স্টেশনারী ইলেকট্রিক গুড্‌স জুতো বইপুঁথি এমন কি লণ্ড্রি ও সেলুন কোন কিছুই বাঙ্গালীর নেই। অথচ বাঙ্গালীর সংখ্যা এখন আন্দামানে সবচেয়ে বেশী। একটিমাত্র দরজির দোকান, দুটি ফটোগ্রাফীর স্টুডিও, একটি রেষ্টুরেন্ট ও একটি ছোট হোটেল ছাড়া বাঙ্গালীর দোকান সহরে বড় একটা নজরে পড়েনি। কলিকাতা ও মাদ্রাজের জাহাজ যেদিন জেটিতে এসে ভিড়ে সেদিন ও তার পরদিন সবজি ও ফলের বাজার একটু নরম থাকে। তারপরই তর তর করে দাম চড়ে উঠে। আকাশ ছোঁয়া মূল্য। আলু পেঁয়াজের দাম অত্যন্ত বেশী। ফলমূল শাকসব্‌জির বাজারে ঢুকলে মাথায় রক্ত উঠে যাবে। শীতের সব্‌জি আন্দামানে জন্মায় না। কলকাতার বাজারে যে ফুলকপি বা বাঁধাকপি ৩০।৩৫ পয়সা পোর্ট ব্লেয়ারে সেটা দু'আড়াই টাকা। টম্যাটো বিট গাজর কড়াইশুটি কপি মূলো এখানে দুর্মূল্য। পেঁপে কলা বরবটি মিষ্টি-আলু সজনে লাউ কুমড়ো এই রকম গুটিকতক সব্‌জি দিয়ে রসনাকে তৃপ্ত রাখতে হবে। হরিণের মাংস সস্তা, ছাগলের মাংসের দাম বেশী। ডিম একটি ৭৫ থেকে ৮০ পয়সা। মাছের দাম কিন্তু সকলেরই নাগালের মধ্যে। সবই অবশ্য সামুদ্রিক মাছ। কোকো, পারশে, চাঁদা, পুঁটি, ময়া, সুরমাই, তারিণী, তরোয়াল চিংড়ি মাছ পোর্ট ব্লেয়ারে বার মাস পাওয়া যায়। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে সেরা সুরমাই। এরা রুই মাছের মর্যাদা পায়।

পোর্ট ব্লেয়ারে নিয়মিত লোক বাড়ছে। আর্মি ব্যারাক বড় হচ্ছে। নেভি স্টাফের বহু কোয়ার্টার ও আপিস হচ্ছে। রাস্তা তৈরীর কাজে বহু মজুর মেনল্যাণ্ড থেকে আসছে। অথচ সুলভে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ উদাসীন। নীলদ্বীপ, হ্যাভলকদ্বীপ ও রঙ্গতে বাঙ্গালী উদ্বাস্তু পরিবার নানাধরণের প্রচুর সবজি ফলাচ্ছে।

কিন্তু ন্যায্য মূল্যে বিক্রী করার সুযোগ পাচ্ছে না। নিয়মিত ফেরি সার্ভিস থাকলে চাষীরা দু'টো পয়সা পেত, পোর্ট ব্লেয়ারের সব্‌জি বাজারও একটু স্বাভাবিক হতো।

আন্দামান যখন আদিবাসীদের একমাত্র বাসস্থান ছিল তখন উনুন অনাবশ্যক ছিল। পোর্ট ব্লেয়ার সহরও আত্মপ্রকাশ করেনি। সে সময় রান্নাবান্নার কোন বালাই ভোগ করতে হয়নি। ইংরেজ এসে প্রথম পোর্ট ব্লেয়ারে অগ্নিদেবকে আহ্বান জানালেন। তারপর থেকে অগ্নিদেবের চাহিদা দ্রুত বেড়ে উঠছে। কিন্তু এ-অঞ্চলে কোথাও কয়লা নেই। আছে প্রকৃতির দেওয়া অগণিত গাছ, বন জঙ্গল ঝোপঝাড়।

এক বস্তা কাঠ কয়লার মূল্য দশ বার টাকা। লকড়ির দামও কম নয়। ছোট পরিবারে মাসে ৩০।৪০ টাকা শুধু জ্বালানীর জন্য ব্যয় হয়ে যায়। সমস্যাটা ঠিক লকড়ির নয়, গাড়ীর। লরি যাদের আয়ত্তে তাদের বাসায় যৎসামান্য মূল্যে লকড়ি নিয়মিত এসে যায়। তেমন সৌভাগ্যবান আর ক'জন! চাল গম আর চিনি সরকার কন্ট্রোল দরে সরবরাহ করেন। বাকী সব কিছু ব্যবসায়ীর মর্জির উপর নির্ভরশীল। বাজার উঠানো নামানো তাদেরই হাতে। ক্রেতারা অসহায়।

বাসায় কাজের ঝি পোর্টব্লেয়ারে মিলে না। গৃহভৃত্য পাওয়াও সুকঠিন। খেটে খাওয়া মানুষ এখানে বেকার নেই। পি. ডবলু. ডি-র স্টাফদের হাতে মজুর বেশী; তাই টুকিটাকি গৃহকর্মে তাঁরা মজুরের কিছুটা সহায়তা পান। ফলে অন্যান্য বিভাগের স্টাফ এদের একটু ঈর্ষার চোখে দেখেন। বহু ওভারসিয়ার, সার্ভেয়র, ড্রাফট্‌সম্যান, মেকানিক ও ইঞ্জিনিয়ার মেনল্যাণ্ড থেকে এসেছেন। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যাও কম নয়। সকল গৃহেই গৃহিণীদের যথেষ্ট খাটুনী করতে হয়। বাসায় কোন ভিখারী আসতে দেখিনি। পথেও কেউ হাত পাতেনি। ল' এণ্ড অর্ডারের সমস্যা পোর্ট ব্লেয়ারে খুব

কম। চুরি ডাকাতি নেই। পকেটমারের ভয় নেই। রাজনৈতিক দলাদলি নগণ্য; রাজনৈতিক মারামারির কথা বড় একটা শুনাই যায় না। নির্ভাবনায় পথ চলা যায়। নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারা যায়। গোটা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে মাত্র ন'টি থানা, আর বারটি পুলিশ আউট পোষ্ট।

এক দ্বীপ হ'তে আর এক দ্বীপে যাতায়াতের একমাত্র উপায় জলযান। আন্দামান প্রশাসনের অধীন মেরিণ ডিপার্টমেণ্ট। মেরিণের হার্বার মাষ্টার জলযান নিয়ন্ত্রণ করেন। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে সপ্তাহে একখানি যাত্রীবাহী ছোট জাহাজ 'ওঙ্গে' (Onge) মধ্য ও উত্তর আন্দামানের রঙ্গত, মায়া বন্দর, এরিয়েল বে ঘুরে ফিরে আসে। শ' দুই-এর বেশী যাত্রী বহন করতে পারে না। গোয়ালন্দ নারায়ণগঞ্জ লাইনে বড় ষ্টীমারের মত দেখতে। অনুরূপ আর একখানি যাত্রীবাহী ছোট জাহাজ 'এরোয়া' (Yerwah) পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ১৪।১৫ দিন পর পর রওনা হয়ে লিটল আন্দামান, কার নিকোবর, টেরেসা, কাচাল, ননকৌরী, ক্যাম্বেল বে ঘুরে ফিরে আসে। সপ্তাহে দু'দিন রঙ্গত ও পোর্ট ব্লেয়ারের মধ্যে ফেরি-বোট সার্ভিস আছে। এই ফেরি-বোট অন্য দিনগুলি কাছাকাছি দ্বীপগুলো চক্কর দেয়। পঞ্চাশজনের মত যাত্রী বহন করতে পারে, পুলিশ বিভাগের দুটি দ্রুতগামী পেট্রোল বোট আছে—"জওহর" ও "সুভাষ"। পোর্টব্লেয়ারে যখন ছিলাম তখন অচল ছিল, জানি না বর্তমানে সচল করা হয়েছে কিনা। মেরিণ বিভাগ টুক্‌টাক মেরামতের কাজ চালিয়ে নেয়। এখানে ছোট একটি ড্রাই ডক আছে। ফেরি-সার্ভিস উভয় দিকেই বাড়ানো দরকার।

মেনল্যাণ্ডের সংগে সংযোগ রক্ষা করে ভারত সরকারের শিপিং করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ। এ পথে তার রেগুলার সার্ভিস দুটি মাদ্রাজ-পোর্টব্লেয়ার ও কলিকাতা-পার্টব্লেয়ার। শিপিং করপোরেশনের জাহাজ নির্ধারিত ডেট ও টাইম শিডিউল বজায়

রেখে যাতায়াত করে না। একটা জার্নির পর ডেট ও টাইম ঠিক হয়। শুনেছি মালপত্র লোডিং ও আনলোডিং সমস্যাই বিলম্ব ঘটায়। এতে যাত্রীরা অশেষ দুর্ভোগের মধ্যে পড়েন। মনে করুন ডিগলিপুর বা ননকৌরীতে বর্তমানে আপনার কর্মস্থান বা বাসস্থান। কলিকাতা বা মাদ্রাজ থেকে পোর্ট ব্লেয়ারে এসে পৌঁছে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মেরিণের কোন জাহাজ পাবেন না। দিন কয়েকের মত কোন বন্ধুর বাড়ী অতিথি হতে হবে অথবা ধর্মশালায় মাথাগুঁজে পড়ে থাকতে হবে। এখানকার জাহাজ চলাচলের বিধিনিয়ম যাত্রীদের সুখ-সাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা-অসুবিধা গ্রাহ্যের মধ্যেই নেয় না। আপনি যদি টুরিষ্ট হন এবং আন্দামান-নিকোবর ঘুরে ফিরে দেখতে চান পুরো দেড় মাস হাতে নিয়ে আসতে হবে। হলিডে রেজোর্টের উপযুক্ত স্থান পোর্ট ব্লেয়ার। কিন্তু যাতায়াতের অসুবিধাই প্রধান অন্তরায়। প্লেন ও জাহাজের ভাড়া অনেকেরই নাগালের বাইরে।

আপনি যদি সমুদ্রপথে পোর্ট ব্লেয়ারে আসতে চান মাদ্রাজ অথবা কলিকাতা পোর্টে জাহাজে চাপবেন। মাত্র ৪।৫ দিনের সমুদ্রযাত্রা। যে জাহাজ পোর্টব্লেয়ারে আসে সেটাই ৫।৬ দিন বাদে ফিরে যায়। জাহাজ ছাড়ার তারিখ, টিকিট কেনা ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করবেন নীচের ঠিকানায় ঃ—

1. Ths Shipping Corporation of India Ltd., Shipping House, 13 Strand Road, Calcutta-700 001.

2. Messers K. P. V. Sheikh Mohammed Rowther & Company., 41 Linghi Chetty Street, Madras (Tamilnadu).

3. The Manager, Shipping Corporation of India Ltd., P. O. Chatham, Port Blair.

তোড়জোড় সুরু করবেন মাসখানেক আগে থেকে। প্রথমেই জাহাজে স্থান চেয়ে আবেদন পাঠাবেন। কেবিন যাত্রীদের আবেদন

যাবে আন্দামান নিকোবর এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী, পোর্ট ব্লেয়ার এই ঠিকানায়। বাঙ্ক যাত্রীর প্যাসেজের জন্য শিপিং করপোরেশনের ম্যানেজারের কাছে লিখলেই চলবে। চিঠিতে উল্লেখ থাকবে—যাত্রীর নাম, তার পিতার নাম, পুরো ঠিকানা, নাগরিকত্ব, যাওয়ার উদ্দেশ্য এবং কোন্ জাহাজে যেতে ইচ্ছুক ও কোন্ বন্দর থেকে জাহাজে উঠবেন। ভারতীয় নাগরিকদের আন্দামানে আসতে কোন বাধা নেই ; তবে লিটল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে যেতে চাইলে ডিপুটি কমিশনারের কাছ থেকে বিশেষ পারমিট সংগ্রহ করে জাহাজে টিকিট কাটতে হবে। ট্রাইবালদের বাসভূমি বলে এইসব দ্বীপ সংরক্ষিত। ভারত সরকারের বিনা অনুমোদনে বিদেশীদের আন্দামানে আসা নিষিদ্ধ।

জাহাজে চাপবার অন্ততঃ ছ'দিন আগে কলেরার ইন্‌জেকশন ও বসন্তের টিকা নিয়ে ইনটার ন্যাশানাল ফরমে ভ্যালিড সার্টিফিকেট স্বাস্থ্যবিভাগের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। টিকার মেয়াদ তিন বছর এবং কলেরার ইন্‌জেকশন ছ' মাস ভ্যালিড থাকে। টিকিট কেনার আগে একটুকু ঝঞ্ঝাট কারও এড়াবার উপায় নেই। কলকাতা হতে 'এম· ভি· আন্দামান', বাঙ্কের ভাড়া ৪১ টাকা ; কেবিন তিন প্রকার—ডিল্যুক্স ৩৫৪ টাকা, এ-ক্লাস ৩১১ টাকা, বি-ক্লাস ২৬০ টাকা, সি-ক্লাস ২০৭ টাকা। কেবিন যাত্রীদের ক'দিনের আহার খরচ ৬৬ টাকা। বাঙ্ক যাত্রীদের ক্যানটিনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মাদ্রাজ থেকে 'এস· এস. হরিয়ানায়' বাঙ্কে ভাড়া ৪১ টাকা। ডিলাক্স ৩১১ টাকা, এ-গ্রেড ২১৯ টাকা। ক্যানটিনে প্রতিদিনের আহার খরচ ৬-৫০ পয়সা। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের ভাইকাউন্ট সার্ভিস সপ্তাহে দু'দিন দমদম থেকে পোর্ট ব্লেয়ার আসে। জার্নি প্রতি ভাড়া ৪১০ টাকা। ইদানীং হয়তো কিছু বেড়েছে।

দিনকয়েক থাকা খাওয়ার উপযুক্ত হোটেল পোর্ট ব্লেয়ারে নেই।

ছোট ছোট যে কটি হোটেল আছে তাতে খাওয়া চলে, রাত্রি যাপন চলে না। মেনল্যাণ্ড থেকে টুরিষ্ট যাঁরা আসেন তাঁরা সহরের বিভিন্ন ক্লাবে অল্প খরচে দিন কয়েক কাটিয়ে চলে যান। শিখ গুরুদ্বারে ও হিন্দী সাহিত্য ভবনেও আশ্রয় নেওয়া যায়। যাঁদের খরচ করার সামর্থ্য আছে তাঁরা সরকার পরিচালিত 'গেষ্ট হাউস' ও 'টুরিষ্ট হোমে' সীট বুক করে আসতে পারেন। পোর্ট ব্লেয়ারে একটি আরামপ্রদ টুরিষ্ট হোম আছে। কারবিনস্ কোভের টুরিষ্ট হোম পিক্‌নিকের চমৎকার স্থান। হ্যাডোর টুরিষ্ট হোম ও গেষ্ট হাউসে প্রতিদিন সিঙ্গল বেড ১০ টাকা, ডবল ২০ টাকা। ডাকবাঙ্‌লোতে সিঙ্গল বেড প্রতিদিন ১০ টাকা। চিড়িয়াটাপু ও ওয়ানড্রুতে সরকার পরিচালিত রেষ্ট হাউস আছে। সর্বত্রই থাকার ব্যবস্থা আছে। খাওয়া নিজ খরচে করে নিতে হবে। পোর্ট ব্লেয়ার নর্থ ডিভিসনের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে লিখে সীট বুক করতে হয়।

পোর্ট ব্লেয়ার এসে কয়েকটি জায়গা দেখতেই হবে—বিখ্যাত সেলুলার জেল, রস দ্বীপ, মাউন্ট হ্যারিয়েট, রেডিও স্টেশন, কারবিনস্ কোভের সমুদ্র উপকূল, ডেরা মধুবন, চিড়িয়াটাপু, নৃতত্ত্ব বিভাগের মিউজিয়াম, কটেজ ইণ্ডাস্ট্রিজ এমপোরিয়াম, চ্যাথামের স-মিল, ভাইপার দ্বীপ, হ্যাডোর জেটি ও চিড়িয়াখানা, সিপিঘাটের কৃষি উদ্যান, ধনিখাড়ির ড্যাম।

মেঘ ও পানির জন্য আন্দামান নিকোবরে আল্লার কাছে আকুতি জানাতে হয় না। পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত, কিন্তু এত জল ধরে রাখার কোন ব্যবস্থা প্রকৃতি দেয় নি। অল্পক্ষণের মধ্যেই সব জল সমুদ্রে গড়িয়ে যায়। এখানে না আছে বড় পুকুর, না কোন প্রবাহশীল নদী। বেশীর ভাগই নালা। উপত্যকার মধ্যে সমুদ্রের জল ঢুকে পড়ে ঝিলের মত অনেকগুলি বড় জলাশয় সৃষ্টি করেছে। এ জল দিয়ে না চলে সেচ, না যায় পান করা। এখানে ভূপৃষ্ঠের ঠিক নীচেই কোথাও পাথর, আবার কোথাও শিথিল বালুকারাশি। টিউবওয়েল

বসানো যায় না, আবার কূপেও ভাল জল পাওয়া যায় না। সারা বছর ধরে পোর্ট ব্লেয়ার সহরে মিঠা জলের সরবরাহ বজায় রাখা এক সুকঠিন কাজ। বৃষ্টির জল কোন-না-কোন উপায়ে ধরে রাখা ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। জল ধরে রাখতে গিয়েও উভয় সংকটে পড়তে হয়েছে—জলাধারের তলদেশ দিয়ে পর্যাপ্ত জল চুইয়ে যায়, আবার কড়া রোদের তেজে বাষ্প হয়েও যায় অনেক জল। ক্রমবর্ধমান লোককে মিঠাজলের যোগান দেওয়া জটিল সমস্যা। অবস্থা বিবেচনা করে ভারত সরকার এক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। সহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে ধনিখাড়ির নালায় বাঁধ দিয়ে এক জলাধার নির্মিত হচ্ছে। চতুর্থ পরিকল্পনা কালেই কাজ স্থরু হয়েছে; এখন সমাপ্তির পথে। ২৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রাথমিক এস্টিমেট। ৩৭·৫ মিটার উঁচু ও ১২৯ মিটার লম্বা কন্‌ক্রিট বিছানো জলাধার হবে। ৪০৭০ মিলিয়ন লিটার জল ধরবে এতে। প্রতিদিন ১·৫ মিলিয়ন গ্যালন জল পোর্টব্লেয়ার সহরে সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে বিশেষজ্ঞগণ বলছেন।

পোর্ট ব্লেয়ারে এখন তিনটি কনক্রিট জেটি। চ্যাথামের কাঠের পুরাতন জেটি কনক্রিটে রূপান্তরিত হচ্ছে। হ্যাডো পয়েন্টে বড় মিলিটারী জাহাজ নোঙ্গর করার উপযোগী বিরাট জেটি সম্প্রতি তৈরী হয়েছে। এই জেটির একাংশে সিভিল শিপ এসেও ভিড়ে। ফোয়েনিক্স বে'র ছোট জেটিও কনক্রিটের। সবই স্বাধীনতার পরের উন্নতি। মধ্য ও উত্তর আন্দামান এবং নিকোবরের বিভিন্ন দ্বীপে জাহাজ চলাচল করে ফোয়েনিক্স বে'র জেটি থেকে। মেরিন ক্রাফট্, ফেরিবোট, ইনটার আইল্যাণ্ডের ছোট জাহাজ এই জেটি থেকে ছাড়ে। ক্রাফট, লঞ্চ ও বোট মেরামতের ব্যবস্থা এখানে আছে। বড় জাহাজ ভিড়বার জন্য চ্যাথাম ও হ্যাডোর জেটি।

আন্দামানে বেসরকারী কোন ক্লিনিক ও ডাক্তারখানা নেই। হাসপাতালের ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিষিদ্ধ। তাঁরা সকলেই

নন-প্র্যাকটিসিং এ্যালাউন্স পান। চিকিৎসার ব্যাপারে সরকার কার্পণ্য করেননি। সকলের জন্য ফ্রি মেডিকাল ট্রিটমেন্ট। ১১টি হাসপাতাল—তিনটি নিকোবরে, আটটি আন্দামানে। ৪৯টি ডিসপেনসারী। পোর্ট ব্লেয়ারের জি. বি. পন্থ হাসপাতালটি বেশ বড় এবং আধুনিক সব রকম ব্যবস্থাপনায় সজ্জিত। জেনারেল ওয়ার্ডে ১৯২টি বেড, টি. বি. ওয়ার্ডে ৫০টি বেড এবং আইসোলেশন ওয়ার্ডে ২০টি বেড। নিকটবর্তী ব্যাম্বুফ্ল্যাটের হাসপাতালটিও খুব ছোট নয়। এই দ্বীপপুঞ্জের সব হাসপাতাল মিলে এ-পর্যন্ত পাঁচশ' বেডের সংস্থান করা গেছে। এটাও প্রধানত স্বাধীনতার পরবর্তী রূপান্তর। স্বাধীনতার পূর্বের ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য ছিল না।

আন্দামানে ডিসপেপসিয়া, ডাইরিয়া ও আমাশয় প্রধান রোগ। অন্যান্য রোগ তুলনায় কম। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বেশ কয়েকজন ডাক্তার আছেন পোর্ট ব্লেয়ারে। প্রত্যেকের মোটা বেতন, ফ্রি-কোয়ার্টার; তা'ছাড়া নন-প্রাকটিসিং এ্যালাউন্স রয়েছে। কলকাতার মত বহু রোগীর ভিড় হাসপাতালে হয় না। রোগ কম, রোগীর সংখ্যাও কম। তথাপি ডাক্তারদের মেজাজ সব সময় গরম। মুখ বুজে ধমক সইতে হয়। আচরণটা এমন—যেহেতু বিনা দর্শনীতে চিকিৎসা করছেন সেই হেতু রোগীরা যেন তাঁদের কৃপা প্রার্থী। অসুস্থ হ'লে হাসপাতালে না এসে কারো উপায় নেই। এখানে রোগীরা যত্ন পায় না। হাসপাতালের নামে সকলেরই আতঙ্ক। যেখানে ডাক্তারের ফি লাগে না, ঔষধের দাম লাগে না, হাসপাতালে থাকতে কোন পয়সা লাগে না, ফ্রি-ডায়েট, সেখানে প্রাইভেট ডাক্তারের জন্য এত অভাব বোধ কেন? পোর্ট ব্লেয়ারের ডাক্তারদের উদাসীনতা, উগ্রতা, হৃদয়হীনতা ও দুর্নীতি-পরায়ণতা সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। সযত্ন ট্রিটমেন্টেরই শুধু অভাব নয়, অনেকের মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা হাসপাতালের অধিকাংশ ঔষধ সহরের একটি বা দু'টি দোকানে নিয়মিত পাচার করা হয়। সহরে

ঔষধের কোন দোকান নেই, অথচ যেসব দোকান থেকে ডাক্তারদের বাড়ীতে মশলাপাতি, স্টেশনারী ও প্রসাধন দ্রব্য বাকীতে যায় সেখানে দুর্লভ ঔষধগুলি মিলে যখন হাসপাতালে তা অমিল। এখানে ডাক্তারদের প্রাত বীতরাগ ও বীতশ্রদ্ধ ভাব প্রবল। সরকারের ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি নেই, অভাব হৃদয়বান ও নির্লোভ ডাক্তারের। এ-কথাও কানে এসেছে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ডাক্তারের আচরণ একেবারে স্বতন্ত্র।

শিক্ষা সঙ্কোচের অপবাদ অন্ততঃ আন্দামানের ক্ষেত্রে কেউ ভারত সরকারকে দিতে পারবে না। যেখানে লোকের বাস সাকুল্যে সোয়া লক্ষের কোঠায় গিয়ে এখনও পৌঁছেনি, সেখানে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৬১। যেখানেই লোকালয় সামান্য কিছু গড়ে উঠেছে সেখানেই সরকার বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। মিশনারী দু' একটি ছাড়া এখানে কোন প্রাইভেট স্কুল নেই। প্রাইমারী হ'তে কলেজ পর্যন্ত শিক্ষা ফ্রি। ভারত সরকার শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রতি ছেলেমেয়ের পিছনে ৩২৫ টাকা ব্যয় করছেন। স্বাধীন ভারতের কোন রাজ্যে এটা কল্পনাতীত। খতিয়ে দেখেছি পোর্ট ব্লেয়ার ছাড়া অন্যত্র এক একটি বিদ্যালয়ে গড়পরতা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১১৫। পোর্ট ব্লেয়ার সহরে স্কুলের সংখ্যা অনেক বেশী, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও প্রতি স্কুলে বেশী। শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত ১ঃ ১০; কোথাও এই সীমা অতিক্রম করেনি। শিক্ষার ভিতকে মজবুত করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপরে উদার চিত্তে উপযুক্ত নজর দেওয়া হয়েছে। আন্দামান-নিকোবরে মোট ১৩০টি জুনিয়ার বেসিক স্কুল; সিনিয়ার বেসিক ২১টি এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১০টি। পোর্ট-ব্লেয়ার একটি ছোট সহর। পথে বেরুলেই সেখানে বিদ্যালয় দেখতে পাবেন। পাঁচটি উচ্চ মাধ্যমিক, চারটি সিনিয়র বেসিক, সাতটি জুনিয়ার বেসিক স্কুল; তাছাড়া একটি কলেজ ও একটি টিচারস্ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট পোর্ট ব্লেয়ার সহরে। দু'টি বাদে সবগুলি উচ্চ-

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহশিক্ষার ব্যবস্থা। শিক্ষাদান চলছে দুই মিডিয়ামে—হিন্দী ও বাংলা। ইংলিশ মিডিয়ামের একটি উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। মিশনারী পরিচালিত কারমেল স্কুলটি প্রাথমিক। আন্দামানে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী প্রায় সকলেই সরকারী চাকুরে। জুনিয়ার বেসিকের একজন শিক্ষক চাকুরিতে যোগদানকালে সব মিলে প্রায় ছয়শ' টাকা বেতন ও ফ্রি-কোয়ার্টার পান। উচ্চ-মাধ্যমিকের সরকারী শিক্ষক পান সাড়ে সাতশ' টাকার বেশী বেতন ও ফ্রি-কোয়ার্টার। উচ্চমাধ্যমিকের প্রধান শিক্ষক প্রিন্সিপাল নামে অভিহিত। তাঁর ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসারের র্যাঙ্ক; বেতন স্কেল ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সেই র্যাঙ্ক অনুযায়ী। দিল্লী বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশনের সঙ্গে এখানকার সব বিদ্যালয় যুক্ত।

এ-সব শিক্ষার বহিরঙ্গের কথা, হিসাব নিকাশের আলোচনা। বিদ্যালয় পরিচালন ও শিক্ষাদান পদ্ধতির বিষয় অনুসন্ধান করতে গিয়ে সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছি। প্রাথমিক ও জুনিয়ার হাই-স্কুলের নামকরণ হয়েছে 'বেসিক', অথচ বেসিক স্কুলের আদর্শ, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষানীতি কিছুই অনুসৃত হচ্ছে না। সেই গয়ংগচ্ছ ভাব, সেই ফাঁকি দেওয়া, সেই মামুলি কায়দায় পুঁথি পড়ানো। শুক্‌নো নীরস স্কুল। স্কুলকে নিজ পরিশ্রমে মনোরম রাখবো, আনন্দময় করে তুলবো এবং হাতে করে সৃষ্টি করে শিখাবো, হাতের লিখা ভাল করাবো, সহজভাবে মনের ভাব প্রকাশ করাব শক্তি এনে দিব—এ-সব চিন্তা ও প্রচেষ্টা শিক্ষকদের নেই। 'করার' দিকটা সম্পূর্ণ অবহেলিত। ভিতটা মজবুত করতে শিক্ষকরাও উৎসাহী নন; বিভাগীয় উপর মহলও এদিকে ভাবছেন না, তাকিয়েও দেখছেন না। মেনল্যাণ্ডের মাটিতে বেসিক শিক্ষাদানের ট্রায়াল নিষ্ঠার সঙ্গে কোথাও দেওয়া হয়নি। বহুবিধ অন্তরায় মাথা তুলে পথরোধ করেছে। সাহসের সঙ্গে তা অতিক্রম করার চেষ্টা আমরা করিনি। আমার

মনে হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষাদানের অতি অনুকূল পরিবেশ পাওয়া গিয়েছিল আন্দামানে। ছেলেমেয়ে সকলেই দরিদ্র চাষীর ঘরের সন্তান। নতুন জীবন স্থরু করতে হচ্ছে এখানে। শিক্ষার আলো সবে ঢুকছে পরিবারে। কৃষিই প্রধান পেশা। অধিকাংশই পুনর্বসতি প্রাপ্ত উদ্বাস্তু। জমির পরিমাণ পরিবার পিছু সমান। ধনী দরিদ্রের সমস্যা নেই। ভাগচাষী নেই। কৃষি মজুর নেই। খাটো— উৎপাদন কর—খাও। জায়গার অভাব নেই। বিদ্যালয় গৃহ ভাল। শিক্ষকের কোয়ার্টার মন্দ নয়। বেতন তো ভালই। তবু বেসিকের নামে প্রহসন কেন? কর্মবিহীন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কেন?—এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাইনি। কোন বিদ্যালয়ে উন্নত প্রথায় চাষ কাজ, সবজি বা ফুলবাগান করা শেখানো হচ্ছে না। কোন রকম হস্তশিল্প বা কারিগরী কাজ বা মাইনর রিপেয়ারিং শেখানোর কোন প্রয়াস কোথাও নেই। সেই মামুলি ধাঁচে গতানুগতিক পড়িয়ে যাওয়া। বিদ্যাকে বাহন না বানিয়ে বহন করার অপচেষ্টা সমানে চলছে। উদ্বাস্তু দরিদ্র চাষী সন্তানদের এভাবে কর্মবিমুখ, উপজীবিকায় অপটু, বাবু কাজের (white collared job) দিকে আগ্রহী করে গড়ে তোলার কুফল অচিরেই সেখানে দেখা দিবে। আজ যে সহরে বা গ্রামে কোন বেকার নেই আগামী দিনে সেখানে বেকারের মিছিল চাকুরির জন্য ধর্ণা দিবে। উৎপাদনমূলক পেশা ফেলে আপিসে বসা চাকুরী খুঁজবে। অকর্মণ্য ও অযোগ্য মানুষ যে পরিবার ও সমাজ উভয়েরই বোঝা এই সত্য আরো কত মূল্য দিয়ে যে আমাদের বুঝতে হবে তা জানি না। নইলে এমন অনুকূল পরিবেশেও শিক্ষার এই হাল !!

এখানে আর একটি চমৎকার রীতির পরিচয় পেয়েছি। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী সিনিয়রিটির বিচারে প্রমোশন পেয়ে থাকেন। যাঁরা স্নাতক নন তাঁরা কালক্রমে স্নাতকের গ্রেড পান। যাঁরা পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট নন তাঁরা পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটের স্কেলে উঠেন কয়েক বছরের

ব্যবধানে। যোগ্যতা নয়, সিনিয়রিটি যখন সকল বিভাগের প্রমোশনের মানদণ্ড তখন শিক্ষকগণ সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন কেন! মেনল্যাণ্ডের স্কুল-শিক্ষকদের কোন প্রমোশনও নেই কোন ডিমোশনও নেই; অযোগ্যতা ও অবহেলার জন্য কোন পানিশমেন্ট নেই। প্রশাসনে কোন আঁট নেই কোন দায়িত্ব বোধ নেই। সর্বত্র ঢিলেঢালা চলন। ডেমোক্রাসীর এই বিচিত্র নৃত্য আমাদের শেষ পর্যন্ত ভরাডুবি ঘটাবে না তো?

পোর্ট ব্লেয়ারে ডাক আসে সপ্তাহে মাত্র দু'দিন, যায়ও দু'দিন। ইণ্ডিয়ান এয়ার ওয়েজের প্লেন যেদিন পোর্ট ব্লেয়ারে নামে সেদিন বিকালে প্রধান পোষ্টাপিসের গেটে ভীড় জমে যায়। চিঠিপত্র, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন সবই সপ্তাহে দু'দিন পাওয়া যায়। বর্ষাকালে যখন সাময়িক প্লেন বন্ধ থাকে তখন জাহাজ ছাড়া চিঠিপত্র আসা যাওয়ার অন্য কোন উপায় থাকে না। কতদিনে প্লেন রোজ আসা যাওয়া করবে তার কোন ইঙ্গিত এখনও নেই।

এবারডিন বাজারের দক্ষিণপূর্ব কোণে কিছু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবেন প্রকাণ্ড প্যারেড গ্রাউণ্ড। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে নেতাজী এই প্রশস্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। প্যারেড গ্রাউণ্ডের পূবে সমুদ্রের পাড় বরাবর মনোরম মেরিনা পার্ক তৈরী করা হয়েছে। সান্ধ্য ভ্রমণের অপূর্ব জায়গা। রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজীর মূর্তি মাঝখানে শোভা পাচ্ছে। পাশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শহীদ-স্তম্ভ। সমুদ্র খাড়ির অপর প্রান্তে রসদ্বীপ।

সৈন্যবিভাগের বিনা অনুমতিতে রস আয়ল্যাণ্ডে কেউ নামতে পারে না। চ্যাথামের প্রবেশ পথে হাতের বাঁয়ে রসদ্বীপ। একসময়ে ইংরেজের গড়া স্বর্গ আজ ভগ্নস্তূপ। ইংরেজ বনেদি জাত। তারা অচেনা অজানা ও দুর্গমকে যেমন জয় করেছে তেমনি সাক্ষর রেখে গেছে কেমন করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়। রসদ্বীপ তার একটি সুন্দর নজির। ছোট এক টুকরা পাহাড়ী দ্বীপ। আয়তনে

শ'দুই একর মাত্র হবে। কিন্তু দ্বীপটির অবস্থানগত গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। সামনে আর কোন দ্বীপ নেই। বহুদূর পর্যন্ত সমুদ্র দেখা যায়। জাহাজ চলাচলের উপর নজর রাখার পক্ষে অতি চমৎকার স্থান। আবার জংলী আদিবাসী ও খুনী কয়েদীদের নিরাপদ দূরত্বে রেখে নিশ্চিন্তে প্রশাসন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে সুন্দর জায়গা। প্রায় এক শতাব্দী ধরে গড়ে তোলা চীফ্-কমিশনারের 'স্বর্গরাজ্য'। আন্দামান-নিকোবরের অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ হেডকোয়ার্টার্স। পদস্থ ইংরেজ অফিসারসহ চীফ্-কমিশনার থাকতেন এখানে। ডেপুটি কমিশনার দেশীয় অফিসারদের নিয়ে থাকতেন পোর্ট ব্লেয়ারে। রস ও পোর্ট ব্লেয়ারের মধ্যে স্বল্প পরিসর খাড়িতে ফেরিবোট সারাদিন পারাপার করত। সকালে বহু কয়েদী রোজ এসে রাস্তাঘাটে ঝাড়ু দিত, সাফাই করত, ফাইফরমাস খাটত; সন্ধ্যায় ফিরে যেত আপন কয়েদ ঘাটিতে। ঘন বনানীতে ছাওয়া দ্বীপের একেবারে উঁচু টিলার উপরে চীফ্-কমিশনারের বাংলো ও দরবার ঘর। তার এক প্রান্তে চার্চ, অপর প্রান্তে ১৫,০০০ ইংরেজ সৈন্য থাকার মত পাকা মজবুত লম্বা ব্যারাক। ব্যারাকের ছাদে দাঁড়িয়ে শত্রু জাহাজের আনাগোনা লক্ষ্য করার জায়গা। কিছু নীচে সেটলমেন্ট অফিসারদের কুঠি। তারপর সুপরিকল্পিত ভাবে গড়া ক্লাব ঘর, নাট্যশালা, গেষ্ট হাউস, সুইমিং পুল, টেনিস কোর্ট, বাজার, মহিলা কয়েদীর বন্দীশালা, গ্রেভইয়ার্ড। রাস্তাঘাট পাকা বাঁধানো; রাস্তার পাশে ছোট পগু ও বিউটি স্পট, স্টোররুম। সমুদ্রের কিনারে শান্ত্রীদের পাহারা দিবার ঘর। পরিপাটি ব্যবস্থা। প্রায় শতাব্দীকাল এই প্যারাডাইসে অফিসারগণ সুখ সম্ভোগ করেছেন। ঈশ্বরের প্রতিনিধি রাজা; রাজপ্রতিনিধি চীফ্-কমিশনার। সে সময় এই এক মানুষের ইচ্ছা ও খেয়াল খুশিই ছিল দ্বীপপুঞ্জের আইন। ১৯৪১ সালে জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় এই দ্বীপ সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হয়। পোর্ট ব্লেয়ারে নেমেই জাপানীরা রস আয়ল্যাণ্ডের গুরুত্ব বুঝতে

পেরেছিল। পাহারা বসিয়ে দিয়েছিল দিনরাত। নেতাজীকে রাখা হয়েছিল রসের চীফ্-কমিশনারের বাংলোতে। স্বাধীন ভারত সরকারের হাতে আসার পর অযত্নে অবহেলায় অব্যবহারে রসদ্বীপ এখন সম্পূর্ণ ভগ্নস্তূপ, একেবারে চুরমার। অতীতের নন্দনকানন জনমানবহীন। কিছু হরিণ ও ময়ূর শুধু ঝোপঝাড়ের মাঝে বিচরণ করে বেড়ায়। জনকয়েকমাত্র জোয়ান পাহারায় রয়েছে। ওয়্যারলেস অপারেটর কেরল প্রবাসী বাঙ্গালী তরুণ রবীন্দ্রনাথ সেনাপতি এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত আমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে দেখান। শ্রীসেনাপতি গাইড হয়ে সঙ্গে না থাকলে দ্বীপটা এমন করে খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব হতো না।

স্বর্গরাজ্যে নিধন অনভিপ্রেত। সম্ভবতঃ এই কারণে ইংরেজ যমালয় করেছিল ভাইপার দ্বীপে। জংলীঘাটের অপর প্রান্তে নিরালা নির্জন দ্বীপ। এখানে চেনকয়েদীদের এনে যথেচ্ছ নির্যাতন করা হতো। কেউ জানতে পেত না। ফাঁসীর আসামীদের সকলের অজ্ঞাতে জীবনান্ত ঘটতো। ছোট টিলার উপরের ফাঁসী ঘরের ধ্বংসস্তূপ এখনও সাক্ষ্য বহন করছে। নারিকেল বাগিচার মুষ্টিমেয় পাহারাদার ছাড়া ভাইপারে কোন লোকবসতি নেই। একটি নিরালা পিক্‌নিক্ স্পট। সহর থেকে মাঝে মধ্যেই যে পিক্‌নিক্ পার্টি আসে তার নজির এখানে সেখানে।

সুখী জীবনের একটি বিলাস শিকার। পাখী শিকারের নাম করা জায়গা চিড়িয়াটাপু। দক্ষিণ আন্দামানের শেষ প্রান্ত এটি। 'চিড়িয়া' শব্দটি আমাদের পরিচিত। টাপু মানে দ্বীপ। চিড়িয়াটাপু পাখীর দ্বীপ। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে বেরিয়ে এয়ার পোর্ট বাঁ পাশে রেখে সোজা দক্ষিণে এগিয়ে গেলে বিডনাবাদের মধ্য দিয়ে রঙ্গাচঙ্গের সমুদ্র সৈকতের কিনার ঘেঁষে মনোরম নারিকেল বাগিচার মাঝ দিয়ে ১৩।১৪ মাইল যাবার পর চিড়িয়াটাপু। বিডনাবাদ লোকাল বর্ন্‌দের একটি বড় গ্রাম। রঙ্গাচঙ্গ কেরল-প্রবাসীদের গ্রাম। সবুজবীথি

মন ভুলিয়ে দেয়। দিগন্ত-প্রসারিত সমুদ্রের ঠিক খাড়া পাড়ের উপরে নবনির্মিত রেস্ট হাউসটি সত্যিই মনোরম। সম্মুখে সাগর, পশ্চাতে গাঢ় সবুজ বনানী, পাখীর বিচিত্র কাকলি, পায়ের তলায় ছোট টিলা, মাঝখানে রেস্ট হাউস। নীচে খাড়িতে বাঁধা জেলে-ডিঙ্গীর সারি। গৃহিণীকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে অফিসারগণ ছুটির দিনে বিশ্রাম নিতে আসেন। পোর্ট ব্লেয়ার হতে নিয়মিত বাস-সার্ভিস রয়েছে।

পোর্ট ব্লেয়ারের হ্যাডোতে একটি ছোট চিড়িয়াখানা রয়েছে। ১৯৫৭ সালে বনবিভাগের তত্বাবধানে খোলা হয়েছে। এখানে এলে দ্বীপপুঞ্জের বন্য জীবনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচিতি ঘটে। হরিণ যদিও আমদানী করা; ওরা নতুন বাসস্থানকে আপন করে নিয়েছে। স্পটেড ডিয়ার, বার্কিং ডিয়ার ও হগ-ডিয়ার যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের অনুসন্ধানের ফলে পাখীর স্পেসিস পাওয়া গেছে ১১২টি। সবগুলিই স্থানীয় নয়। নারকোনডাম, হর্ণবিল, নিকোবরের পারাবত এবং মেগাপড ভারতের আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। শুধু পোর্ট ব্লেয়ার নয়, গোটা আন্দামান জুড়েই শেয়াল কুকুরের জ্বালাতন নেই, বাঘ ভালুকের আতঙ্ক নেই, বানর বেজির উপদ্রব নেই। কখনও কোথাও গাছের ডালে ধানের শীষে সবজির ডগায় দিনের বেলায় ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখী এসে বসে। শস্য ও সবজির ক্ষতি করে। সহরতলী ও গ্রামে রাতের আঁধারে দল বেঁধে আসে হরিণ। বনবিভাগের হাতী শস্যক্ষেত্রে ও লোকালয়ে কখনও কখনও হানা দেয়। এখানে হাঁস-মুরগী পালা সুবিধা। একমাত্র রোগ আক্রমণ ছাড়া অন্য কোন ভয় নেই। গরুমোষের খাবারেরও কোন অভাব নেই। পশুচিকিৎসা ও পশুপালন বিভাগ তেমন সক্রিয় বলে মনে হয়নি।

আন্দামানে না এলে বোঝা যাবে না বঙ্গোপসাগরের বুকে শৈলময় ছোট ছোট দ্বীপমালা কী অপূর্ব-প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মণ্ডিত

হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চিরহরিৎ বনরাজি এই সৌন্দর্যকে দিয়েছে অম্লান মহিমা! নীলসিন্ধু জল দিনরাত চরণ ধুয়ে যাচ্ছে। শীতের কাঁপুনী ও গ্রীষ্মের তাপদাহ নেই। পোর্ট ব্লেয়ার ছবির মত সহর। মাদ্রাজ ও কলিকাতার প্রায় সমদূরবর্তী। বাধাবিঘ্ন অসুবিধা অতিক্রম করে চিরসবুজের দেশে বেড়াতে এলে কাউকেই শূন্য মনে ফিরে আসতে হবে না। পোর্ট ব্লেয়ার রেডিও স্টেশন থেকে সহরের দৃশ্য অপূর্ব।

॥ ছয় ॥

বহু বিস্ময় বহু মনোলোভা শোভা ছড়িয়ে রয়েছে আন্দামান নিকোবরে। সাগর জলের এখানে সেখানে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে রাশি রাশি প্রবাল মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তরঙ্গের সাথে ভেসে আসছে অহরহ নানা বর্ণের নানা আকৃতির অগণিত ঝিনুক ও শঙ্খ। কুড়িয়ে নিবার জন্য বেলাভূমিতে লুটোপুটি। এককালে যা ছিল মুল্যহীন, এখন তার চাহিদা বাড়ছে দিনের পর দিন। অলঙ্কার ও গৃহসজ্জার উপকরণের নিত্য নতুন চাহিদা। বস্তাবন্দী হয়ে জাহাজে চেপে ঝিনুক ও শঙ্খ চলে আসছে কলকাতায়। কেটে-কুটে ঘসে-মেজে চেঁছে-ছুলে তৈরী হচ্ছে কত বিচিত্র সৌখিন জিনিস— অ্যাসট্রে, ল্যাম্পস্ট্যাণ্ড, পেনস্ট্যাণ্ড, ফুলদানী, ধূপদানী, লকেট, কণ্ঠহার, দুল, অঙ্গুরি ইত্যাদি। এই ব্যবসায়ে বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ নয়; পোর্ট ব্লেয়ারে একাধিক দোকান আছে।

কাঁকড়া আমাদের সকলেরই পরিচিত। নদীনালা খালবিলে বর্ষায় কাঁকড়ার অন্ত নেই। এরা ক্ষুদে কাঁকড়া নিরীহ গোবেচারা। সাধারণ মানুষের ভক্ষ্য। কলকাতার বাজারে গঙ্গার কাঁকড়াগুলি বেশ বড়। কাঁকড়া প্রধানতঃ জলচর। মেটে কাঁকড়াও আছে। বালির মধ্যে গভীর গর্ত করে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকে। আন্দামানে

একজাতের মেটে কাঁকড়ার বাস আছে—যারা শুধু অতিকায় নয় স্বভাবে দস্যু। কাঁকড়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও অদ্ভুত জাত। এক একটির ওজন ৩৷৪ কিলো। থাবার মধ্যে একটা বয়স্ক ছাগলকে সচ্ছন্দে পাকড়ে ফেলতে পারে। এরা প্রধানতঃ ফলাহারী ; নারিকেল প্রধান খাদ্য, খেতে খুব ভালবাসে। তাই বলে নিরামিষাশী নয়, মাংস ভোজীও বটে। পোকামাকড় ও ছোট জন্তু হাতের কাছে পেয়ে গেলে খেয়ে নেয়। প্রশান্ত, ভারত মহাসাগর এবং আন্দামান সাগর ছাড়া আর কোথাও এদের সন্ধান মিলে না। দশ পা-ওয়ালা শক্ত খোলায় ঢাকা দস্যু কাঁকড়া। গাছে চড়তে ওস্তাদ। পাম জাতীয় গাছে তর তর করে উঠে যায়। উঠবার সময় মাত্র চারপায়ের ব্যবহার করে। লম্বা লম্বা পা। সাঁড়াশীর মত মজবুত পায়ে এত জোর যে কোন ছোট ছেলের বাহুর হাড় ভেঙ্গে ফেলতে পারে। একটি নারিকেল সহজেই দু'ভাগ করে ফেলে। নীল ও লালে মিশানো গায়ের রং। মাটির নীচে বাস করে। মানুষের সাড়া পেলেই সরে যায়। মানুষের সংসর্গ সব সময় এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। যে দ্বীপে মানুষের বাস সেখানে এরা থাকে না। যখনই কোন দ্বীপ মানুষ গিয়ে দখল করেছে সঙ্গে সঙ্গে দিনে বের হওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। রাতের অন্ধকার ছাড়া বেরই হয় না। অবস্থা বিশেষে দ্বীপ ছেড়েই চলে যায়। অত্যন্ত নির্জন জায়গা খুঁজে বেড়ায়। নিশ্চুপ ও নিঝুম পরিবেশ না পেলে গর্তের বাইরে আসে না। বিন্দুমাত্র শব্দে সজাগ হয়ে উঠে। যুদ্ধাদির সময় জাহাজ চলাচলের শব্দে এক দ্বীপ হতে আর এক দ্বীপে পালাবার সময় সম্ভবতঃ বহু কাঁকড়ার মৃত্যু ঘটেছে। আন্দামানের সাঁউথ সেন্টিনেল দ্বীপে কিছু দৈত্য কাঁকড়া আত্মগোপন করে বাস করছে। এ দ্বীপে কোন মানুষের বাস নেই। আশপাশের দ্বীপেও জনবসতি নেই। নারী-কাঁকড়া অত্যন্ত লাজুক, বাইরে প্রায় বেরই হয় না।

এদের চাল-চলন কেমন, ইন্দ্রিয়গুলি কতদূর সক্রিয়, দৈহিক গঠন প্রণালী কী ধরনের এবং পরিবেশের দ্বারা এরা কতটা প্রভাবিত —এসব বিষয় খুব কম লোকই জানেন। এদের তলপেটের চর্বি খুব তৈলাক্ত। এই চর্বির চাহিদা অত্যন্ত বেশী। যৌন-সহযোগের সময় উত্তেজনা বৃদ্ধি করার খুব শক্তি রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এর চর্বি এক কাপ পঞ্চাশ টাকায় বিক্রী হয়েছে।

পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ কঁাকড়াবিদ্ জার্মান জীব-বিজ্ঞানী মিঃ আলটেভেগট ১৯৫৩-৫৪ সালে মনিষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারত সরকারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে আন্দামানে আসেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্‌টিটিউটের প্রকৃতি বিজ্ঞানী মিঃ টি. এ. ডেভিস। সাউথ সেণ্টিনেল দ্বীপে দিন কয়েক থেকে দস্যু কঁাকড়ার চালচলন স্টাডি করেন। প্রচণ্ড অসুবিধা অগ্রাহ্য করে তাঁরা কঁাকড়ার পথ চেয়ে বসে থাকেন এবং ছয়টি জীবন্ত কঁাকড়া পোর্ট ব্লেয়ারে ধরে নিয়ে আসেন। তাঁদের কঁাকড়া ধরার অভিজ্ঞতা চমকপ্রদ। প্রথম দিনই এক দস্যুকে পাকড়াও করেন। মনে খুব আনন্দ। এনে পুরলেন মজবুত এক বাকেটের মধ্যে। ঢাকনিটা ছিল বেশ শক্ত; কাজেই চিন্তার কোন কারণ ছিল না। ক্লান্তদেহে দু'জনে টেণ্টে ঘুমিয়ে পড়েছেন। মাঝরাতে খুটখাট শব্দে ধরফড় করে উঠে টর্চ জ্বালিয়ে দেখেন কঁাকড়াটি বাকেট মুচড়ে লম্বা করে ফেলেছে, ঢাকনিটি দুমড়ে দিয়েছে। মেজেতে বিছানো মজবুত নাইলন ফুটো করে হাত খানেক লম্বা গর্তের ভিতর দিয়ে পালিয়ে গেছে। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। টর্চ নিয়ে টেণ্টের বাইরে এলেন। কাণ্ড দেখে উভয়েই অবাক। প্রায় গোটা ত্রিশ কঁাকড়া তাঁবু ঘেরাও করে ফেলেছে। দেখেন চপ্পল, ব্যাগ, টিনের কৌটা ইত্যাদি যা কিছু জিনিসপত্র সঙ্গে ছিল সব জঙ্গলের মধ্যে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একেবারে ডাকাতের স্বভাব!

স্বজাতির মাংস অনেক সময় খায়। মাংস খাবার জন্য নিজেদের

মধ্যে লড়াই বাধিয়ে বসে। লড়াই চলাকালে পথচলার প্রথম জোড়া লম্বা পা বেশী ব্যবহার করে। এই পায়ের মাথায় তীক্ষ্ণ নখ। ধারাল নখ দিয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত করে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। পিছন দিকের একজোড়া পা দিয়ে চর্বিময় নরম তলপেট রক্ষা করে। ওদের দস্যু স্বভাব ও ভূতুড়ে কাজ দু-চারদিনে জানা যায় না। এদের বিষয় অনেক স্টাডি করার আছে। গভীর জঙ্গলে কীভাবে অপরের কাছে সংবাদ পাঠায়? সমুদ্র সৈকতে রাতে পরস্পরের মধ্যে কী করে যোগাযোগ রক্ষা করে? দু'একটি কাঁকড়া বেহালাবাদকের মত কি ঝঙ্কার ছড়িয়ে দেয় বাতাসে? ঘ্রাণ নেবার শুনবার ও দেখবার ইন্দ্রিয় কতটা পরিস্ফুট? নারিকেল দু' ভাগ করে ফেলার কৌশলই বা কী অবলম্বন করে? যৌন-মিলনই বা ঘটে কীভাবে? এ-রকম অনেক কিছুই আজও অজানা রয়েছে। ডিম থেকে সাবালক হওয়া অবধি এই ডাকাতদের জীবন-ধারা জানতে পারলে বোঝা যেত ভবিষ্যতে এদের লালনপালন করা চলবে কি না।

দস্যু কাঁকড়া যেমন লোকালয় এড়িয়ে চলে, কান-খাজুরা তেমনি লোকালয়ের আনাচে-কানাচে হামেশাই ঢুকে পড়ে। এদের গতিবিধি বর্ষাকালে বেশী, কামড়ে যন্ত্রণাও ভয়ানক। আন্দামানের সাপে মারাত্মক বিষ নেই; কামড়ালে যন্ত্রণাও বেশী হয় না। কিন্তু কানখাজুরার কামড়ে জ্বালা বেশী। ফলে ছেলেমেয়ে বৌ-ঝি সকলেরই কান-খাজুরায় আতঙ্ক। দেখতে বড় বিছার মত। মশারীর গায়ে, বিছানার তলায়, বাক্সডেক্সর আড়ালে, ঘরের কোণায়, ভাঁড়ারের জিনিষের মধ্যে নজর এড়িয়ে ঢুকে বসে থাকে। গায়ে পা লাগলেই কামড়ে দিবে। এদের বিষ ও আচরণ-বিচরণ সম্পর্কে কোন প্রকৃতি-বিজ্ঞানী এ-যাবৎ কিছু বিশেষ স্টাডি করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই। তবে আন্দামানে সাপের চেয়ে কানখাজুরার ভয় বেশী।

এ-কথা আগেই উল্লেখ করেছি, বন-সম্পদে আন্দামান নিকোবর সত্যই ধনী, কিন্তু বন্য পশু, পাখী সম্পদে দরিদ্র। সরীসৃপ সম্পদের কিছুটা অবশ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখন বন-সম্পদের কথায় একটু আসা যাক্। আদিম মানুষ ছিল অরণ্যবাসী। আজও তাই। লতাগুল্মের আঁচল ধরে তারা পথ চলতো। বৃক্ষের আচ্ছাদনের তলায় শয্যা পাততো। কখনও নির্মমভাবে বৃক্ষের গায়ে করাত চালায় নি। ভূমির ক্ষুধা প্রবল ছিল না। লোকসংখ্যাও ছিল খুবই সীমিত। সভ্য মানুষের আস্তানা পাতবার আগে দীর্ঘ দিন বিচ্ছিন্ন ছিল এই দ্বীপপুঞ্জ। নিরুপদ্রবে অরণ্য বিস্তারে কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি। বৃষ্টির কোন অভাব ছিল না। এই কারণে সকল দ্বীপেই শতকরা ৭৩ ভাগ ভূমিই অরণ্যময়। মেনল্যাণ্ডে অরণ্যের পরিমাণ বর্তমানে শতকরা মাত্র ২৪ ভাগ। পৃথিবীর যত স্থলভাগ আছে তার শতকরা ৩৩ ভাগ অন্তঃত অরণ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। মানুষের কল্যাণেই প্রয়োজন।

সারা বছর ধরেই বৃষ্টি। বন-সম্পদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি তাই সহজ ও সাবলীল। উষ্ণ মণ্ডলে জন্মোপযোগী ৮০টি স্পেসিসের সন্ধান পাওয়া গেছে এখানে। বাজারে চাহিদা মাত্র ২৫টি স্পেসিসের, অন্যগুলির কদর নেই। সভ্য মানুষ চায় প্রধানতঃ চার ধরণের কাঠ: প্লাই উড, ম্যাচ উড, ফার্ণিচার উড, হাউস বিল্ডিং উড। আন্দামানে একাধিক প্লাই উড ফ্যাক্টরি গড়ে উঠেছে। মেনল্যাণ্ডের ম্যাচ শিল্প এখানকার কাঠের উপর নির্ভরশীল। নরম কাঠের লগ ছাড়াও ম্যাচকাঠি এখান থেকে চালান যায়। উইমকো ম্যাচ ফ্যাক্টরির একটি প্রধান কেন্দ্র এখানে। গৃহসজ্জার টেবিল চেয়ার টি-পয় পুতুল শেল্ফ ইত্যাদি তৈরীর সুন্দর কাঠ পাওয়া যায়। পোর্ট ব্লেয়ারে কটেজ ইণ্ডাস্ট্রিজ এমপোরিয়ামে ফার্নিচার ও পুতুলের নমুনা দেখতে পাবেন। গৃহ নির্মাণের খুটি, বর্গা, রুয়া, বাটাম, দরজা, জানালা তৈরীর বিরাট চাহিদা

মিটায় এখানকার কাঠ। আন্দামান নিকোবরে অধিকাংশ গৃহ কাঠের।

বনসম্পদ যদিও পর্যাপ্ত কিন্তু অফুরন্ত নয়। সভ্য মানুষের বিপুল চাহিদা মিটাতে গিয়ে শেষপর্যন্ত দ্বীপপুঞ্জ নিঃস্ব হয়ে যাবে কিনা কে জানে! বন-বিভাগের কাজ শুধুমাত্র গাছের জাত চিনে নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করা নয়; মূল্যবান জাতের নতুন নতুন চারা নিয়মিত রোপণ করাও তাদের কাজ। মূল্যবান স্পেসিস লাগিয়ে বন-সম্পদকে ক্রমশঃ উন্নত করে তোলার পরিকল্পনা কতটা কার্যকরী করার চেষ্টা চলছে বলা দুষ্কর। আবার বিনা যত্নে স্বাভাবিক ভাবে যে সকল গাছ গজিয়ে উঠছে তার সংরক্ষণের দায়িত্বও বন-বিভাগের। এই গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে বন বিভাগের সচেতনতা সন্দেহাতীত নয়। ধূপ গাছ আন্দামানের এক মূল্যবান সম্পদ। ধূপের চাহিদা প্রবল। এখানকার বেত বেশ পুষ্ট ও ভাল। কোন কোন জাতের বেত পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতার দাবী করতে পারে। বাঁশ সর্বত্র মিলে না।

গভীর অরণ্যের ভিতর থেকে বড় বড় গাছ কেটে বের করে আনা দুরূহ কাজ। বনের মধ্যে রাস্তা নেই। লতাগুল্ম বেতে আচ্ছাদিত উঁচু-নীচু পাহাড়ে জমি। রাস্তা করাও সহজ কাজ নয়। এই কারণে হাতীর সাহায্য নেওয়া হয়। বড় বড় লগ হাতী টেনে নিয়ে আসে। ট্রাকটারের সাহায্যও প্রয়োজন মত লওয়া হয়। বন-বিভাগের উদ্যোগে কয়েক কিলোমিটার ট্রাম লাইন বসানো হয়েছে। স্টীম ইঞ্জিনের সাহায্যে কাঠ-বহনকারী ট্রাক ট্রাম লাইনে চালিয়ে জলাশয়ের কিনারা পর্যন্ত এনে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ভাসান লগ মোটর বোট টেনে এনে বন্দরের গায়ে জমা করে। ভারি কাঠ ওয়াটার ক্রাফটে চাপিয়ে চ্যাথামে আনা হয়। তারপর জাহাজে চাপিয়ে মেনল্যাণ্ডে চালান।

অরণ্যের গভীর বনের মধ্যে চলছে এক বিরাট কর্মকাণ্ড। কয়েক হাজার কুলিকামিন মেহনত করছে চোখের অন্তরালে।

দিনের পর দিন বেশ কয়েকটি হাতী পরিশ্রম করে চলেছে। অফিসারদের অবিরত ঢুকতে হচ্ছে বনের মধ্যে। নিঝুম বনের শান্তি ভঙ্গ করছে সভ্য মানুষ। নির্বিচারে ধরাশায়ী করছে বিরাট বিরাট বৃক্ষ, সমুদ্রের কূলে টেনে আনছে বড় বড় লগ, চালান দিচ্ছে দেশ-বিদেশের বন্দরে। সভ্য মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে কেড়েছিঁড়ে নিচ্ছে অনেক, ফিরিয়ে দিচ্ছে কম।

বন বিভাগে আন্দামানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। বন প্রশাসনের অধীনে রয়েছে ৭,৪৬,৬৬৯ হেক্টর বনভূমি, কিন্তু কাজ চলছে ৪,৮৫,২০১ হেক্টর বনানীতে। এই অরণ্য রাজ্যে বহু ধরণের বৃক্ষ। কাঠের প্রকৃতি, বাজারে চাহিদা ও মূল্য বিচারে এই বৃক্ষগুলিকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি :—

মাঝারি চালু কাঠের গাছ ঃ হোয়াইট ধূপ (নরম), বাকোটা (নরম), পিনমা (শক্ত), জৈফল (আধা শক্ত), প্যাডক (শক্ত), লম্বাপটি (নরম), হোয়াইট চুগলাম (শক্ত), থিটপোক (নরম)।

খুব চালু গাছ ঃ গর্জন (শক্ত), পাপিতা (নরম), বাদাম (শক্ত)।

দুষ্প্রাপ্য গাছ ঃ মার্বল উড বা এবোনী (শক্ত), সাটিন উড (শক্ত), চুই (শক্ত)।

তেমন চালু নয় এমন গাছ ঃ কোকো, লালচিনি, টুঙ্গ, পিন্‌নে, হোয়াইট থিঙ্গাম, রেড বম্বয়ে (সব শক্ত); কদম শিমুল (নরম)।

চাহিদাহীন গাছ ঃ থিঙ্গাম (আধা শক্ত), রেড ধুপ (আধা শক্ত)।

আন্দামানে চাহিদা বেশী এমন গাছ ঃ ব্ল্যাক চুগলাম (শক্ত), আন্দামান বুলেট উড (শক্ত)।

শক্ত ও নরম কাঠ চিনবার সহজ উপায়—শক্ত কাঠ জলে ডুবে

যায়, আর নরম কাঠ ভাসতে থাকে। মিল চিরাই হবার পর বাইরে পাঠানো হয়, আন্দামানেও গৃহ নির্মাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। কাঠ সংগ্রহের সুবিধার জন্য সাউথ আন্দামানের অরণ্য অঞ্চলে ৩৪'২০ কিঃ মিটার এবং মিডল আন্দামানে ৪০'৪৯ কিঃ মিটার ট্রাম লাইন বন-বিভাগ বসিয়েছে। সাউথ আন্দামানে ৪৩টি, মিডল আন্দামানে ৪৩টি এবং নর্থ আন্দামানে ৫টি হাতি বড় বড় কাণ্ড টানায় নিযুক্ত রয়েছে। সাড়ে তিন হাজার নিয়মিত এবং দু' হাজার অনিয়মিত মজুর পরিশ্রম করছে কাঠ কাটা ও টানার কাজে। গেজেটেড ও নন্ গেজেটেড অফিসারের সংখ্যা পাঁচ শতের কম নয়। আন্দামান অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বার্ষিক রেভিন্যুর শতকরা ৬০।৬৫ ভাগ বনবিভাগ থেকে আসে। সরকারী কৃষিফার্মে যেমন ব্যয় বেশী, আয় কম; তেমনি আন্দামানের বনবিভাগেও ব্যয় বেশী, আয় কম। আয়-ব্যয়ে সঙ্কুলান হয় না। এটা দুঃখজনক পরিস্থিতি।

বন-বিভাগের প্রদত্ত তথ্য নির্ভর করে আন্দামানে যে সকল দারু শিল্প গড়ে উঠেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি ঃ—

ক্রমিক নং	শ্রেণী	রেজিষ্ট্রীকৃত সংস্থা	অবস্থান	কর্মী সংখ্যা
১।	প্লাই-উড	(ক) জয়শ্রী টিমবার প্রোডাক্টস্ (প্রাঃ)	বকুলতলা (মিডল আন্দামান)	৪২৫
		(খ) আন্দামান টিমবার প্রোডাক্টস (প্রাঃ)	বাম্বুফ্ল্যাট (সাউথ আন্দামান)	৫২৫
২।	ভিনিয়ারিং	(ক) আলবিয়ন প্লাই-উড লিঃ (প্রাঃ)	লং আইল্যাণ্ড (মিডল আন্দামান)	২০০

ক্রমিক নং	শ্রেণী	রেজিষ্ট্রীকৃত সংস্থা	অবস্থান	কর্মী সংখ্যা
৩।	ম্যাচ স্পিলইন্ট	(ক) ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোঃ লিঃ (প্রাঃ)	পোর্ট ব্লেয়ার (চ্যাথামের নিকটবর্তী)	১০০
৪।	স-মিল	(ক) গভর্ণমেণ্ট স-মিল	চ্যাথাম (সাউথ আন্দামান)	১১০০
		(খ) বেতাপুর স-মিল (গভর্ণমেণ্ট)	বেতাপুর (মিডল আন্দামান)	১০০
		(গ) আন্দামান উড প্রোডাক্টস লিঃ (প্রাঃ)	জঙ্গলী ঘাট (পোর্ট ব্লেয়ার)	৫০
৫।	ফার্নিচার	(ক) কলেজ অব ইণ্ডাস্ট্রি এণ্ড উডওয়ার্কিং ইউনিট	পোর্ট ব্লেয়ার	২০/২২
৬।	জাহাজ ও বোট তৈরী	(ক) বোট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ইয়ার্ড	লং আইল্যাণ্ড	৫৫
		(খ) মেরিন বোট তৈরী ও মেরামতী ইয়ার্ড	পোর্ট ব্লেয়ার	৩২৫

এতগুলি ফ্যাক্টরির মধ্যে সরকার পরিচালিত চ্যাথাম স-মিল সবচেয়ে পুরাতন ও বড়। সব প্রাইভেট ফ্যাক্টরিতে কম বেশী লাভ থাকছে, বিস্ময়ের বিষয় চ্যাথাম স-মিল লোকসানে চলছে! রাষ্ট্রায়ত্বে যখনই যে শিল্প পরিচালন করা হচ্ছে সেখানেই দক্ষতার

অবনতি ঘটছে, উৎপাদন নিম্নগামী হচ্ছে, ব্যয় বাড়ছে আয় কমছে! চ্যাথাম স-মিলেও তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি।

বনবিভাগ অঢেল জ্বালানীকাঠ ও শিল্পকাঠ সরবরাহ করছে। মুক্ত অরণ্যে পুনরায় সুপরিকল্পিত ভাবে মূল্যবান গাছের চারা লাগাবার চেষ্টা চলছে। উন্নত টিকউডের জন্য ব্রহ্মদেশের খ্যাতি। বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন আন্দামান নিকোবরেও চেষ্টা করলে উন্নত জাতের টিকউড জন্মান যাবে। এই পরিকল্পনায় কিছু কিছু মূল্যবান জাতের চারা লাগান আরম্ভও হয়েছে। তিন বছরের একটি সরকারী হিসাব তুলে দিচ্ছি। সাম্প্রতিক হিসাব এখনও অপ্রকাশিত।

টিকউড	প্যাডক	ম্যাচ-উড	অন্যান্য
৪৪৯ হেক্টর	৪৪ হেক্টর	১৮ হেক্টর	১২৯ হেক্টর
৪৪২ „	৫৪ „	২২ „	১২১ „
৮০০ „	৫০ „	২০ „	১২০ „

ধূপ ও রেসিনের গাছ মিডল ও নর্থ আন্দামানে জন্মেনা। সাউথ আন্দামানে কিছু ও লিটল আন্দামানে প্রচুর জন্মে। চারকোল হওয়ার মত কিছু গাছ নর্থ আন্দামানে নজরে পড়ে।

স্বাধীনতার পরেও বনবিভাগ ছিল আন্দামান প্রশাসনের সর্বাপেক্ষা বড় সরকারী বিভাগ। অর্থ ব্যয়ের পরিমাপে, মজুর ও কর্মী নিয়োগের সংখ্যায় আর্থিক আয়ের সম্ভাবনায় এবং সম্পদের মানদণ্ডে এই বিভাগের গুরুত্ব ছিল সব চাইতে বেশী। আজও গুরুত্ব কমেনি; তবে ইদানিং পি. ডবলু. ডি. বিভাগ কর্মী সমাবেশে ও অর্থব্যয়ে বনবিভাগকে অতিক্রম করে গেছে। রোড ও বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজ সর্বত্র জোরকদমে চলছে। ১৯৪৭ সালে আন্দামান নিকোবরের যে প্রাকৃতিক রূপ ছিল আর দশ বছর পর তা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে যাবে। তারই সুরঝঙ্কার এখন সর্বত্র।

বনবিভাগের প্রশাসনিক সংগঠন কাঠামোর একটি চিত্র এখানে তুলে ধরছি।
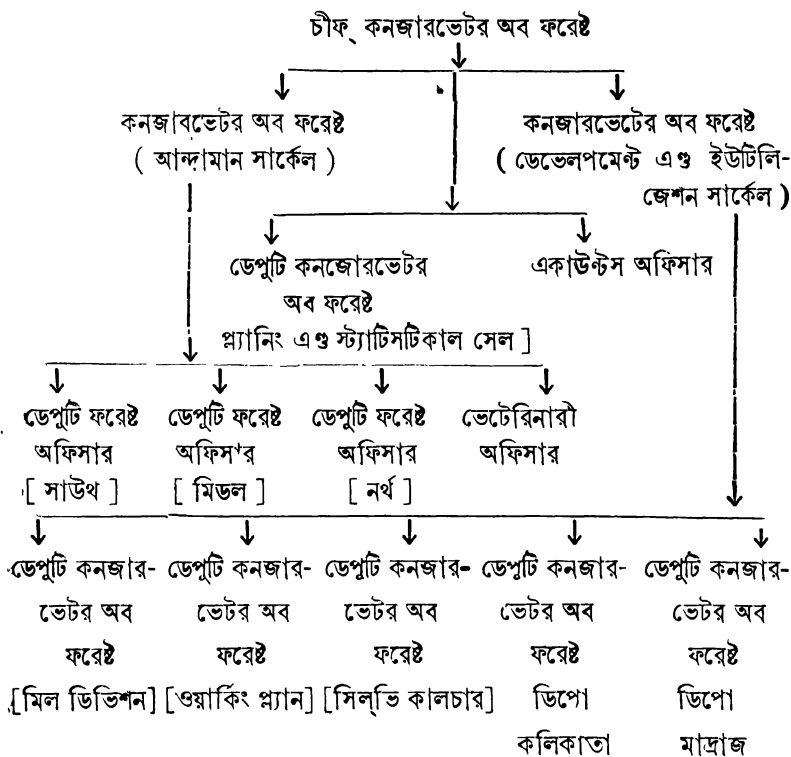
নিঃসন্দেহে বলা যায় এই দ্বীপপুঞ্জের শ্রেষ্ঠ সম্পদ অরণ্য। অধিকাংশ স্থান অরণ্যে আচ্ছাদিত। তথাপি চাষ আবাদের যে সম্ভাবনা রয়েছে তা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। আন্দামান সরকারের সবচেয়ে বেশী আয় হয় নারিকেল থেকে। বিধিবদ্ধ চাষের সূত্রপাত ইংরেজ আমলেই প্রথম দেখি এবং সেটা প্রধানত গ্রেট আন্দামানে। এই সেদিন পর্যন্ত লিটল্ আন্দামান ও নিকোবরের কয়েকটি দ্বীপে সুপরিকল্পিত কোন চাষ কাজই ছিল না। নারিকেল সুপারির চাষ যে সব দ্বীপেই ভাল বা লাভজনক হবে এ বিষয় কোন সংশয় নেই।

আন্দামানের প্রধান শস্য ধান, নিকোবরের প্রধান ফল নারিকেল। ভুট্টার চাষও হচ্ছে; উত্তর আন্দামান ও লিটল আন্দামানে আখ ও কলাই চাষ দেখেছি। ফলের মধ্যে কলা ও পেঁপে পর্যাপ্ত হচ্ছে, মোসাম্বীও ভাল ফলছে। কতকগুলি মশলা এখন মহার্ঘ হয়ে উঠেছে। দিনের দিন আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। সবচেয়ে আশার কথা আন্দামান নিকোবরের জল হাওয়া ও উত্তাপ মহার্ঘ মশলা চাষের উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। লবঙ্গ, গোলমরিচ, জায়ফল ভাল হচ্ছে। দারুচিনি, এলাচও জন্মাবে। বনস্পতির জন্য রেডওয়েল পামের সম্ভাবনাও খুব উজ্জ্বল।

বিস্মৃতির গর্ভে মুছে দিলে চলবে না যে ১৮৬২ সালে কর্ণেল টাইটলার প্রথম চাষে উদ্যোগী হন এই দ্বীপে। শস্য ও ফল উৎপাদনের আগ্রহে কয়েদী খাটিয়ে ১৪৯ একর জঙ্গল পরিষ্কার করে ফেলেন। শুধু চাষের নেশা নয় লিভটিকিটপ্রাপ্ত কয়েদীদের জীবিকার সংস্থানের প্রশ্নও প্রবল হয়ে উঠছিল। প্রথম জমি বিতরণের সূচনা তাদের মধ্যেই করেন। ভোগস্বত্বে স্বত্ববান করা হলো, মালিকানা স্বত্ব দেওয়া হলো না। সরকারী কর্মচারীর খেয়াল-খুশি ও মর্জির উপর ভোগদখল ক্রমশঃ নির্ভরশীল হয়ে উঠলো। ফলে চাষকাজে উৎসাহ বৃদ্ধি পেল না, স্তিমিত হতে লাগলো। চাষকাজে গতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে আন্দামান সরকার বিংশশতকের দ্বিতীয় দশকে বিলি করা জমিতে রায়তিস্বত্ব মেনে নেন। ১৯২৭ সালে পৃথক কৃষি বিভাগ খুলেন। কৃষি বিভাগের দ্বারোদ্ঘাটন হলেও শস্য বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য কোন প্রকল্পে হাত দেওয়া হয়নি। মাঝেমধ্যে উৎসাহী চীফ-কমিশনার ও তার সাঙ্গপাঙ্গ নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। রাবার কফি ও চা চাষের প্রথম প্রয়াস তাদের হাতেই হয়। যে সাড়ে তিন বছর জাপানের দখলে ছিল তখন চাষ কাজে জাপানী সৈন্য ঝাপিয়ে পড়েছিল, আন্দামানবাসীদেরও টেনে নামিয়ে

ছিল। তারপর পাঁচ বছর নিঝুম। ১৯৫১ সালের শেষ দিকে ভারত সরকার চাষের দিকে নজর দিতে বাধ্য হয়েছেন।

এই দ্বীপপুঞ্জের আবহাওয়া ও মাটি রাবার চাষের অনুকুল। অল্পদিনেই রাবার গাছ বেড়ে উঠে। একটানা দু' ঘণ্টার বেশী কোন গাছ থেকে রাবার রস নাকি নিতে নেই। গাছের ক্ষতি হয়। বছরে দু'শ দিন রস নেওয়া চলে। দুধের মত সাদা রস ফরমিক এসিডে মিশিয়ে তামাটে রাবার সিট তৈরী করে কলিকাতায় পাঠানো হয়। দেখেছি ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্পের সাহায্যেই রসকে সিটে পরিণত করা সম্ভব। মঙ্গলুটনে একশ' একরের এক রাবার ফার্ম দেখেছি। মালিক কলিকাতার এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক।

দক্ষিণ আন্দামানের লম্বা ধাঁচের কয়েকটি উপত্যকার উভয় পার্শ্বে ছোট ছোট পাহাড়ের গায়ে চা ও কফি জন্মানোর চেষ্টা হয়েছে। চা ও কফি চাষের জন্য প্রথম দরকার প্রচুর বৃষ্টিপাত; গড়ে ৬০° হতে ৮০° ফারেণহিট তাপ; ২৫০০´ হতে ৫০০০´ ফিট পাহাড়ী উচ্চতা। উচ্চতা ছাড়া অন্য সবদিকেই কফি চাষের অনুকূল ভূমি আন্দামান।

চাষের সঙ্গে গো-মহিষের সম্পর্ক নিবিড়। এই দ্বীপপুঞ্জে গোচর ভূমির অভাব নেই। কিন্তু প্রয়োজন অনুপাতে গো-মহিষ অনেক কম। এই জলবায়ুতে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এমন উন্নত জাতের গো-মহিষের প্রজনন ও সরবরাহ করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক বলে মনে হয়েছে। পশুপালন ও পশু চিকিৎসা বিভাগের সম্প্রসারণের দিকে ভারত সরকার ততটা মনোযোগ দেননি।

॥ সাত ॥

১৯৩৯-৪৫ সাল। পুরো ছয় বছর বিশ্বজুড়ে স্থলে জলে অন্তরীক্ষে যুদ্ধ। পৃথিবী তোলপাড়। প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

নাম করা শত্রু ঘাঁটি পার্লহারবার গেল। সিঙ্গাপুর বৃটিশ সিংহের হাতছাড়া হলো। পার্লহারবার, সিঙ্গাপুর, সায়গন, ব্যাঙ্কক, রেঙ্গুন জাপানের অধিকারে এসে গেছে। চীন আক্রমণের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। প্রশান্ত মহাসাগরে এখন জাপান একচ্ছত্র অধিপতি। ভারত মহাসাগরের মুখ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। ভারত মহাসাগরে খবরদারি করার পক্ষে আন্দামান নিকোবর চমৎকার ঘাটি। প্রশান্ত মহাসাগর আর ভারত মহাসাগর কব্জার মধ্যে রাখতে পারলে জাপান হবে অপরাজেয়। স্বপ্ন তখন আকাশ ছোঁয়া।

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে বৃটিশ ও মিত্রশক্তির সৈন্যগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটির পর একটি জায়গা পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। এইচ. এম. এস. নরুলা জাহাজে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে রাতের আধারে গোর্খা সৈন্য অপসারিত করা হলো ফেলে গেল শস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া, এমন কি ব্যক্তিগত জিনিসপত্র। বিশিষ্ট কিছু ইংরেজ ও ভারতবাসী পার্সোনাল জিনিস মাত্র সঙ্গে নিয়ে এই জাহাজেই সরে পড়লেন। শোলবে থেকে এম. ভি. কিস্‌মেট নামে ছোট একখানি বোটে পাঁচজন উচ্চপদস্থ অভারতীয় কর্মচারী জীবন বিপন্ন করে পালিয়ে গেলেন। চীফ্ ফরেষ্ট অফিসার এফ্. এল. পি. ফোস্টার, হারবার মাষ্টার কম্যাণ্ডার ওয়াটারস্, ডেপুটি কমিশনার মিঃ রেডিস, পুলিশ সুপারিনটেন্‌ডেন্ট মিঃ ডি. এম. ম্যাকার্থী, জেলার মিঃ এইচ. এম. ইয়ং (বড়)—এই পাঁচজনকে নিয়ে আশরফ্ সারেঙ্গ ও সেবারাম ড্রাইভার বোটটি চালিয়ে নিয়ে যায়। জাপানীদের অনুসন্ধানী চোখ এড়িয়ে দারুণ ঝকৃকি মাথায় নিয়ে তাঁরা শেষ পর্যন্ত বিশাখা-পত্তনের কাছে গিয়ে উঠেন। জাপানীদের হাতে কিছুতেই বন্দী হতে চাননি। চীফ্-কমিশনার প্রমাদ গুণলেন। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের পোর্ট ব্লেয়ার পরিত্যাগ করার ফলে প্রশাসনিক গোলযোগ প্রবল হয়ে উঠলো। যাঁরা রয়ে গেলেন তাদের মধ্যে থেকে উপযুক্ত ব্যক্তি ও লোকালবর্ণদের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হলো।

প্রশাসনের নিয়ম ও নীতি বিষয়ে অজ্ঞ, পূর্ব অভিজ্ঞতাহীন ও আনট্রেণ্ড সব অফিসার প্রশাসনের হাল ধরলেন। স্বর্গীত দুর্গাপ্রসাদ ছিলেন বনবিভাগের একজন অতি সাধারণ অফিসার; তাঁকে করা হলো চীফ্ ফরেষ্ট অফিসার। স্বর্গত নারায়ণ রাও ছিলেন পুলিশের একজন সাব-ইনস্পেক্টর; তিনি হলেন পুলিশ সুপার। স্বর্গত সুরিন্দর নাথ নাগ ছিলেন সাধারণ মেডিকেল অফিসার; সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার পদে তিনি উন্নীত হলেন। এঁদের কারো ৩০ বছরের উর্ধ্বে বয়স ছিল না। অনেক নিম্নপদস্থ কর্মচারীর আকস্মিকভাবে পদোন্নতি ঘটে গেল।

রেঙ্গুনের পতনের পর জাপানী প্লেন পোর্ট ব্লেয়ারের উপর হামেশা আনাগোনা সুরু করে দিল। ১৯৪২ সালের ২৩শে মার্চ বেলা তিনটা। হঠাৎ বিরাট ধূম্রজাল ও আগুনের লেলিহান শিখায় পোর্ট ব্লেয়ারের সকল মানুষ সেদিন শঙ্কিত। পেট্রোলের টিন খুলে মজুত পেট্রোলে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। চারদিকে থমথমে ভাব। সূর্যাস্তের আগেই সৈন্য ভর্তি কয়েকখানি জাপানী জাহাজ এসে পোর্ট ব্লেয়ারের গাঘেঁষে নোঙ্গর ফেললো। প্রতিরোধ করার মত কোন প্রস্তুতি ছিল না, কোন সামর্থও ছিল না। যৎসামান্য যে সৈন্য ছিল তা আগেই সরিয়ে নেওয়া নেওয়া হয়। মনোবল সবারই ভেঙ্গে পড়েছিল। জাপানী নৌবহর এসে ভিড়ার সংবাদ দাবানলের মত সহরে ছড়িয়ে গেল। সকলেই আতঙ্কগ্রস্ত। সরকারী কর্মচারীরা রুদ্ধশ্বাসে রাত কাটালেন। রাতের অন্ধকার কাটেনি, ২৪শে মার্চ খুব ভোরে জাপানী সৈন্য পোর্ট ব্লেয়ারের বিভিন্ন অংশে নামা সুরু করে দিল। চীফ্ কমিশনার মিঃ ওয়াটার ফলস শ্বেত পতাকা উড়িয়ে জেটিতে এসে হাজির হলেন। আত্মসমর্পণ করে জাপ-মিলিটারীর হাতে বন্দী হলেন। দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র মিলিটারী ও সিভিল পুলিশ বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করলো। একটি জাপানী সৈন্যও প্রাণ হারায় নি, কোন রক্তপাতও হয়নি।

সেদিন জাপ-উপপতির গলায় আন্দামান মালা পরিয়ে বরণ করে নিল নীরবে নিঃশব্দে। কোন গুলি ছুড়তে হয়নি, একটি বোমাও জাপান ফেলেনি। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে সমস্ত সরকারী ভবন থেকে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে ফেলা হলো। জাপানী পতাকা উড়লো। সহরে যে ক'জন ইংরেজ ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছিলেন তাদের গ্রেপ্তার করে রসদ্বীপে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখা হলো। সব বন্দুক ও গাড়ী সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত হলো। স্থানীয় লোকের সমর্থন চেয়ে প্রচারপত্র বিলি হতে লাগলো। এবারডিন বাজারের ক্লক টাওয়ারের নীচে একদল জাপ সৈন্য দাঁড়িয়ে চিৎকার স্থরু করে দিল—"ইণ্ডিয়া-জাপান থোমডাচি" "ইণ্ডিয়া-জাপান সামা সামা" অর্থাৎ ভারত ও জাপান বন্ধু এবং ভারত ও জাপান সমান সমান। ঐদিনই সব কয়েদী ব্যারাকে গিয়ে জাপানী সৈন্যরা বন্দীদের ছেড়ে দিল। গুণ্ডা, জবরদস্ত ডাকাত ও খুনী বন্দীর কাছে এই দিনটি ছিল মহা উল্লাসের। এরাই ইংরেজ ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অফিসারদের কোয়ার্টার চিনিয়ে দিয়েছে।

জাপ-সৈন্য অবতরণের দিনই এক দুঃখজনক ঘটনায় সহরে দারুণ ত্রাসের স্থষ্টি হয়। এবারডিন বস্তির বিশিষ্ট ব্যক্তি আকবর আলি। তাঁর কয়েকটি মুরগী জাপ-সৈন্য ধরে নেয়। বড় ছেলে আফ্‌তাব আলি বন্দুক উঁচিয়ে ক্রোধ প্রকাশ করে। জাপ-সৈন্য তৎক্ষণাৎ রিভলবার খাড়া করে তাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। ছোট ভাই জুলফিকর আলি (সন্নী) দুইজন জাপ-সৈন্যকে পিছন থেকে গুলি করে পালিয়ে যায়। ফল হলো মারাত্মক। আকবর আলির বাড়ি ঘেরাও করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো। আগুন নিভাতে কাউকে কাছে আসতে দেওয়া হলো না। পর দিন জুলফিকরকে জাপকর্তৃপক্ষের সম্মুখে হাজির করা হয়। বিকালে বহুলোকের উপস্থিতিতে তাকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হলো।

আর একটি ঘটনাও সমভাবে মর্মান্তিক। অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছিলেন ট্রেজারি অফিসার। জাপ-সৈন্য অবতরণের কিছু পরেই জনকয়েক দুর্বৃত্ত আপিসে ঢুকে ট্রেজারির চাবি জোর করে হস্তগত করে এবং প্রায় পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে সরে পড়ে। বিচলিত অতুলবাবু এবারডিন বাজারের দিকে ছুটতে থাকেন। দুর্বৃত্তরা ওত পেতে ছিল। দা-এর আঘাতে হত্যা করে রটনা করে দেয় জাপ-সৈন্যের গুলিতে অতুলবাবু নিহত হয়েছেন। পোর্ট ব্লেয়ারের বাঙ্গালী ক্লাবকে অতুলবাবুর নামে উৎসর্গ করে তাঁর স্মৃতি জাগরূক রাখার ব্যবস্থা পরবর্তী কালে করা হয়েছে।

এদিকে পোর্ট ব্লেয়ারের নাগরিকদের মন জয় করার জন্য জাপ-মিলিটারী কর্তৃপক্ষ প্রচার আরম্ভ করলেন—এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য। ইঙ্গ-আমেরিকার মাতব্বরি এ-চত্তরে চলবে না। পিস্-কমিটি (peace committee) গঠিত হলো। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সংগঠন ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লীগের শাখা স্থাপিত হয়ে গেল। প্রচার চললো—নেতাজীর আদেশেই জাপানীরা আন্দামানে এসেছে। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ক্রমশঃ খাতির জমে উঠতে লাগলো। প্রচণ্ড বাধা শুধু ভাষার। মাসছয়েক মন্দ কাটেনি—এ যেন পরিণয়ের পর হানিমুন! তারপর বাতাস বদলালো, ঝড় উঠলো। অমিয় সাগরে সবই গরল হয়ে গেল! আজও জাপানী নির্যাতনের কথা কেউ ভুলতে পারেনি। তাদের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা সকলকে জাপ-বিরোধী করে তুললো।

আন্দামানবাসীদের চাল ডাল তেল নুন গম চিনি গুড়, ঔষধপত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, কাগজ কালি কলমের জন্য এখনও নির্ভর করতে হয় মেনল্যাণ্ডের উপরে। জাপানীরা পোর্ট ব্লেয়ারে পা দিয়েই বুঝতে পারে এখানে প্রবল খাদ্যসংকট দেখা দিবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ যুদ্ধের সময় বাইরের যোগানের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকা আদৌ সমীচীন নয়। চাষের কাজে তাই অধিকাংশ জাপানী ঝাঁপিয়ে পড়ে। আন্দামানকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করতে হবে।

অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারে ওরা। উচ্চতম অফিসার হ'তে নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই হাত লাগালেন চাষে। কঠোর পরিশ্রম করতো প্রত্যেকে, স্থানীয় লোকদেরও দারুণ খাটিয়ে নিত। এতদিন চাষ-আবাদ এখানে সেখানে যতটুকু যা হয়েছে তার ধারা ছিল গতানুগতিক। পতিত জমি বনবাদাড়ে ভর্তি ছিল। আরামবিরামে দিন কাটতো। জীবন ছিল অলস। যে যতটুকু পেরেছে নিজ চেষ্টায় বাগবাগিচা করেছে। হাঁসমুরগী ও গরু পুষেছে। অলসতা জাপানীরা সইতে পারে না। কাজেই কারো রেহাই ছিল না, সকলকে চাষে নামতে হয়েছিল। দুই পাহাড়ের মাঝখানের উপত্যকায় সমতল জমিতে প্রবল উদ্যমে ধানচাষ স্থুরু হয়ে গেল। যুদ্ধ কালীন দ্রুততায় বনজঙ্গল সাফ হতে লাগলো। পাহাড়ের গায়ে ঢালু অংশে মিষ্টি আলু ও টেপিওকা লাগানো আরম্ভ হলো। ছোট সহর পোর্ট ব্লেয়ার। সহরের সামান্য গণ্ডির বাইরে কোন পাকা রাস্তা ছিল না। জাপান এসেই রাস্তায় হাত দিল। ২০।২২ মাইল পাকা রাস্তা সামান্য কয়েক দিনে করে ফেললো। কয়েক বছর ধরে যুদ্ধ চলছে; সিভিল ডিফেন্সের কোন প্রস্তুতি ছিল না। প্রতি রক্ষার প্ল্যান তো ছিলই না। প্রতিরক্ষার অনেকগুলি ব্যবস্থা জাপান এসে করে। পাহাড়ের মাথায় এ্যান্টি-এয়ার ক্রাক্ট বসালো। সমুদ্রতীরে বিভিন্ন জায়গায় দূর পাল্লার বন্দুক বসালো। তীর বরাবর সাউথ আন্দামানের চারদিকে তারের বেড়া খাড়া করে দেওয়া হলো। শত্রু জাহাজের আনাগোনা পর্যবেক্ষণের জন্য সমুদ্রের পাড়ে শান্ত্রীঘাটি তৈরী হলো। মাটির নীচে অনেক ট্রেঞ্চ খোড়া হলো, ব্যাফলওয়াল ও পিল-বক্স দাঁড় করিয়ে দিল। সৈন্যদের নিরাপদে চলাফেলার সুবিধার জন্য টানেল কাটা হলো। এখানে কি কি শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে তার অনুসন্ধানের কাজে একদল লেগে গেল। টুথপেষ্ট ও পাউডার তৈরীর 'নানতাই' সংস্থা, সেলাই কাজের 'স্কে-তাই' সংস্থা মিষ্টি তৈরীর 'মঞ্জু' সংস্থা গড়ে তুললো। বেশ কিছু মেয়ে কাজ

পেল। সকলের জন্য কেবল বিরামবিহীন কাজ আর কাজ। এশিয়ার মধ্যে অদ্ভুত কর্মপটু জাত জাপান! ডিসিপ্লিন ও পরিশ্রমে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিদের মধ্যে জাপান অন্যতম।

চেষ্টা চললো বিস্তর। নিষ্ঠায় ত্রুটি ছিল না একটুও। ফল কিন্তু পাওয়া গেল যৎসামান্য। ছাড়াছাড়া দ্বীপ; কোনটায় লোকই নেই, আর কোনটায় বাস করে জনকতক মানুষ। দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে যাবার কোন ভাল ব্যবস্থা নেই। নিয়মিত ফেরী-সার্ভিস করা বর্তমান অবস্থায় সুকঠিন। তাছাড়া পর্যাপ্ত লাঙ্গল বলদ নেই, চাষের যন্ত্রপাতি নেই। কিষাণমজুর নেই। খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া সোজা ব্যাপার ছিল না। এদিকে বিশ হাজার সৈন্য নামিয়েছিল জাপান। স্থানীয় লোকের বাসও ছিল কয়েক হাজার। খাদ্যের জন্য নিয়মিত বহিরাগত সরবরাহের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। দক্ষিণ আন্দামান কতটুকু জায়গা! অক্লান্ত পরিশ্রম করেও এত লোকের নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য এখানে উৎপন্ন করা অসম্ভব ছিল।

এদিকে খাদ্য ভর্তি জাপানী জাহাজ দীর্ঘ পথ নিরাপদে অতিক্রম করে পোর্ট ব্লেয়ারের কাছেভিতে আসামাত্র বৃটিশ সাবমেরিন টরপেডোর আঘাতে ডুবে যেতে লাগলো। জাপ-কর্তৃপক্ষের মনে গভীর সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো। সুপরিকল্পিত স্পাইং চলছে— এ-বিষয়ে কোন সংশয় রইল না। মিত্রশক্তির প্লেন মাঝেমাঝে খাদ্যভর্তি জাহাজে বোমা মেরে পালিয়ে যেত। প্রতি শনিবারেই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্লেন থেকে বোমা ফেলার চেষ্টা চলতে লাগলো। আন্দামানের ভিতরের সব সংবাদ বৃটিশ কমাণ্ডের গোচরে নিয়মিত চলে যাচ্ছে। জাপকর্তৃপক্ষের মনে কোন দ্বিধা রইল না যে কিছু লোক গুপ্তচরের কাজে নিযুক্ত রয়েছে। ইংলিশম্যান ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যে ক'জন পোর্ট ব্লেয়ারে ছিল সকলেই আটক আছে; তথাপি শত্রুপক্ষ খুঁটিনাটি খবর সব পাচ্ছে কি করে! নিশ্চয়ই

স্থানীয় লোকদের মধ্যে ইংরেজী জানা কেউ-না-কেউ এই দুষ্কর্মে রত আছে। এবার ইংরেজী জানা সকলকেই গ্রেপ্তার করে ফেলা হলো। ভিতরের খবর তবুও বাইরে চলে যায়। জাপকর্তৃপক্ষ প্রমাদ গুণলেন। দৃঢ় প্রতিরক্ষা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সত্বেও বৃটিশ-স্পাইংয়ের কোন হদিস করতে পারেননি। সন্দেহবশে বহু নির্দোষ ব্যক্তিকে ধরে নির্যাতন করা হয়েছে। অমূলক রিপোর্টের উপরে ভিত্তি করে বেশ কিছু লোককে হত্যা করা হয়েছে।

গুপ্তচর ধরে দিবার সক্রিয় সহযোগীর ভূমিকা যারা নিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন বাঙ্গালীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পুষ্করচন্দ্র বাগচী, ওরফে পি. সি. বাগচী নামে দক্ষিণ আন্দামানে পরিচিত। ধনীঘরের শিক্ষিত যুবক। কলিকাতার বাসিন্দা। খুনী কেসের সাজা নিয়ে দ্বিতীয় যুদ্ধের বছর কয়েক আগে পোর্ট ব্লেয়ারে আসেন। কিছু দিনের মধ্যেই স্থানীয় এক ধনী মহিলাকে বিবাহ করে বসেন। একজন অতি ধুরন্ধর লোক। জাপ-সৈন্য পোর্ট ব্লেয়ারে নামার পর পরই তিনি মিলিটারী কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেকে নেতাজীর ভাগিনেয় বলে পরিচয় দিয়ে বিশ্বাসী হয়ে উঠেন এবং রাজনৈতিক বন্দী বলে জানানোর ফলে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন। স্থানীয় লোকালবর্ণ মহলে তার যাতায়াত ছিল। জাপ-মিলিটারী কর্তৃপক্ষ পি. সি. বাগচীকে চীফ্ নাভাল ইনটেলিজেন্স অফিসাররূপে নিয়োগ করেন। জাপানীদের অমানুষিকতা ও বহু দুষ্কর্মের পশ্চাতে মিঃ বাগচীর মিথ্যা রিপোর্ট, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও উচ্চাকাঙ্খা কাজ করেছে।

মেজর এ. জি. বার্ড সাপ্লাই অফিসার ছিলেন। বাগচীর রিপোর্টে গুপ্তচর বলে গ্রেপ্তার হন। রামস্বরূপ ছিলেন তাঁর স্টোরকিপার। বার্ডের গোপন সংবাদ সরবরাহকারী সন্দেহে তাঁকে ধরা হলো। তাঁর ভাই ও ভগ্নীপতিকেও রেহাই দেওয়া হয়নি। সকলকেই গ্রেপ্তার করা হয়। ১৮০০ টাকা ফাইন দিয়ে তাঁরা

মুক্তি পান। কিন্তু মিঃ বার্ডকে হাতকড়া লাগিয়ে স্পাই আখ্যা দিয়ে গোটা বাজার ঘোরানো হয়। এতেই শেষ নয়, স্কুলের ক্লাস ছুটি দিয়ে সব ছাত্রদের সমবেত করে সকলের সামনে প্রকাশ্যে গুলির আঘাতে হত্যা করা হয়। ছোট বড় সকলকে দেখিয়ে দেওয়া হলো গুপ্তচর বৃত্তির পরিণাম কি। এক মধ্যরাত্রে জাপ-মিলিটারী পুলিশ বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সহরের প্রভাবশালী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গৃহে হানা দিয়ে ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। জেলখানায় সাতদিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ চলে। সাতজনকে রেখে বাকী ৩৩ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সাতজন—ডেপুটি কমিশনার গোপালকৃষ্ণ, পুলিশস্থপার নারায়ণ রাও, মেডিকাল অফিসার ডাক্তার স্থরিন্দরনাথ নাগ, সহকারী পুলিশস্থপার আত্তার সিং, একজন বিশিষ্ট নাগরিক আব্দুল খালিক, জমাদার ছোট্টে সিং এবং স্থবেদার স্থবাখান (এঁরা উভয়ে আন্দামান নিকোবর মিলিটারী পুলিশে কাজ করতেন। এই সাতজনকেই গুলি করে হত্যা করা হয়। গুপ্তচরের কাজ কেউ তাঁরা করেন নি বলে পরে জানা যায়। ডাঃ দিউয়ান সিং ছিলেন সিনিয়র মেডিকেল অফিসার, 'পীস কমিটির' সক্রিয় সদস্য, ইণ্ডিয়ান ইনডিপেণ্ডেন্স লীগের সভাপতি। নিছক সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করে তাঁকে জেলে ঢুকানো হয়। দিনের পর দিন অমানুষিক অত্যাচার চলে তাঁর উপরে। দাড়ি এক এক করে উপড়ে ফেলা হয়, দাঁত ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেওয়া হয়, দেহের তিন-চতুর্থাংশ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। নেতাজী যখন জেল পরিদর্শনে আসেন তখন তাঁকে জেলের মধ্যেই সরিয়ে রাখা হয়। ১৯৪৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী তাঁর জীবন দীপ নিভে যায়। পোর্ট ব্লেয়ারের 'কনভিক্ট গুরু-দোয়ারা'র নামকরণ পরবর্তীকালে করা হয় "ডাঃ দিউয়ান সিং গুরুদোয়ারা"। এবারডিনের এই গুরুদোয়ারা শিখ বন্দী ও ব্যবসায়ীদের চেষ্টায় গড়ে উঠে। বৃটিশের শাসন সময়ে শিখ পুলিশ যে গুরুদোয়ারা স্থাপন করে তাতে কনভিক্টদের প্রবেশ অধিকার

ছিল না ; শিখ পুলিশ ও আর্মি নেভির লোক কেবল সেখানে যেতে পারতো। এই কারণেই 'কনভিক্‌ট গুরুদোয়ারা' গড়ে উঠে। পোর্ট ব্লেয়ারের প্রায় সকল শিখ ও পাঞ্জাবীকে স্পাইংকেসে জড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। ১৯৪৪ সাল, যুদ্ধ তখনও জার্মান জাপানের অনুকূলে। নেতাজী পরিদর্শন করে চলে যাবার মাসখানেকের মধ্যে জানুয়ারী মাসের শেষ নাগাদ আনুমানিক ৪০।৫০ জন তথাকথিত স্পাইবন্দীকে জেল থেকে বের করে ট্রাকে তুলে নিয়ে হাম্পফ্রেগঞ্জ ও শোলেদারী যাবার রাস্তার সংযোগস্থলে পাহাড়ের মাথায় গুলি করে ট্রেঞ্চের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দেওয়া হয়। সেলুলার জেলের মধ্যে তিনজন মৎস কনট্রাক্‌টারকে গুপ্তচর সন্দেহে ফাঁসী দেওয়া হয়। এইসব দুষ্কর্ম চাপা থাকেনি। দক্ষিণ আন্দামান ও কারনিকোবরের সমস্ত অধিবাসী জাপ-বিরোধী হয়ে উঠে।

অমানুষিক এত কাণ্ড ঘটবার পর জাপ কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারেন যে পি. সি. বাগচি ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গর রিপোর্ট মিথ্যা ও তথ্য জাল। তৎক্ষণাৎ তাকে পদচ্যুত করে অবশ্য জেলে পোরা হয়। আন্দামান-বাসীর ক্ষোভ এতে প্রশমিত হয়নি। জাপ-সৈনিকদের দুর্ভাগ্য যারা গভীর অরণ্যে বেতার-যন্ত্র ফিট করে লুকিয়ে বসে থাকতো, চর পাঠিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে আনতো তারা বরাবর চোখে ধূলো দিয়ে রেহাই পেয়ে যায় ; আর তাদের বদলে মার খায় নির্দোষ ব্যক্তি।

বৃটিশ সরকার কয়েকজন বিশ্বস্ত সহকর্মীসহ যুদ্ধ পূর্বকালের ঝানু পুলিশ সুপার মিঃ ম্যাকার্থীকে গুপ্তচরের কর্মভার দিয়ে পুনরায় আন্দামানে পাঠান। অরণ্য অঞ্চলের নাড়ি-নক্ষত্র তাঁর জানা। তোসানাবাদের গভীর অরণ্যে আস্তানা পেতে তিনি বেতার যন্ত্রে নিয়মিত জাপানীদের কার্যকলাপের সংবাদ পাঠাতেন। তাঁর চর সারাদিন ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করতো এবং নিয়মিত পৌঁছে দিত। পোর্ট ব্লেয়ারে বসেই জাপ-সৈন্য এইসব সংবাদ রেডিওতে ধরতো আর রেগে আগুণ হয়ে উঠতো। পরবর্তী সময়ে দেখা যায়

বিশ্বস্ত কর্মী ও উচ্চপদস্থ ফরেষ্ট অফিসারদের শোলবের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পাঠাবার দুঃসাহস দেখিয়েছে ইংরেজ। জাপ-সৈন্য সন্দেহজনক পদচিহ্নের হদিস পেয়েছে, জলের বোতল পড়ে থাকতে দেখেছে, অজ্ঞাত রাবার বোট নজরে এসেছে। কিন্তু সঠিক ব্যক্তিদের কখনই ধরতে পারেনি। নীলদ্বীপ পর্যন্ত জাপানীরা খোঁজ খবর নিতে লোক লাগিয়েছে; জানা গেছে কাছাকাছি বৃটিশ সাবমেরিণ ঘোরাঘুরি করে। অথচ মূল ঘাটির সন্ধান বহু চেষ্টা সত্বেও কোন সময়ই পায়নি।

এই রকম থমথমে পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৪৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর নেতাজী সুভাষচন্দ্র আন্দামানে আসেন। স্থানীয় অধিবাসীদের হতাশ মনে পুনরায় ভরসা ফিরে আসে। দ্বীপপুঞ্জ দখলের প্রায় ২১ মাস পরে তাঁর পরিদর্শন ঘটে। পোর্ট ব্লেয়ারে আগে কোন এয়ার পোর্ট ছিল না। জাপানীরাই প্রথম ছোট্ট একটি পাকা এয়ার পোর্ট নির্মাণ করে। স্বাধীনতার পর সেটাকে ক্রমশঃ বড় করা হচ্ছে। প্যাসেঞ্জার বিমান সপ্তাহে দু'দিন নিয়মিত নামছে। ডাক আসছে বিমানে। একখানি চার্টার্ড প্লেনে নেতাজী এখানে এসে নামেন। সহরের বহুলোক সে সময় বিমান-বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। জাপ-সিভিল গভর্ণর মিন্-সি-বুচো নেতাজীকে বিমান-বন্দরে স্বাগত জানান। কিন্তু তাঁকে পোর্ট ব্লেয়ার সহরে না রেখে রসদ্বীপের গভর্ণমেন্ট হাউসে নিয়ে তুলেন। সরকারী অভ্যর্থনার বিধি ব্যবস্থাপনায় কোন ক্রুটি ছিল না। স্থানীয় লোকদের সংযোগ থেকে তাকে সতর্কতার সঙ্গে কেবল দূরে সরিয়ে রাখা হয়। নিজেদের দুঃখের কথা, জাপানীদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনী, খাদ্যের প্রচণ্ড অভাব কিছুই নেতাজীর গোচরে আনা সম্ভব হয়নি। তাঁর পরিদর্শনকালে সেলুলার জেলের বন্দীদের সরিয়ে রাখা হয়। 'নেতাজী হলে' India Independence League এর সম্বর্ধনা সভাতেও জাপ-ব্যূহ খুব তৎপর ছিল যাতে জাপানীদের অমানুষিক কার্যকলাপের

কথা তাঁর কানে না যায়। আন্দামানে তিনি তিন দিন ছিলেন। ছিলেন। শেষদিন জিমখানা মাঠে জনতার সামনে হিন্দীতে ভাষণ দেন। আন্দামান নিকোবরের নতুন নামকরণ ঘোষণা করেন— 'শহীদ দ্বীপ' ও 'স্বরাজ দ্বীপ'। তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার রামাকৃষ্ণ নেতাজীর হাতে টাকার তোড়া সমর্পণ করেন। তিনদিন পরে নেতাজী ফিরে যান। সম্ভবতঃ আন্দামানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তিনি কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সিঙ্গাপুর পৌঁছেই কয়েকদিনের মধ্যে কর্ণেল লোকনাথনকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়ে দেন। চীফ্-কমিশনার রূপে তিনি অসামরিক প্রশাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ক্যাপটেন আলভি, লেফ্‌টন্যান্ট স্নুবা সিং ও লেফ্‌টন্যান্ট শ্রীনিবাসন কর্ণেল লোকনাথনের সহকারী-রূপে আসেন। জাপ-কর্তৃপক্ষ কিন্তু তাঁর হাতে দায়িত্ব তুলে দিতে রাজী হননি। এই দ্বীপপুঞ্জের স্ট্রাটেজিক্ (Strategic) গুরুত্ব খুব বেশী। সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুন প্রতিরক্ষার ব্যাপারে এবং ভারতের মেনল্যাণ্ডে আক্রমণ চালাবার কাজে এই দ্বীপপুঞ্জের কন্ট্রোল হাতে রাখা অপরিহার্য বলে জাপ-কর্তৃপক্ষ মনে করেছেন। আজাদ-হিন্দ প্রভিসনাল গভর্ণমেন্টের হাতে আংশিক সিভিল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন আসার ফলে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটেছিল। স্পাইং কেসের বিচারের জন্য মিলিটারী বিচার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। নির্দেশ দেওয়া হলো সিঙ্গাপুর থেকে সিভিল-জজ এসে বিচার করবেন। সিভিল জজ এসেও ছিলেন। তারপর কারো আর মৃত্যুদণ্ড হয়নি। দুর্গাপ্রসাদ স্পাইং কেস এর ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে আসামীদের বিভিন্ন মেয়াদী সাজা দেওয়া হয়েছিল। পোর্ট ব্লেয়ারে কর্ণেল লোকনাথন মাসছয় ছিলেন। ক্ষমতা নিয়ে জাপ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মোটেই বনিবনা হচ্ছিল না। চরম বিরক্তি নিয়ে তিনি শেষপর্যন্ত সিঙ্গাপুর ফিরে যান।

বঙ্গোপসাগরের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি দখলে রাখতে গিয়ে জাপান

নাজেহাল হয়ে পড়েছিল। চোখের সামনে খাদ্যভর্তি জাহাজডুবি বন্ধ করতে পারেনি। একদিকে নিয়মিত স্পায়িং এবং স্থানীয় লোকের ঘোর অনাস্থা ও বিরক্তি; আর একদিকে দিনের পর দিন নিদারুণ খাদ্যাভাব। শেষের দিকে জাপানীরা প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। যেখানে খাদ্যসামগ্রা যা মিলতো তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করা হতে লাগলো। সৈন্যরা বাড়িতে হানা দিয়ে হাঁস, মুরগী, ফলমূল নিয়ে যেতে লাগলো। কোনরূপ প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না। দিনের পর দিন জাপানী-সৈন্যগণ মিষ্টি আলু ও টেপিওকা খেয়ে কাটিয়েছে। 'টার' গাছের কাণ্ড সিদ্ধ করে খেতে বাধ্য হয়েছে। অখাদ্য কুখাদ্য পেটে গেছে। তারা-দিশেহারা হয়ে উঠেছিল। বৃটিশ আর্মির কিছু বন্দী সৈন্য, ইন্দোনেশিয়ান ভলাণ্টিয়ার ও চীনা তরুণদের পোর্টব্লেয়ারে এনে আটক করে রেখেছিল। দেখা গেল অধিকাংশই ছোঁয়াচে চর্মরোগে আক্রান্ত। ঔষধ ও চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। বস্ত্রাভাবও চরমে ওঠে। জাপানী মিলিটারী শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। /

অপ্রত্যাশিত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়ে রেশন দিতে না পেরে জাপানী প্রশাসক প্রায় তিনশত বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিকে ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসের প্রথমে ভাইপার ও হ্যাভলক দ্বীপে নিয়ে গিয়ে অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিয়ে আসে। আটক করা প্রায় দুই শত লোককে পরের দিকে তেতলির ঘাটে রেখে আসে। জাপানী প্রশাসকের এই নির্মমতায় জীবন দিয়ে রেণুমল নামে এক ব্যবসায়ী অমর হয়ে আছেন। বর্মীদের লুট-তরাজ ও হত্যাকাণ্ডের আশংকায় রেণুমল সপরিবারে পোর্টব্লেয়ার চলে আসেন জাপানী দখলের প্রাক্ মুহূর্তে। মায়াবন্দরে গিয়ে নতুন করে ব্যবসা স্থরু করেন। স্পাই সন্দেহে জাপ কর্তৃপক্ষ অল্পদিন মধ্যেই গ্রেপ্তার ক'রে তাঁকে হত্যা করে। শ্রীমতী রেণুমল ছিলেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী। অক্ষম ব্যক্তির তালিকাভুক্ত করে তাঁকেও হ্যাভলক দ্বীপে নির্বাসিত করে। স্বামীস্ত্রী উভয়ের জীবনান্তই বড় করুণ। জাপানের আত্মসমর্পণের পর সেখানে জীবিত

অবস্থায় একজনকেও পাওয়া যায়নি। পোর্টব্লেয়ারের আকাশে-বাতাসে তখন হাহাকার। জীবনের নিরাপত্তা বলে কিছু আর ছিল না। এই সময়ে যুদ্ধের চাকা আকস্মিকভাবে ঘুরে যায়। হিরোসিমা ও নাগাশাকিতে এ্যাটম বোমের অচিন্ত্যনীয় ধ্বংসলীলার কাহিনী কানে আসে। ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগষ্ট যুদ্ধ বন্ধ করে জাপান আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক রূপান্তরের অরুণ আলো দেখা দেয়। ৯ই অক্টোবর সমুদ্রের কিনারে জিমখানা গ্রাউণ্ডে ব্রিগেডিয়ার সলোমনের কাছে জাপ-গভর্ণর আত্মসমর্পণ করেন। এই দ্বীপপুঞ্জের দায়িত্ব ইংরেজ পুনরায় স্বহস্তে গ্রহণ করে। ইংরেজের দখল এল, কিন্তু অধিকার আর পোক্ত হলো না।

শুধু মানুষ কেন জীবমাত্রেরই দুটি ক্ষুধা অত্যুগ্র—উদর-ক্ষুধা আর যৌন-ক্ষুধা। উভয় ক্ষুধার তাড়নায় সাময়িকভাবে মানুষ দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে, ক্রোধান্ধ হয়, বিচার-বিবেচনা হারিয়ে ফেলে, সংযমের রশি ছিঁড়ে ফেলে, উত্তেজনায় উন্মাদ হয়ে উঠে। যুদ্ধের সময় বিজয়ী সৈন্যরা আরো বেপরোয়া হয়, কোনকিছু গ্রাহ্যই করতে চায় না। পাকিস্তানী সৈন্যরা অধুনা বাংলাদেশের উপর উভয় ক্ষুধারই রাশ খুলে দিয়েছিল। বাঙ্গালীর ক্রুদ্ধ ক্ষোভের সঙ্গে নারী-পুরুষের অপরিসীম ঘৃণার বোঝা মাথায় নিয়ে খান সেনাদের বিদায় নিতে হয়েছে। ভিয়েতনামে মার্কিন সেনাদের নারীর মর্যাদা হননের অনেক কাহিনী আমাদের কাছে এসেছে। নারী-পুরুষের সর্বাত্মক ঘৃণা তাদেরও সৈন্য সরিয়ে নিতে বাধ্য করেছে। আন্দামানে কিন্তু জাপানী সৈন্য যৌন-ক্ষুধা অনেকাংশে দমিত রেখেছিল। বরং ভারতীয় মিলিটারী-পুলিশ সেই সংযমের পরিচয় দিতে পারেনি। প্রত্যেক জাপানী সৈন্য বুদ্ধদেবের একটি করে মূর্তি কাছে রাখতো। নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার থেকে বিরত থাকতে তারা চেষ্টা করেছে। গুপ্তচরের সন্ধান করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তারা অবশ্য নারীদের অপমান করেছে, মারধরও করেছে, কিন্তু ধর্ষণ করেনি।

বিজয়ী সেনাদের এই সংযম এবং নারীর মর্যাদা দান জাপানীদের গৌরবের আসনে বসিয়েছে। উৎপীড়নের ও নিষ্ঠুরতার বহু কাহিনীর মধ্যে তাদের এই চারিত্রিক দৃঢ়তা অম্লান ও ভাস্বর হয়ে আছে। এটা জাপানী চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য অথবা নেতাজীর বিস্ময়কর প্রভাবের ফল তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। ভুল বুঝাবুঝির কয়েকটি বিশেষ কারণের মধ্যে ভাষার তফাৎ ও আচার-আচরণের পার্থক্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আন্দামানে জাপানী ভাষা কেউ জানতো না, আবার জাপানীরাও কোন ভারতীয় ভাষা জানতো না। নগ্নতাকে জাপানীরা আমাদের মত অতটা অশোভন বলে মনে করে না। রাস্তার ধারে কোন জলাশয়ে অথবা কলের ধারে দল বেঁধে নগ্ন হয়ে স্নান করতে জাপানী সৈন্যরা সঙ্কোচ বোধ করতো না। ভারতীয়দের কাছে ছিল এটা অত্যন্ত অশিষ্টতা। ভাষার তফাতের জন্য বোঝাবার উপায় ছিল না। আবার দুই কাঠি দিয়ে জাপানীদের আহার কৌশল আন্দামানবাসীরা কৌতূহলী চোখে চেয়ে দেখতো, হাসাহাসি করতো। জাপ-সৈন্যরা এটা মোটেই পছন্দ করতো না; বিদ্রূপ করা হচ্ছে বলে মনে করতো।

দিনের পর দিন অখাদ্য কুখাদ্য পেটে দিতে হয়েছে। উদর-ক্ষুধার ক্ষেত্রে তাই জাপসেনারা অতিরিক্ত অসংযমী হয়ে উঠেছিল, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। গুপ্তচর সন্দেহে নির্দোষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপরে নির্মম নির্যাতন করেছে। হাঁস, মুরগী, ফলমুল কেড়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। গোর্খা বাহিনীর ফেলে যাওয়া ঘোড়া শেষ পর্যন্ত এরা না-খেয়ে পারেনি। স্থানীয় লোক জাপ-মিলিটারী শাসনের কথায় এখন আতঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ। আজও মনে শিহরণ জাগায়। বর্মীজদের সঙ্গে ধর্মীয় ঐক্য বিদ্যমান থাকায় তারা অত্যাচারিত হয়নি। নির্মম নির্যাতনের মূলে জাপ-প্রশাসনকে দোষী করার চেয়ে মুষ্টিমেয় সুযোগ সন্ধানী ভারতীয়দের বেশী দোষী করতে হয়। পি. সি. বাগচীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পোর্টব্লেয়ারে এখনও তার নামার উপায় নেই। তাকে দেখতে পেলেই স্থানীয় লোক হত্যা করে ফেলতে পারে। পুঞ্জীভূত ক্ষোভ তার উপরে এত বেশী। তিনি এখন কলিকাতায় থাকেন কিনা—অথবা তার মৃত্যু হয়েছে কিনা—আমার জানা নেই।

॥ আট ॥

ভারত সরকারের ডাইরেক্ট প্রশাসনের আওতায় রাখা হয়েছে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে। বৃটিশ আমলেও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল; তবে অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারীর সংখ্যা ছিল অনেক কম। গভর্ণমেন্টের তিনটি প্রধান বিভাগের মধ্যে শাসন বিভাগ এখানে বড় ও প্রবল; বিচার বিভাগ অপেক্ষাকৃত ছোট। আইন বিভাগের সূচনা এখনও হয়নি। শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ স্বতন্ত্র করা হয়েছে।

ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন জজ একজন, একজন বিচার বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন অ্যাডিশনাল জুডিসিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। জনকয়েক বিচার বিভাগীয় অধস্তন কর্মচারী। এই নিয়ে গোটা আন্দামানের বিচার বিভাগের ঠাটবাট। মেনল্যাণ্ডের মত জমজমাট আদালত চত্তর নেই। উকিল মোক্তার অ্যাডভোকেটদের নিজস্ব চেম্বার সকাল সন্ধ্যায় সরগরম থাকে না। উকিল ও মুহুরির কলিজা কাঁপান ফি চাওয়া নেই। বটগাছের তলায় সাক্ষীসাবুদের সঙ্গে বাদী-বিবাদীর কানাকানি নজরে পড়ে না; উকিল-মোক্তারের সঙ্গে শলাপরামর্শ দৃষ্টিগোচর হয় না। বার লাইব্রেরীতে রাজনীতির উত্তপ্ত আলোচনা জমাট বাঁধে না। মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা অনেক কম। জোতভূমির স্বত্ব এবং হস্তান্তরের রীতিনীতি মেনল্যাণ্ডের মত জটিলতা সৃষ্টি করেনি! খুন রাহাজানি কালেভদ্রে ঘটে। পিয়ন পেসকার উপরি আদায়ের প্রত্যাশায় অশোভন লোলুপতা দেখায় না। মেনল্যাণ্ডের মত এখানকার ধর্মাধিকরণ এতটা অধর্মাধিকরণে রূপান্তরিত হতে এখনও পারেনি।

প্রশাসনিক কাঠামোতে এখন পর্যন্ত আইন বিভাগ নেই ; কাজেই এম. এল. এ. নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে না। পার্লামেন্টে গোটা দ্বীপপুঞ্জের একজন প্রতিনিধি আছেন। লোকসংখ্যা এখনও মেনল্যাণ্ডের তুলনায় কম ; সেটাও দ্বীপে দ্বীপে ছড়ানো ছিটানো। রাজনৈতিক দলাদলির হাওয়া নগণ্য। ভোটাভুটির উত্তেজনা নেই। জনসভায় লোক খেপান বক্তৃতা বড় একটা নজরে আসে না। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার তিনটি প্রধান স্তম্ভের একটি নেই, আর একটি অতি ছোট। এই কারণে শাসন বিভাগটি যেমন বড় তেমনি প্রবল ও সক্রিয়।

কিন্তু শাসন বিভাগের সকল শাখা সর্বত্রগামী হয়নি। সকল দ্বীপে পুলিশের শাখা প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা এখনও অনুভূত হয়নি। রাজস্ব আদায়ের সব থেকে শেষ স্তরের সরকারী কর্মচারী 'পাটোয়ারী'। তাকে যেতে হয় সকলের কাছে। সরকারের গণসংযোগের প্রধান সূত্র এরা। ছ' সাতটি গ্রামের তত্ত্বাবধানের ভার থাকে পাটোয়ারীর উপরে। দু' তিনটি পাটোয়ারী সার্কেলের মাথায় রয়েছেন 'রেভিনু ইনস্‌পেক্টর'। দু' তিনটি রেভিনু ইনস্‌পেক্টরের মাথায় একজন করে 'তহসিলদার'। কোন কোন ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে তহসিলদার ও ইনস্‌পেক্টরের মধ্যে একজন 'নায়েব তহসিলদার' নিযুক্ত আছেন। ডিগ্‌লিপুর, মায়াবন্দর, রঙ্গত ও কার নিকোবরে তহসিলদার ও ট্রেজারি অফিসার একই ব্যক্তি। মহকুমা শাসক অ্যাসিসট্যাণ্ট কমিশনার নামে পরিচিত। নর্থ ও মিডল আন্দামানে একজন এ্যাসিসট্যাণ্ট কমিশনার। নানকৌরির যিনি বি, ডি, ও তিনিই সেখানকার এ্যাসিসট্যাণ্ট কমিশনার। আন্দামান নিকোবরের অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনার কার নিকোবরের বি, ডি, ও-র কাজ করেন। সাউথ আন্দামান, রঙ্গত ও ডিগলিপুরে স্টাফসহ বি, ডি, ও থাকেন। অ্যাডিশনাল ডিপুটি ও ডিপুটি কমিশনারের উপরে বিভাগীয় অ্যাসিসট্যাণ্ট সেক্রেটারী ও সেক্রেটারী। এঁদের উপরে রয়েছেন চিফ

সেক্রেটারী। চিফ্ সেক্রেটারীর মাথার উপরে সর্বময় কর্তা চিফ্ কমিশনার—এই দ্বীপপুঞ্জের সর্বোচ্চ পদাধিকারী সরকারী কর্মচারী। চিফ্ কমিশনার পুলিশের আই, জি; জেলের আই, জি, এবং কলিকাতা হাইকোর্টের পোর্টব্লেয়ারস্থ রেজিষ্ট্রার। চিফ্-সেক্রেটারী ছাড়া ফিনান্স, জুডিসিয়াল, ডেভেলপমেন্ট, ফরেষ্ট ও পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের জন্য একজন করে বিভাগীয় সেক্রেটারী; জন আষ্টেক অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারী; ট্রেজারি অফিসার, সাপ্লাই অফিসার, সেটেলমেন্ট অফিসার ও হিন্দী অফিসার। তাছাড়া পূর্ত বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ও প্রধান সার্ভেয়ার বাদে আটজন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, নয়জন অ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, প্রচুর জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ও ওভারসিয়ার এবং তিনজন সহকারী সার্ভেয়ার। ট্রাক লরি জিপ সাজসরঞ্জাম মালপত্র জনমানুষ সবদিক থেকে বিচার করলে পি, ডবলু, ডি বিভাগ বর্তমানে সবচেয়ে বড়। বনবিভাগ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। একজন প্রধান আরক্ষক (Chief Conservator), দুইজন আরক্ষক, ছ'জন ডিপুটি ও বারজন অ্যাসিস্ট্যান্ট আরক্ষক রয়েছেন বনবিভাগের মাথার উপরে। স্বাস্থ্যবিভাগের মেডিক্যাল ডাইরেকটারের পরে বিভিন্ন সেক্শনে চল্লিশজনের মত ডাক্তার আছেন। তারপর শিক্ষা-বিভাগের একজন ডাইরেকটার। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সকলেই ক্লাস-ওয়ান গেজেটেড্ অফিসার। এরপর কৃষি বিভাগ, সিপিং বিভাগ, মেরিন বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, লেবার বিভাগ, ইলেকট্রিক বিভাগ সবমিলিয়ে আরো ৬০।৭০ জন গেজেটেড অফিসার। এ-ছাড়াও সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ৩০।৩২ জন অফিসার।

এই দ্বীপপুঞ্জের সাকুল্য লোকসংখ্যা সোয়া লক্ষের মত। প্রশাসনের কাজে কিন্তু অফিসারের ছড়াছড়ি। স্থল ও নৌবাহিনীর গেজেটেড স্টাফের কথা তো অনুল্লেখিতই রয়ে গেছে। সে সংখ্যা একেবারে নগণ্য নয়। আমাদের মাথাভারী প্রশাসন কাঠামো। অফিসারে

অফিসারে ঠাসা। ফাইলে ফাইলে পাহাড়। করণিকে করণিকে দফতর ভর্তি। কাজ যদি বা হয় এতটুকু, ফাইলে লিখা পড়ে এতবড়। টেবিলে টেবিলে ফাইল ঘুরে বেড়ায় মাসের পর মাস। কর্মসম্পাদনের তাগিদ কম, ফাইলে নোটিংএর গুরুত্ব বেশী। প্রশাসন ব্যবস্থায় সর্বত্র শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, আজ্ঞাবহতা ও কার্যকুশলতা অবনতির দিকে যাচ্ছে। নিম্নতম পর্যায়ের কেরানী থেকে উচ্চতম পর্যায়ের অফিসার পর্যন্ত একই কথা খাটে। বৃটিশের কাছ থেকে যে শাসন ব্যবস্থা আমরা হাতে পেয়েছিলাম তাতে প্রথমাবধি নাচনার চাইতে বাজনার উপর জোর দিয়ে এসেছি বেশি। এখন নাচনা বাজনা সবটাই বেসুরো হয়ে উঠেছে। সুশাসন বলে আর কিছু নেই, সবক্ষেত্রে জনসাধারণ পাচ্ছে কু-শাসন। ব্যয়বহুল মাথাভারী প্রশাসন ব্যবস্থার চাপে সাধারণ নাগরিক ধনেপ্রাণে সারা হচ্ছে। পলিটিক্স-ব্যবসায়ী দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রশাসন ব্যবস্থাকে শোচনীয় অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। আন্দামানের প্রশাসনেও ব্যতিক্রম কিছু নজরে পড়েনি। সুযোগ-সুবিধা-সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এখানে কিন্তু অফিসারগণ অনেক বেশী ভোগ করেন।

মোটা বেতনের সঙ্গে সকল কর্মচারী পান আন্দামানের স্পেশাল অ্যালাউন্স। ছবির মত কোয়ার্টার। চারদিক খোলামেলা—আকাশে আলো ও বাতাসের খেলা দিনরাত। অদূরে দিগন্তব্যাপী সাগরজল বায়ুর উত্তাপ হরণ করে নিচ্ছে। এখানে টাইপ ফোর কোয়ার্টারের অধিকারী অফিসার পাবেন একজন ফ্রি মালি; টাইপ ফাইভের অধিকারী দু'জন ফ্রি মালি; টাইপ সিক্সের অধিকারী তিনজন ফ্রি মালি। উপর মহল পর্যন্ত এইভাবে ধাপে ধাপে উঠবে। যেখানে ঝি-চাকর একেবারে দুষ্প্রাপ্য সেখানে এই ধরণের সুবিধা কম কথা নয়। মোটর কার ও স্কুটার কেনার অপূর্ব সুযোগ পান সরকারী কর্মচারী এখানে। আন্দামানের নির্দিষ্ট কোটা রয়েছে। সহজেই সুযোগ নিতে পারেন যদি অফিসার হয়ে আসেন।

স্বোপার্জিত অর্থব্যয়ের ক্ষেত্র অনেক সীমিত; সঞ্চয়ের সুযোগ তাই বেশী। আত্মীয়স্বজনের প্রতি দায়দায়িত্বের বোঝা এখানে কম। মাসে মাসে লৌকিকতার অসোয়াস্তি ও আশংকা নেই। সার্বজনীন পূজাপার্বণের বিরক্তিকর দফায় দফায় চাঁদা আদায়ের জ্বালাতন নেই। আর একদিকে জনতার চাপ নেই, হামেশা মিটিং মিছিলের হিড়িক নেই, ঘেরাও হবার আতঙ্ক নেই। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সুযোগ সন্ধানী রাজনীতির কারবার এখনও অপ্রত্যক্ষ। পাবলিক সার্ভেন্টদের পাবলিক নিয়ে এখানে তেমন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। ইংরেজ প্রশাসকগণ আদিবাসীদের জংলী নামে অভিহিত করেছিল। এখন তারা নিঃশেষ হতে চলেছে। লোকালবর্ণদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি কম, রাজনৈতিক চেতনাও কম। পুনর্বাসন প্রাপ্ত পরিবার প্রধানতঃ চাষী ও কারিগর সম্প্রদায়। সরকারের করুণাপুষ্ট সকলেই। এরা সরকারের ক্ষমতাকে ভয় করে। সরকারী কর্মচারীদের শুধু মান্য করে না, তোষণও করে। সুস্থ সবল নাগরিক জীবনের চেতনা, অধিকার ও কর্তব্যবোধ কোনটাই এখনও সুস্পষ্টরূপে বিকাশ লাভ করেনি। মেনল্যাণ্ডে নির্ঝঞ্ঝাট চাকুরির এমন মধুর পরিবেশ পাওয়া সুকঠিন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পথ, দায়দায়িত্বমুক্ত জীবন, উদ্বেগ অশান্তি বর্জিত দিন, কোলাহল হট্টগোলহীন লোকালয়, রাজনৈতিক দলের সমালোচনা ও চাপমুক্ত কর্মক্ষেত্র। আকর্ষণীয় এই কর্ম পরিবেশের সঙ্গে রয়েছে হৃদয়-ভরা সুখসম্ভোগ, মন-ভরা আয়, কাব্যভরা কোয়ার্টার, স্বপ্নেভরা বাড়ী, একান্তে পাওয়া মধুময় সংসার। তার উপর সরকারী পদ ও ক্ষমতার মান ও মর্যাদা। সিনিয়রিটির ভিত্তিতে রুটিন মাফিক প্রমোশন, যোগ্যতা ও কার্যকুশলতা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হয় না। সবদিক থেকে বিচার করলে উচ্চপদস্থ অফিসারদের পক্ষে আন্দামান স্বর্গরাজ্য। নিম্নপদস্থ কর্মচারীর পক্ষেও এখানকার চাকুরী তুলনামুলকভাবে সুখকর। বিচ্ছিন্নতাই প্রধান সমস্যা।

মানুষের আহারযোগ্য নানা ধরণের মাছ আন্দামান নিকোবর

সমুদ্রের একটি বিশেষ সম্পদ। মৎস-শিল্প গড়ে তোলার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এখানে। অথচ মৎস-বিভাগ শুধু নিষ্ক্রিয় নয়, অনেকটা ঘুমন্ত। আপিস ও সাইনবোর্ডের ঠাট আছে, ফাঁকা জমক আছে, কিন্তু উন্নয়ন-মূলক কোন কাজের টান বা আন্তরিকতা নেই। নারিকেল গাছ সর্বত্র থাকা সত্ত্বেও নারিকেল দড়ি, পাপোষ বা ডোর-ম্যাটের কোন কুটির শিল্প গড়ে তোলার ইঙ্গিত পাইনি। কোন নারিকেল তেল-শিল্প নজরে আসেনি।

ডিসেম্বর, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লী দরবারের উচ্চ পর্যায়ের অফিসার এবং পার্লামেন্টের সদস্যগণ ছুতোনাতা উপলক্ষ্য নিয়ে প্রতি বছর বেড়াতে আসেন। আন্দামান এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের উচ্চতম মহল অতিথিপরায়ণতায় ত্রুটি রাখেন না। সরকারী গৃহে রাজার হালে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। সরকারী জিপ দোর-গড়ায় হাজির রাখেন এবং কয়েকশ' লিটার পেট্রোল পুড়িয়ে তাঁদের দর্শনীয় স্থান ঘুরিয়ে দেখান। সাধারণ যাত্রীর অশেষ অসুবিধা ঘটিয়ে শিপ চাটার্ড করে তাঁদের দ্বীপে দ্বীপে বেড়িয়ে আনেন। সরকারী ব্যয়ে খেয়েদেয়ে বেড়িয়ে সৌখিন কিছু জিনিস কিনে দিল্লী ফিরে যান। সরকারী খরচে চমৎকার বিলাস ভ্রমণ! দ্বীপপুঞ্জের প্রকৃত সমস্যাগুলি কি, উন্নয়নমূলক কাজের গতি কেমন—এ-সব বিষয় কতটুকু জানতে বা বুঝতে তাঁরা আসেন সেটাই সাধারণ মানুষের বিরাট প্রশ্ন। যাঁরা আসেন তাঁরাও সিরিয়াস নন, আবার যাঁরা ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ান তাঁরা জানেন কোন দেবতা কোন ফুলে তুষ্ট।

অর্থসংকটের দরুণ সেলুলার জেল সংস্কার হচ্ছে না। ন্যাশানাল মিউজিয়মে পরিণত করতে বিলম্ব ঘটছে; অথচ বহুলক্ষ টাকা ব্যয়ে বিরাট অ্যাডমিনিসষ্ট্রেটিভ বিল্ডিং সম্প্রতি তৈরী হলো। এই সময় রাজসিক আপিসগৃহ নির্মাণের যৌক্তিকতা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। এই স্বর্গপুরীর কাহিনী বিচিত্র সুরে গাঁথা!

সাধারণের সুবিধার্থে আন্দামান নিকোবরের প্রশাসনিক কাঠামোর একটি ছক পরপৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

॥ শাসন বিভাগ ॥

- চিফ্-কমিশনার
  - চিফ্ সেক্রেটারী
    - ফিনান্স সেক্রেটারী
      - অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারী
    - জুডিসিয়াল সেক্রেটারী
      - অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারী [সাউথ : জেনারেল]
      - অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারী [একান্ত : Confidential]
        - ডেপুটি কমিশনার জেনারেল অ্যাডমিনিসট্রেশন পোর্টব্লেয়ার
          - সাপ্লাই অফিসার (পোর্টব্লেয়ার)
          - এ, ডি, কমিশনার (পোর্টব্লেয়ার)
          - অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার (সাউথ আন্দামান পোর্টব্লেয়ার)
          - অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার (মায়াবন্দর)
          - অ্যাসিসট্যান্ট সেটেলমেন্ট অফিসার
        - ডেপুটি কমিশনার (কার নিকোবর)
          - অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার (নানকৌরী)
          - অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার (ক্যাম্পবেল বে)
    - ডেভেলপমেন্ট সেক্রেটারী
      - অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারী (ডেভেলপমেন্ট)
      - স্ট্যাটিসটিক্স অফিসার
      - অ্যাসিসট্যান্ট পাবলিক অফিসার
    - ফরেষ্ট সেক্রেটারী
    - পাবলিক-ওয়ার্কস সেক্রেটারী
    - হিন্দী অফিসার
    - অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারী (পাবলিক)
    - অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারী (অ্যাডমিনিস-ট্রেশন)

॥ বিচার বিভাগ ॥

এখানকার বিচার বিভাগ কলিকাতা হাইকোর্টের অধীন। কাঠামো একেবারে ছোট।

একজন ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন জজ
↓
চিফ্ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
↓
জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
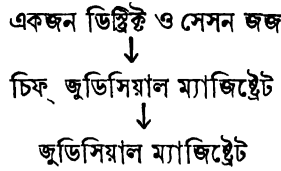
॥ নয় ॥

সাউথ আন্দামানের ঠিক দক্ষিণে পোর্টব্লেয়ারের মাইল পঞ্চাশেক দূরে এক প্রকাণ্ড দ্বীপ লিট্‌ল আন্দামান। লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ আড়ালে ছিল দীর্ঘ দিন। পুরাতন ম্যাপে কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। পরে কোন কোন ম্যাপে নামকরণ হয়েছে—Isle d' Andemaon (Andaman) ও Isle d' Maon (Man)। ১৫৯৫ ও ১৬৪২ সালের ম্যাপে লিট্‌ল আন্দামানের নাম Isle d' Maon না লিখে নামকরণ করা হয়েছে 'চিত্র আন্দামান'। ১৭১০ সালের ম্যাপে 'চিত্র'কে পরিবর্তিত করে 'চিক্' লিখেছে। এ-নামও রইল না। ১৭১০-২০ এর মধ্যে ছাপানো কোন কোন ম্যাপে নাম দিয়েছে 'সাইট আন্দামান'। ১৮৭০ সালে ব্লেয়ার সাহেব ম্যাপ তৈরী করেন। তখনই প্রথম এই দ্বীপকে 'লিট্‌ল আন্দামান' নামে চিহ্নিত করা হয়। সেই থেকে এই নামই চলছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং বৃটিশ রাজকীয় নৌবহর ও সমীক্ষক পার্টিই প্রথম এই দ্বীপ সম্পর্কে সঠিক বিস্তারিত রিপোর্ট দাখিল করেন।

আয়তন অবহেলার যোগ্য নয়। ৭৩১'৬ বর্গ কিলো মিটার। বর্তমান লোকসংখ্যা পাঁচহাজারের কম হবে না। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত কোন সভ্য মানুষের বাস ছিল না এই দ্বীপে। প্রাচীন নেগ্রিটো

গ্রূপের ‘ওঙ্গে’ এখানকার আদিবাসী। সমুদ্রের কিনারে অরণ্যের মধ্যে শ’ দেড়েক ওঙ্গে এখনও ধিকি ধিকি জীবন ধারণ করে আছে। ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট বলে—এদের মোট সংখ্যা ১১২ ; ৫৯ পুরুষ ও ৫৩ জন নারী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নেগ্রিটো গ্রূপের শেষ স্পেসিমেন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অকৃত্রিম এই প্রাচীন স্পেসিমেন পরখ করতে চাইলে এই দ্বীপে না এসে উপায় নেই। এখানকার বড় আকর্ষণ আদিম মানুষ ‘ওঙ্গে’।

নৃতত্ত্ববিদ্‌দের অভিমত মালয়েশিয়ার ‘সোমাঙ্গ’ ও ফিলিপিনের ‘এইটা’—এই দুই নেগ্রিটো উপজাতির সঙ্গে লিটল আন্দামানের ওঙ্গেদের নানাবিষয়ে মিল পাওয়া যায়। সমুদ্র সৈকতে বনজঙ্গলের আড়ালে ঝুপড়ি তুলে ওরা বসবাস করে। ডুগাঙ্গ ক্রিক্, বাম্‌লি ক্রিক্ ও জ্যাকসন ক্রিকের দিকে ওদের দেখতে পাওয়া যায়। বছর কয়েক আগে হাটবেতেও থাকতো। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়নমূলক প্রকল্প ১৯৬৬ সাল থেকে এই এলাকায় আরম্ভ হয়ে যায়। বহু যন্ত্রপাতি মোটর-লরি আমদানী করা হয়। পাকারাস্তা ও গৃহাদি নির্মাণ স্থুরু হয়ে যায়। এতবড় কর্মকাণ্ড অবলম্বন করে বহু লোকজন আসতে থাকে। এই কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে ওঙ্গেদের হাটবেতে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠে। তাই ডুগাঙ্গ ক্রিকে সকলকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। নৃতত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে হাটবেতে ওদের জন্য একটা ছোট চালা করে রাখা হয়েছে। মাঝে মাঝে ওদের আস্তানা থেকে এখানে ডেকে আনা হয়। এখানে রাত্রি যাপন করে। সভ্য সরকারের দেওয়া কিছু উপঢৌকন নিয়ে নিজেদের আস্তানায় ফিরে যায়।

ওঙ্গেদের ওরিজিন সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা না গেলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নেগ্রিটো উপজাতির নিঃশেষিত প্রায় আদিম মানুষ যে এরা—এ-বিষয়ে এখন আর দ্বিমত নেই। জারোয়া ও সেণ্টেনালিজের

মত সভ্য মানুষদের ওরা শত্রু মনে করে না। এক সময় হিংস্র ছিল; বিদেশীদের সহ্য করতো না। এখন সংখ্যায় কম, নিরীহ গোবেচারা মানুষ। সভ্য মানুষের বহু দোষ-ত্রুটি আয়ত্ত করে নিয়েছে, কিন্তু চলমান জগতে চলার অযোগ্য হয়ে রয়েছে। চীফ্ কমিশনার মিঃ স্টুয়ার্ট ও পোর্টম্যানের সহানুভূতি সূচক চেষ্টায় এরা বশে আসে। নৃতত্ত্ব বিভাগের লোকজন ওদের আস্তানায় গেলে ছুটে পালায় না বা রেগে আক্রমণ করে না। ডাকলে কাছে আসে। বসতে দেয়। আপ্যায়ন করে। প্রশ্নের জবাব দেয়। ডঃ সিপ্রিয়ানি ওঙ্গেদের মধ্যে তিনমাস বাস করে গবেষণা চালিয়েছিলেন। অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহের জন্য এখানে এসেছিলেন। বছর কয়েক আগে বেলজিয়ানের রাজা ওঙ্গের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের জন্য জোঁক ও মশার কামড় অগ্রাহ্য করে দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে ওদের আস্তানায় হাজির হয়েছেন। শুধু নৃতত্ত্ববিদ্ নয়, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও এম. পি. এদের দেখতে আসেন। সভ্য মানুষ এদের বিষয় জানতে উৎসুক।

বেঁটেখাটো চেহারা। কাঠ কয়লার মত গায়ের রং। মাথায় ছোট ছোট চুল কোঁকড়ানো ও থোকা থোকা। শিকার এদের একমাত্র পেশা। তিন-চারটি কুকুর লেলিয়ে দিয়ে বনের মধ্যে শূকর ধরে। ধনুক ও বর্শা দিয়ে মাছ শিকার করে। বনের সরু লতা দিয়ে মাছ ধরার জাল বুনে! যূথবদ্ধ এদের জীবন। যখন যেখানে থাকে দল বেঁধে বাস করে। যাযাবরতা এদের স্বভাব। একস্থানে দীর্ঘ সময় স্থির হয়ে থাকতে চায় না। সামুদায়িক পর্ণশালায় বাস করে। বর্ষার সময় বাংলাদেশের বিল ও নদীতে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে গ্রামের লোকেরা একরকম পোলো ব্যবহার করে। ওঙ্গেদের ঝুপড়ি দেখতে বৃহদাকার পোলোর মত। ওপর থেকে নীচু পর্যন্ত পাতা দিয়ে ছাওয়া। ভেতরে প্রবেশের ছোট্ট একটু পথ। সমুদ্র সৈকতে নির্জন স্থানে পর্ণশালা বানাতে পছন্দ করে। গো-মহিষের বাথান

যেমন একসঙ্গে থাকে এরাও তেমনিভাবে বাস করে। প্রস্তর সভ্যতার মানুষ এরা। বিবাহিত একাধিক স্বামী-স্ত্রী একই ঘরে নিজ নিজ নির্দিষ্ট শয্যায় সম্পূর্ণ নগ্নভাবে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকে। পৃথক কুটির বানায় না। কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করে না। পুরুষদের জাঙ্গিয়া পরিয়ে দিন, মেয়েদের পেটিকোট পরিয়ে দিন। রাতে দেহে কিছুই রাখবে না। বেত ও কাঠ দিয়ে ছোট মাচান বানিয়ে শয্যা তৈরী করে। প্রত্যেক মাচানের তলায় আগুন জ্বালায় ও ধূপ দেয়। প্রচণ্ড মশা তাড়ায় এইভাবে। মূলত নগ্ন মানুষ এরা। সাধারণতঃ পুরুষের পরণে থাকে নাম-মাত্র নেংটি। মেয়েরা কোমরে রশি বেঁধে সামনে ঘাসের একটি ছোট্টগুচ্ছ ঝুলিয়ে দেয়। ওদের ভাষায় এর নাম 'নাকোলাক'। মেয়েদের নিতম্ব অদ্ভুত রকমের বড় ও ভারী। মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে মোটা। ওঙ্গে মেয়েরা সাধারণতঃ মাথা ন্যাড়া করে রাখে। কাঁচের টুকরো অথবা ঝিনুক দিয়ে মাথার চুল কামিয়ে ফেলে। একরকম সাদা ও লালমাটি সংগ্রহ করে। স্বামী-স্ত্রী ও মাতা-পুত্র একে অন্যের কোলে বসে এই মাটি চন্দনের মত ঘষে নিয়ে দেহে ও মুখে তিলক কাটে এবং পরস্পরকে আদর করে। বনের মধ্যে যেমন মশা ও জোঁকের প্রচণ্ড আক্রমণ তেমনি এক ধরণের ছোট ছোট কীটের উপদ্রবও ভয়ানক। ওদের ভাষায় 'টিকস্'। চোখের অলক্ষ্যে গায়ে পড়ে; কামড়ে শুধু যন্ত্রণা নয়, ঘা হয়ে যায়। লাল ও সাদা মাটির তিলক 'টিক্‌সের' আক্রমণ প্রতিরোধক শক্তি রাখে বলে অনেকে অনুমান করেন।

ওঙ্গেরা বন্য ফলমূল, নারিকেল ও মাছ মাংস ঝল্‌সিয়ে নিয়ে খায়। সরকারী উদ্যোগে মাঝে মাঝে ওদের চাল ও চা সরবরাহ করা হয়। অনেকে চাল সিদ্ধ করে ইদানীং খেতেও শিখেছে। কচ্ছপের মাংস খেতে খুব ভালবাসে। গভীর অরণ্যে ওরা মধু সংগ্রহ করে। চাক ভাঙ্গবার আগে গায়ে থু থু মেখে নেয়। চাকের গায়েও মুখ থেকে থু থু ছিটায়। এতে নাকি মৌমাছি কামড়াতে

পারে না। লিটল আন্দামানে বড় বড় ধূপ গাছ অনেক। ধূপ সংগ্রহ করাও ওঙ্গেদের একটি প্রধান কাজ। ধূপ ও মধুর বিনিময়ে ওরা সভ্য মানুষদের কাছ থেকে 'সুখামুড়ি' (তামাক পাতা) 'চুট্টামুড়ি' (মোটা বিড়ি), চা ইত্যাদি সংগ্রহ করে। সভ্য মানুষের পাল্লায় ওরা হামেশা ঠকে। ক্রমশ সতর্ক হয়ে উঠছে। মধু ও ধূপ চাইলে আজকাল অনেক সময় জবাব দিয়ে বসে 'না রেমা' অর্থাৎ নেই।

ওদের পরমায়ু কম। স্বভাবে বড় নোংরা। প্রায় সকলের গায়ে চর্মরোগ ; সিফিলিস রোগও ঢুকেছে। শূকর খুলি সকলের কাছেই শুভ চিহ্নের প্রতীক। এদের দেবতা বা অপদেবতার নাম 'পুলগা'। পুলগাকে ভয় করে। তার কাছে মানত করে ও প্রার্থনা জানায়। মূর্তি পূজায় অভ্যস্ত নয়। কেউ মরে গেলে মাচানের নীচেই কবর দেয়। শোকের চিহ্ন স্বরূপ ওরা মাথায় সাদা মাটির প্রলেপ লাগায়। এদের মধ্যে দ্রুত বংশ লোপের প্রধান কারণ—(১) চর্মরোগ ও যৌনব্যাধি, (২) নারীদের অধিক সংখ্যায় বন্ধ্যাত্ব।

ওদের চোখে মুখে সারল্য। কোন উদ্বেগ নেই, কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, সাজসজ্জার বাসনা নেই, লজ্জা সঙ্কোচের বালাই নেই। বিংশ-শতকের দ্রুত চলমান জীবন ও সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। সভ্য জগতের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত একেবারে প্রাকৃতিক মানুষ। এদের গৃহ, শয্যা, আসবাবপত্র, বাসনকোসন সবকিছুর একমাত্র উপকরণ গাছের বাকল ও খোল, বাঁশ ও বেত। তীর বল্লমের ফলা, দা ও কুঠার ছাড়া লোহার সঙ্গে কোন সংশ্রব নেই। পোর্টব্লেয়ারে নৃতত্ত্ব বিভাগের মিউজিয়ামে ঢুকলে এদের জীবনযাত্রার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। বড় গাছের প্রধান কাণ্ড খোদাই করে এরা ক্যানু (নৌকা) বানাতে পারে। তবে নিকোবরীদের তৈরী ক্যানু উন্নত ধরণের। টাকা পয়সার ব্যবহার আদৌ জানে না।

নৃতত্ত্ব বিভাগের কর্মচারী এদের খোঁজ খবর নিতে সময় সময়

আসেন। আদিম জাতি সেবা সংঘের দু'একজন কর্মী ওদের মধ্যে যাতায়াত করেন। তাদের আন্তরিকতা নেই, সুপরিকল্পিত কোন প্রোগ্রামও নেই। নিছক চাকুরি বজায় রাখার জন্য যাতায়াত। ওঙ্গেরা দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক্ এটা কাম্য নয়। ভারত সরকারের একটা গুরু দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু কার গোয়ালে কে ধোঁয়া দেয়! ত্রিশ বছরে প্রশাসনের কোন উন্নতি হলো না। বনের মধ্যে ক্রমশঃ ওদের খাদ্য ফুরিয়ে আসছে। কৃষি বিভাগের কি কোন দুশ্চিন্তা আছে! ওদের এলাকায় দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী চাষ প্রকল্প গ্রহণ করা যায়। দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যানে নারিকেল, পেঁপে, প্যাণ্ডানাস, কাঁঠাল, লেবু গাছ প্রচুর পরিমাণে লাগান চলে। স্বল্পমেয়াদী প্ল্যানে নিকোবরী ইয়াম, মিষ্টি আলু, টেপিওকা ইত্যাদি নানা ধরণের মূলজাতীয় চারা রোপণ করা যেতে পারে। শ্রী আর, সি, নিগমের এই পরামর্শ বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত। কার্যকরী করার দায়দায়িত্ব সরকারের।

এতবড় দ্বীপে যেমন সভ্যমানুষের বাস ছিল না তেমনি কোন পোতাশ্রয়ও ছিল না। ভারতসরকারের নিদ্রাভঙ্গ ঘটে ১৯৫৫ সালে। উচ্চ পর্যায়ের সমীক্ষক দল আসেন। দ্বীপের পূব প্রান্তে হাটবেতে অনেকটা নিশ্চিন্ত পোতাশ্রয় গড়ে তোলা সম্ভব বলে রিপোর্ট দেন। জলের গভীরতা আছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু থেকে জেটি অবশ্য স্বাভাবিক ভাবেই অনেকটা মুক্ত থাকবে তবে উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রকোপ মুক্ত রাখার মত কোন স্বাভাবিক ব্যবস্থা নেই। অনুসন্ধান ও গবেষণার পর স্থির হয়েছে সমুদ্রের মধ্যে ১২০০ মিটার লম্বা বাঁধ দিয়ে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর তাড়না ঠেকান হবে। বাঁধের আকার হবে হকি ষ্টিকের মত। এই প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রবল গতিতে কাজ এগিয়ে চলেছে। ছোট ছোট পাহাড় ভেঙ্গে লরিভর্তি পাথর সারাদিন সমুদ্রে ফেলা হচ্ছে। ঢেউএর তোড়ে পাথরের চাঙ্গড়া এদিক ওদিক গড়িয়ে না যায় এইজন্য ২৭ টন ওজনের এক একটি টেট্রাপড ক্রেনও ডুবুরির সাহায্যে বাঁধের পাশে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

প্রি-মেরিন বিভাগের তত্ত্বাবধানে সারাদিন বাঁধে কাজ চলছে। শত শত টেট্রাপড পড়ছে সমুদ্রের জলে। বাঁধের কাজ সমাপ্ত প্রায়।

বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন বাঁধ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে বছরের সকল সময় জাহাজ নিশ্চিন্তে জেটিতে ভিড়তে পারবে। বাঁধের অপর প্রান্তে উন্মত্ত বায়ু তাড়িত ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়বে; জেটিতে বাঁধা জাহাজ নিরাপদে থাকবে। এই ব্রেক ওয়াটার কাজকে সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। নিশ্চিন্ত পোতাশ্রয় দ্রুত গড়ে না উঠলে উন্নয়ন মূলক সব কাজই ব্যাহত হবে। প্রি-মেরিনের বহু স্টাফ এখানে কর্মরত রয়েছেন। তাঁরা পাহাড় ভাঙ্গছেন, সমুদ্রের বুকে বাঁধ তুলছেন, জেটি নির্মাণ করছেন, বিরাট ওয়ার্কশপ পরিচালন করছেন। পাকা রাস্তা তৈরীর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে পি. ডবলু. ডি. বিভাগ। বড় বড় গাছ উপড়ে ফেলে বসতবাড়ী ও চাষের জমি বের করে দিচ্ছে আর. আর. ওর (Reclamation Repabilitation Organisation) একাধিক ইউনিট। বনবিভাগ বৃক্ষের শ্রেণীবিন্যাস করছে। নানাদিকে কর্মকাণ্ড চলছে। তিনটি জুনিয়র, একটি সিনিয়র বেসিক স্কুল রয়েছে। রামকৃষ্ণপুর, নেতাজী নগর, বিবেকানন্দপুরম নতুন বাঙ্গালী উদ্বাস্তু লোকালয়। চারশ' পরিবার বসতি পেয়েছে। ছোট একটি হাসপাতাল। ওয়্যারলেসে সংবাদ পাঠানোর সুবিধাসহ পোস্ট-আপিস। ছোট একটি বাজার, সরকারী আপিস, গুদাম ও কোয়াটারে বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ করছে ইলেকট্রিক জেনারেটর। হাটবে এখন একটি ছোটখাটো উপনগরী। ১০।১২ বছর আগে ছিল জনমানবহীন বনভূমি। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের কর্মী এবং রাঁচী ও মধ্যভারতের মজুর নানা উন্নয়ন প্রকল্পে নিযুক্ত রয়েছে।

খুব ভোরে হাটবের জেটিতে জাহাজ নোঙর ফেললো। হাজার টনের ছোট জাহাজ। কনক্রিটের সুন্দর লম্বা জেটি। গ্রেট-আন্দামানের মত ছোট ছোট পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই এখানে নেই। মাটিও এত শিলাময় নয়। লিটল আন্দামান মুলতঃ সমতল।

বালুকাময় বিস্তীর্ণ বেলাভূমি। সমুদ্র সৈকতের পশ্চাতে দু'শ তিনশ' বছরের অগণিত বৃদ্ধ বৃক্ষ উন্নতশিরে দাঁড়িয়ে আছে। ১৫০´/ ২০০´ ফিট উঁচু। প্রধান কাণ্ড শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেনি। একেবারে মাথায় কিছু ডালপালা ছাতার মত ছড়িয়ে দিয়েছে। এ-দ্বীপের চেহারা আলাদা, বনরাজি আলাদা, মাটিও ভিন্ন প্রকৃতির। প্রাচীন সব বৃক্ষের সারবান কাঠ খুব মূল্যবান। এত ধূপ গাছ অন্য দ্বীপে নেই। ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এখানে একটি স-মিল ও ম্যাচকাঠির ফ্যাক্টরী স্থাপিত হবে। বনভূমিতে হিংস্র জন্তুর ভয় নেই তবে ময়াল সাপ ও গো-সাপ বেশী। কোকিল, টিয়া পাখি নজরে পড়ে, কিন্তু কাকের কোন উপদ্রব নেই।

কৃষির সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল। এতদিনের লতাপাতা পচা অকর্ষিত জমি যথেষ্ট উর্বরা। তাছাড়া বৃষ্টিপাতের পরিমাণও প্রচুর। পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের মানা ক্যাম্প থেকে এনে চাষযোগ্য জমি দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। অনেকেই চমৎকার ধান ও কলাই ফলিয়েছেন। সব্‌জি ও ফলের চাষ বিস্ময়কর। পাকাকলা ও পেঁপে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বেগুন, লাউ, কুমড়ো, মুলো। মেটে আলু, মিষ্টি আলু, মান, ওল, কচু সুন্দর ফলছে। পোর্টব্লেয়ারে সব্‌জি ও ফলের বাজার আগুন। আর এখানে খাবার লোক নেই। হাটবে ও পোর্টব্লেয়ারের মধ্যে নিয়মিত জাহাজ সার্ভিস চালু করলে এখানকার উদ্বাস্তুদের অবস্থা ফিরে যাবে, পোর্টব্লেয়ারের বাজারও ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে আসবে। অনিয়মিত এবং দীর্ঘদিন পর জাহাজ আসা-যাওয়ায় প্রচুর ফল ও সব্‌জি নষ্ট হয়ে যায়। পূর্ববঙ্গের লোক যেখানেই বসেছেন সেখানেই সব্‌জি ও ফল চাষ বেড়ে গেছে। এখানে আদা ও হলুদ ভাল হবে। আখের চাষও সুন্দর হবে। ছোট একটি চিনির কল স্থাপনের পরিকল্পনা ভারত-সরকারের আছে। এখনও তার কাজ আরম্ভ হয়নি। ৬০,০০০ একর বনভূমি পরিষ্কার করার কাজ এগিয়ে

চলেছে। ২।৩ হাজার পরিবারকে এখানে স্বচ্ছন্দে পুনর্বাসন দেওয়া যায়। দণ্ডকারণ্য থেকে দলে দলে উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের পুনরায় দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছেন অথচ এই দ্বীপে পুনর্বাসন পেলে এইসব উদ্বাস্তু এতদিনে সোনা ফলিয়ে দিত। বিড়াম্বিত জীবন নিয়ে রাজনীতির ক্রিড়নক হয়ে মৃত্যুর পথে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। কেউ তাদের দায়-দায়িত্ব নিতে চাইছে না।

শ্রীলঙ্কার উদ্বাস্তু ভারতীয় কিছু পরিচারকে এখানে পুনর্বাসন দেওয়া হবে শুনেছি। কার-নিকোবরে নিকোবরীদের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে উঠছে। কাজেই, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে লিটল আন্দামানের 'দক্ষিণ' উপকূলে ৩০০ নিকোবরী পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে অধিকাংশ পরিবার এসেও গেছে। তারা নারিকেল, কলা, পেঁপে, মান, ওল, মিষ্টি আলু ও আখ প্রচুর লাগিয়েছে। সকলেই সন্তোষ। সরকারের কাছে কোন দাবী-দাওয়া নেই। ঘর তোলার জন্য সরকার শুধুমাত্র এ্যাসবেসটস দিয়েছেন। একমাত্র কেরোসিন তেল, রান্নার তেল, ম্যাচ, সাবান, পোষাক পরিচ্ছদ ছাড়া আর সব জিনিস দ্বীপেই উৎপন্ন হচ্ছে। রসগোল্লা ও মুরগীর ডিম বাঙ্গালী কলোনীতে সর্বত্র সহজলভ্য।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত লিটল আন্দামান রাবার চাষের একটি অনুকূল জায়গা। ভারতীয় রাবার বোর্ড ইতিমধ্যেই উদ্যোগী হয়েছেন। সত্বর রাবার গাছের চাষ স্বুরু হয়ে যাবে। নাইজেরিয়া থেকে আনা রেড ওয়েল পামের বীজ থেকে তোলা কয়েক হাজার চারা নার্সারী বেড়ে দেখে এসেছি। চারার বৃদ্ধি দেখে নিঃসন্দেহে বলা যায় রেড ওয়েল পামের সম্ভাবনা বিপুল। ডালদা বনস্পতির একটি প্রধান উপাদান বছর কয়েক পরে এই দ্বীপ সরবরাহ করবে। একটি পৃথক প্ল্যানটেশন বোর্ডের হাতে রেড ওয়েল পাম পরিচর্যার ভার থাকবে।

কয়েক বছরের মধ্যে লিটল আন্দামানের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে যাবে। শস্য, সব্‌জি ও ফলের চাষ বাড়বে। লোকবসতি বেড়ে উঠবে। রাস্তাঘাট চারদিকে বিস্তার লাভ করবে। একাধিক শিল্পও গড়ে উঠবে। জাহাজের আনাগোনা বাড়াতেই হবে। দীর্ঘ দিনের যবনিকা অপসারিত হচ্ছে। সভ্য-সমাজ ও মেনল্যাণ্ড থেকে আর বিচ্ছিন্ন থাকতে পারছে না। বঙ্গোপসাগরের বুকে আর একটি সুন্দর লোকালয় ও উপনগরী গড়ে উঠবে। সম্ভবতঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে দ্বীপের আদিবাসী ওঙ্গে। হয়তো তাদের জীবনযাত্রার একটি মিউজিয়াম দর্শক আকর্ষণ করবে। পৃথিবী জুড়ে সভ্যতার জয়যাত্রা এইভাবেই এগিয়েছে।

এখানে ছোট্ট ছুটি জলপ্রপাত আছে। একটি দেখেছি, আর একটি দেখতে পারিনি। গভীর অরণ্যের মধ্যে পায়ে হাঁটা স্যাঁতসেতে পথ। ভেতরে সূর্যের কিরণ কোনোদিন প্রবেশ করার মত রন্ধ্র পায় না। অধিক বৃষ্টির ফলে পথের মাটি সব সময় নরম ও কর্দমাক্ত। লতাপাতায় আচ্ছাদিত পথে অসংখ্য জোঁক। চোখের অলক্ষ্যে ২।৪টি পায়ে লেপ্টে গিয়ে রক্ত চুষতে থাকে। দিনের বেলাতেই মশা ভন ভন করে। পাকা রাস্তা থেকে মাইল দুই এমনি পথে হাঁটবার পর জলপ্রপাতের শব্দ কানে আসে। বড় বড় গাছের গুঁড়ি, ছোট নালা, গাছের নিবিড় ডাল পেরিয়ে জলপ্রপাতের সম্মুখে আসতে হয়। নিঝুম জনপ্রাণীহীন গহন বনভূমির মধ্যে জলপ্রপাত। উঁচু পাথরের গা বেয়ে দিনরাত জলের ধারা ঝরে পড়ছে। জলের ধারায় পাথর ক্ষয়ে গেছে, নানারূপ আকৃতি নিয়েছে। মনে বিস্ময় জাগায়। এখানে এসে দাঁড়ালে মনে হয় একেবারে যেন প্রকৃতির রাজ্যে এসে পৌঁছে গেছি। হিংস্র জন্তুর উপদ্রব না থাকায় মনে কোন ভীতি জাগে না। সরকারী কর্মচারীবৃন্দ মাঝে মাঝে এখানে এসে পিক্‌নিক্‌ করেন যদিও পিক্‌নিকের মত উপযুক্ত স্থান এটা নয়।

॥ দশ ॥

ভারতবর্ষের মানচিত্র চোখের সামনে মেলে ধরলে বঙ্গোপসাগরের পূ-দক্ষিণ কোণে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অদূরে সমুদ্রের বুকে গুটিকয়েক বিন্দু আপনার নজরে পড়বে। পৃথিবীর মানচিত্রে এই বিন্দুগুলির অস্তিত্ব খুঁজে পেতে কষ্ট হয়। ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন বাণিজ্য পথ ছিল কিন্তু এই সব দ্বীপের গা-ঘেঁষেই। সপ্তম শতাব্দীতে এক জোছনা-প্লাবিত রাতে চৈনিক পরিব্রাজক ইত্‌সিং-এর জাহাজ নামহীন ছোট্ট ছোট্ট দ্বীপের পাশ দিয়ে চলছে। তিনি দেখলেন পিছনে লেজের মত ঝুলিয়ে দিয়ে কোমরে নেংটি আঁটা পুরুষ ও লতাপাতার ছোট্ট খাগরা পরা নারী সমুদ্র উপকূলে কোথাও বিচরণ করছে, কোথাও বা নাচগান আমোদ উৎসবে মেতে আছে। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীর পাতায় লিপিবদ্ধ হলো "লো-জেন-কুও", যার ইংরেজী ভাষ্য Land of Naked people। তারপর চারশ' বছর পেরিয়ে গেল, কোথাও আর উল্লেখ নেই। একাদশ শতাব্দিতে চোল রাজ দরবারের বিখ্যাত তাঞ্জোর ভাস্কর্যে এই দ্বীপ প্রাধান্য পেল। ভাষান্তর হয়ে নামকরণ হলো "নাক্কাভরম্"। নাক্কাভরমের পাশ দিয়েই হিন্দু সভ্যতা এই সময় "সুবর্ণ-দ্বীপ" (সুমাত্রা) "যবনদ্বীপ" (যাভা) ও 'সুবর্ণভূমি'তে (দক্ষিণ ব্রহ্ম, থাইল্যাণ্ড ও মালয়) প্রভাব বিস্তার করেছিল। তেরেসা দ্বীপবাসীর কেশ বিন্যাস এখনও তারই একটি ক্ষীণ ইঙ্গিত দেয়। আবার কয়েকশ' বছর পর ধীরে ধীরে এশিয়ার দরিয়ায় পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বাণিজ্য জাহাজের আনাগোনা সুরু হয়ে গেল। এই ক্ষুদ্র দ্বীপমালা কারোরই নজর এড়িয়ে যায়নি। তারও কিঞ্চিৎ চিহ্ন রয়েছে এখানে ওখানে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দিতে 'নাক্কাভরমের' নামকরণ হলো 'নাকাবর', অষ্টাদশে এসে নাম নিল "নিকোবর"। এখনও চলছে সেই নাম।

১৯টা ছোট বড় দ্বীপ নিয়ে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। এখানকার অধিবাসী উপজাতি সম্প্রদায়। দ্বীপে দ্বীপে ছড়িয়ে আছে তারা। এটা আর এখন নগ্ন মানুষের দেশ নয়। চলমান পৃথিবীতে তারা আর পিছিয়ে থাকতে রাজি নয়। প্রগতির পথে পা বাড়িয়েছে। উন্নত জীবনের চিহ্ন নজরে পড়ছে সর্বত্র।

৬ হতে ১০ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে নিকোবরের সবগুলো দ্বীপ। আর একটু নীচে নামলেই বিষুবরেখা। ৯২'৪০° হ'তে ৯৪° ডিগ্রী পূর্বদ্রাঘিমার সীমানার মধ্যে এর বিস্তৃতি। পৃথিবীতে সমুদ্রের বুকে যেখানে যত সাইক্লোন, ঘূর্ণাবর্ত, টাইফুনের উদ্ভব ঘটে দেখা গেছে সেটা প্রধানত ৫° হ'তে ১৫° ডিগ্রী উঃ অক্ষাংশে সীমাবদ্ধ। বিশেষজ্ঞদের এই অভিজ্ঞতা। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব উভয় মৌসুমী বায়ু প্রবাহের প্রভাব এসে পড়ে। বছরে তু'বার বায়ুর দিক পরিবর্তনের সময় আনে সাইক্লোন। নিকোবর দরিয়ায় ঘূর্ণাবর্তে এক সময় বহু বাণিজ্যপোত ডুবেছে। উত্তাল সমুদ্র তরঙ্গের ঝাপটায় তীরে এসে আছাড় খেয়ে পড়েছে। এই কারণে জলদস্যুদের এটা ছিল লোভনীয় ঘাঁটি। লুটতরাজ ছিন্‌তাই সবই চলেছে এখানে। এই এলাকার দ্বীপ নিয়ে কত বিস্ময় জড়ান ভয়ার্ত কাহিনী রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়। ইউরোপের একাধিক দেশের খৃষ্টান মিশনারী ভগবান যীশুর বাণী বহন করে এনেছেন এই দ্বীপমালায়। কিন্তু বেশী দিন কেউ টিকতে পারেননি। ম্যালেরিয়া ও ফাইলেরিয়া রোগে ভুগে কেউ মরেছেন; কেউ বা দারুণ নির্জনতায় শিউরে উঠে পালিয়ে গেছেন। শেষকালে ১৮৬৯ সালে দিনেমার বৃটিশের হাতে এই এলাকা তুলে দিয়ে সরে পড়ে। ইংরেজের রাশিচক্রে তখন বৃহস্পতি তুঙ্গে। ভারতের সাথে সাথে আন্দামান নিকোবরের মালিকানাও তাদের হাতে চলে এল।

আন্দামানের মুল বাসিন্দা আদিম উপজাতির সংখ্যা বহু কমেছে,

এখনও কমে যাচ্ছে। সর্বভারতীয় মারাত্মক অপরাধীর বংশধর সেখানে আস্তানা বেঁধেছে, স্বাধীনতার সৃষ্টি উদ্বাস্তু এসে বসেছে। কিন্তু নিকোবরের চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। নিকোবরীদের ভূসম্পত্তিতে অন্যের অনুপ্রবেশ ঘটতে দেওয়া হয়নি। তাই দুর্গম হলেও এই দ্বীপমালা মনোরম।

আন্দামানের আদিম উপজাতির দেহের গঠন, গায়ের রং, মুখের ভাষা, আহারবিহার, আচার আচরণ, পোষাক পরিচ্ছদ ও সমাজ জীবনের সঙ্গে নিকোবরীদের কোন মিল নেই। পণ্ডিতদের অভিমত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এককালে নেগ্রিটো (Negrito) ও মঙ্গোলয়েড (Mongoloid) জাতির বাস ছিল। আদিম নেগ্রিটো গ্রুপের শাখাপ্রশাখার শেষ চিহ্ন এখনও টিকে আছে গ্রেট আন্দামান ও লিট্‌ল আন্দামানের অরণ্যে। জারোয়া, সেন্টেনালিজ ও ওঙ্গে তাদেরই বংশধর। আর মঙ্গোলয়েড উপজাতির বংশধর রয়েছে নিকোবরের সমুদ্র উপকূলে। ১২টি দ্বীপে তারা ছড়িয়ে আছে ও সংখ্যায় বাড়ছে। গ্রেট নিকোবরের অরণ্যে ঢাকা নদীকূলে এদেরই দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় কিছু "শম্‌পেন" সভ্যমানুষের ছায়া এড়িয়ে এখনও টিকে আছে। এই সব প্রাচীন উপজাতি সভ্যজগতের মানুষের মনে এনেছে বিপুল ঔৎসুক্য, আর এই দ্বীপমালাকে করেছে বৈচিত্র্যময়।

ইন্দোচীনের ভাষার সঙ্গে নিকোবরীদের ভাষার মিল পাওয়া যায়। এখন পেগু ও কামবোডিয়ায় যে মন্‌খ্‌মার (Monkhmer) ভাষা প্রচলিত আছে, মালয় ও ইন্দোচীনের উপজাতি, আসামের খাসি ও মধ্য ভারতের মুণ্ডারা যে ভাষায় কথা বলে তার সঙ্গে নিকোবরীদের ভাষার মিল আছে। এই সব দ্বীপের হাজার পনের মানুষের মাতৃভাষা নিকোবরী। কিন্তু এক দ্বীপের কথ্যভাষার সঙ্গে আর এক দ্বীপের কথ্য ভাষার আপাত কোন মিল পাওয়া যায় না। চট্টগ্রাম নোয়াখালির ভাষার সঙ্গে বাঁকুড়ার ভাষার যেমন পার্থক্য,

কুচবিহারের বাহের সঙ্গে নদীয়ার মানুষের কথায় যে তফাৎ নিকোবরী ভাষাতেও রয়েছে সেই পার্থক্য। নিকোবরী ভাষাকে মোটামুটি ছ'ধরণের কথ্যভাষায় ভাগ করা চলে—(১) কার নিকোবরী, (২) চৌরা (৩) তেরেসা (৪) মধ্য নিকোবরী—কামোতা, নান্‌কৌরী ত্রিণ্‌কত্‌ ও কাচালের ভাষা (৫) দক্ষিণী—অর্থাৎ বড় ও ছোট নিকোবর, পিলো মিলো ও কণ্ডুলের ভাষা (৬) শোন্‌পেন ভাষা। লিখিত ভাষা বর্তমানে একটিই। কার নিকোবরের রোমান অক্ষরের ভাষাই অন্যান্য দ্বীপে ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছে।

নিকোবরীদের মধ্যে এক অদ্ভুত কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। তাদের প্রথম বংশধরের জন্ম নাকি কুক্কুরীর গর্ভে। পুরুষ নিকোবরীদের পুরাতন পরিচ্ছদ কোমরে আঁটা নেংটির পিছন দিকটা লেজের মত ঝুলিয়ে দিবার অভ্যাসের পশ্চাতে হয়তো বা ছিল কুকুর বংশোদ্ভবের একটা প্রাচীন সংস্কার। কুকুরের প্রতি একটা দুর্বলতার ভাব তাদের মনের কোণে এখনো লুকানো আছে। যদিও কেউ কেউ বেড়াল পোষে, কিন্তু ঘরে ঘরে কুকুরের আদর অনেক বেশী। কুকুর লেলিয়ে দিয়ে এক সময় তারা বন্য শূকর ধরতো।

নিকোবরীদের পোষাক পরিচ্ছদের এখন অবশ্য সম্পুর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। আধুনিক পোষাক তারা গ্রহণ করে নিয়েছে। এখন আর পাম্ পাতার পরিচ্ছদ ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে না।

॥ কার নিকোবর ॥

পোর্টব্লেয়ার থেকে প্রায় ২০০ কিঃ মিঃ দক্ষিণে নিকোবর দ্বীপমালার সবচেয়ে উন্নত গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ কার নিকোবর। লিটল আন্দামানের হাটবে হতে ৯/১০ ঘণ্টার সমুদ্র যাত্রা। দু'শ' আড়াইশ' বছরের পুরাতন ১৫০/২০০ ফিট উঁচু বড় বড় গাছ কোথায় হারিয়ে গেল! অগণিত নারিকেল গাছের বন-বীথি। সুপারী

নারিকেলের অসংখ্য বাগিচা। বিস্তীর্ণ সমভূমি। সমুদ্র উপকূল ঘিরে দীর্ঘ কোরাল রিফ্। উর্বর বেলে দোআঁশ মাটির ছাউনি দেওয়া চুনাপাথরের মালভূমি। ১২৬.৯ বর্গকিলোমিটার আয়তন। সাড়ে তের হাজার লোকের বাস। নিকোবরীর সংখ্যাই সাড়ে দশ হাজার। বাকী সব সরকারী কর্মচারী এবং পি. ডবলু. ডি ও প্রি-মেরিনের বহিরাগত কুলি মজুর কামিন লোক। রোদে পোড়া পীত রঙের বেঁটে বেঁটে মানুষ। পাঁচ ফিট, খুব জোর সাড়ে পাঁচ ফিট লম্বা। বলিষ্ঠ দেহ, সুগঠিত পেশী, উদ্বেগহীন অবয়ব। বাধাবন্ধহীন উচ্ছল নারীপুরুষ। গোল মুখ, চ্যাপ্টা নাক। রুগ্নদেহী বড় একটা নজরেই এল না।

পনেরটি গ্রাম নিয়ে এই দ্বীপ। মাঘ ফাল্গুন মাসে উত্তর উপকূলে জাহাজ এসে নোঙ্গর ফেলে। এখানে কোন জেটি নেই। অদূরে টি-টপ ও সোওয়াই দুই গ্রাম। জাহাজ থেকে নেমে বোটে চেপে কয়েক ফার্লং এসে আমরা টি-টপে উঠেছি। টি-টপের উপকূল বড় সুন্দর। মাটিতে পা রেখেই কাছে একটি রেস্টুরেন্ট পাওয়া আগন্তুকের কাছে পরম সৌভাগ্য। দোষা, ছোলা ভাজা, লাল কফি ও পান একই জায়গায় পাওয়া এ-সব দ্বীপে সোজা কথা নয়। জাহাজ-ক্যানটিনের আহার এত নিকৃষ্ট যে নিকোবরীর হাতে তৈরী রেস্টুরেন্টের দোষা ও লাল কফি পরম সুখকর মনে হয়েছিল। দক্ষিণ উপকূলে সমুদ্র-ক্রিকের মুখে সুন্দর ও উন্নত দুটি গ্রাম "কাকানা" ও "কিমুস"। এই দ্বীপের মুকুটহীন রাজা শ্রদ্ধেয় বিশপ রিচার্ডসনের বাড়ী মুস গ্রামে। বাগিচায় ঘেরা বিরাট দ্বিতল বাড়ি, অনতিদূরে প্রকাণ্ড চার্চ। চার্চের প্রবেশ মুখেই বিশপের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি স্থাপিত। পাশে প্রাচীর-ঘেরা প্রমাণ-সাইজ ফুটবল খেলার মাঠ। এই গ্রামেরই অপর প্রান্তে লাইট হাউস। কাছেই একটি পাকা জেটি তৈরীর প্রস্তাব রয়েছে। নভেম্বর হতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সব জাহাজ এই জেটিতে ভিড়বে। এটা থাকবে উত্তর-পূর্ব

মৌসুমী-বায়ু তাড়িত সমুদ্র-বিক্ষোভ স্থান মুক্ত। "বিগ্-লাপাতি" কার নিকোবরের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম। প্রচলিত প্রবাদ এ-দ্বীপের এটাই প্রথম ও আদি গ্রাম। তাই এর কৌলিন্য অনেক বেশী। নিকোবরবাসী এই গ্রাম থেকেই ক্রমশঃ বিভিন্ন গ্রামের পত্তন করে ছড়িয়ে পড়েছে। দ্বীপের চিফ্-হেডম্যা• বহুদিন ধরে এই গ্রামের লোককেই নির্বাচন করা হতো। বাইরের বিশিষ্ট ব্যক্তি এলে দ্বীপবাসীর তরফ থেকে এই গ্রামেই এখনও সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। সব গ্রাম-প্রধানগণ এখানে এসে জমায়েত হন। দ্বীপের একটিমাত্র উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এই গ্রামে। সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের ছোট প্রশিক্ষন কেন্দ্রটিও এইখানে। মালাক্কা ও কাকানা গ্রামের কিছু অংশ জুড়ে ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিমান অবতরন ক্ষেত্র। জাপানীরা প্রথম এটি তৈরী করেছিল। স্বাধীনতার পর সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে বারাকপুর থেকে জঙ্গী প্লেন আসে। মালাক্কা গ্রামে একটি জেটি তৈরী হচ্ছে। মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত জাহাজ এখানে ভিড়বে। সরকারী গেষ্ট-হাউস মালাক্কা উপকূলে, আর পি. ডবলু. ডির রেষ্ট হাউস টি-টপে। মালাক্কা থেকে মাইলখানেক ভিতরে গেলে সরকারী হেড কোয়াটার। কার-নিকোবরের হেড কোয়াটার তো বটেই; গোটা নিকোবর দ্বীপসমূহের প্রশাসনিক হেড কোয়াটার এখানে। একজন ডিপুটি কমিশনার, ট্রেজারী অফিসার, তহশীলদার এখানে থাকেন। সাব পোস্ট আপিস, থানা ও হাসপাতাল এখানেই রয়েছে। কর্মচারীদের কোয়াটারও এই জায়গায়।

ভারতের মুল ভুখণ্ডের মত এত ঋতু বৈচিত্র্য নিকোবরে অনুভব করা যায় না। উভয় মৌসুমী বায়ুর পূর্ণ-প্রভাবের ফলে ঝড় তুফান ও ঘুর্নিবায়ু নিকোবরীদের নিত্যসাথী। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫০ সেন্টি-মিটারের কম কখনও হয় না। তবে বৃষ্টি কোন সময়ই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। জলকণায় আবহাওয়া এত সিক্ত থাকে যে রাতে মুক্ত

আকাশের তলায় কখনও শোয়া যায় না। উষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত হওয়ায় সূর্যের তাপদাহ যদিও বেশী কিন্তু সমুদ্র ঘেরা থাকায় বায়ুর তাপমাত্রা কখনই ৩২° সেন্টিগ্রেডের উপরে যায় না, আর ২২° সেন্টিগ্রেডের নীচেও নামে না। নিকোবরবাসীদের চাঁদের হাসি মন ভুলায়; সূর্যের তাপ ক্লান্তি দেয়। তাদের দিনপঞ্জী ঠিক হয় চাঁদকে ঘিরে। বার্ষিক আনন্দ উৎসবের দিনস্থির হয় চাঁদের দিকে তাকিয়ে। চাঁদনী রাতে হড়িতে বাইচ খেলে; সমুদ্রে মশাল নিয়ে মাছ ধরে। সমুদ্রের জলে 'কিনায়য়া' ছিটিয়ে দেয়; মাছ ছুটে এসে খেতে লাগে। সামুদ্রিক মাছের এটা বড় মুখরোচক চারা, এর অদ্ভুত মাদকতা আছে।

আন্দামানের অন্যান্য উপজাতির মত নিকোবরীরা অরণ্যবাসী যাযাবর নয়। বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ফল মূল সংগ্রহ করে জীবনধারণ করে না। এরা ঘর বেঁধে বাস করে। নারিকেল সুপারীর বাগিচা করে। ওল মান ইয়াম টেপিওকা ইত্যাদি মূল জাতীয় সব্‌জী লাগায়। শূকর পোষে ঘরে ঘরে। মুরগী, ছাগল, গরুও পোষা আরম্ভ করেছে। তবে দুধের জন্য পোষে না। দুধ খায় না, মাংস খায়। পাল-পার্বণ উৎসব আনন্দে এমনকি শোকের সময়ও শূকর মাংস প্রধান উপকরণ। নিকোবরের সকল দ্বীপেই শূকরের দারুণ কদর। শূকর তাদের মূল্যবান সম্পদ, মর্যাদার চিহ্ন। নিকোবরীরা আত্মীয়-বন্ধুদের উপহার দেয় শূকর; শালিশ দরবারে দোষী সাব্যস্ত হলে জরিমানা দেয় শূকর। শূকর মাংস ছাড়া সামাজিক ভোজ উৎসব অচল। উৎসব আসরে শূকরের চোয়ালসল মাথা মাঙ্গলিক চিহ্ন হিসেবে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ধান, পাট, কলাই, ভুট্টা ইত্যাদির চাষ নেই; তাই কোথাও লাঙ্গল বলদের কারবার নেই। সাবল, কোদাল ও দা এদের নিত্যদিনের জীবন সাথী। বর্ষা নামার মুখে জ্যৈষ্ঠ মাসে নিজ নিজ জমিতে নারিকেল সুপারীর চারা লাগায়; নানা জাতের মেটে আলু ও মান গাছ লাগায়। ইয়ামজাতীয় মেটে আলু—

বড় বড় ড্রামে সিদ্ধ করে ভরপেট খেয়ে নেয়। নিকোবরের সব দ্বীপে কেওয়া গাছ প্রচুর। ওরা বলে কেওড়া। গাছগুলো খুব বড় বড়, ১৫।২০ ফিট লম্বা। পাকাফল প্যাণ্ডানাস ওদের প্রধান খাদ্য। কাঁচা অবস্থায় ফলগুলো দেখতে বড় সিঙ্গাপুরী আনারসের মত। ফলের ব্যাস ১´-১½´ ফিট; তিন-চারটি করে এক একটি গাছে ঝুলে থাকে। কলা ও পেঁপে অল্প আয়াসেই জন্মে। হলদে, সবুজ, লাল রঙের পাকা কলা বেশ সুস্বাদু। মাঝে মাঝে ব্রেড ফুট ও কাঁঠাল গাছ নজরে পড়ে। লেবু, মোসাম্বী, আনারস, কাঁঠাল, পেয়ারা, সবেদা ও আমের গাছ সরকারী উদ্যোগে লাগাবার চেষ্টা চলছে। ডাব নারিকেল ওরা প্রচুর খায়। নারিকেল তেলের জন্য "কোপরা" বিক্রী করে। ডাল-ভাত খাওয়াও ইদানীং দ্রুত চালু হয়ে যাচ্ছে।

নিকোবরীদের বাসগৃহ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মাচার উপরে ঘর। কোন মাচা ৫।৬ ফুট; কোনটা আবার ৮।৯ ফুট উঁচু। কোন ঘর গোল। কোনটা চারকোণা। নিকোবরী ভাষায় গোল ঘরের নাম "পাতি"; চতুষ্কোণ ঘরের নাম "তালিকা"। নারিকেল গাছের পাতা বা ঐ জাতীয় সহজলভ্য পাতা দিয়ে ছাওয়া চাল। সরু বাঁশের বা অন্য গাছের বাতা বুনে মাচায় পাটাতন। পাটাতনের উপরে কেওয়া পাতার মাদুর। হয়ে গেল বিছানা। সাধ্যে যাদের কুলোয় তারা মাচায় পাঠাতন তকতা দিয়ে করে নেয়। ঘরের প্যাটার্ণ ক্রমশঃ বদল হচ্ছে। ছোট ছোট কুটিরের পরিবর্তে বড় বড় ঘর তুলবার উদ্যোগ চলছে। মাচার খুঁটি কাঠের; এখন সিমেন্ট কন্‌ক্রিটের খুঁটির প্রচলন হচ্ছে। নারিকেল পাতার বদলে টালি অথবা এ্যাসবেস্‌টসের ছাউনি দেওয়া সুরু হয়েছে। বাসন-কোসন ও বিছানাপত্রে নিকোবরীরা এখনও প্রাকৃতিক মানুষ। আহারবিহারে প্রাচীন জীবনধারার সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে। আধুনিক জিনিষের মধ্যে সেলাই-কল ও সাইকেল ঢুকেছে বহু ঘরে। মেয়েরা স্বচ্ছন্দে সাইকেলে চলে-ফিরে বেড়ায়।

ছোট বড় অধিকাংশ পুরুষ রঙিন জাঙ্গিয়া পরে। মেয়েরা পরে বার্মিজ লুঙ্গি ও টাইট ব্লাউজ। বালক ও যুবক যারা বাইরে যাতায়াত করে তারা আধুনিক ট্রাউজার ও বুশশার্ট পরে চলাফেরা করে। এদের জাতীয় পোষাক প্রায় বিলুপ্তির পথে।

নিকোবরী পরিবারের পরিধি খুব বড়। ৫০।১০০ জন লোক নিয়ে এক একটি পরিবার। আমাদের মত ছোট ছোট পরিবার এখনও গড়ে উঠেনি। পরিবারের কর্তা কাজ বণ্টন করে দেন, বিষয় সম্পত্তির ভোগ দখলের নীতি স্থির করে দেন। নারিকেল ও সুপারী বাগিচায় কার অংশ কতটুকু বলে দেন। বৃহৎ পরিবারের আয়ব্যয় অনেকটা তাঁর পরামর্শ মত চলে। কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি গ্রাম। প্রতি গ্রামে একজন গ্রাম-প্রধান নির্বাচিত হন। সাধারণত যোগ্যব্যক্তি, বিবেচক ও দায়িত্বশীল মানুষকে গ্রাম-প্রধান করা হয়। প্রতি গ্রামে একজন গ্রাম-প্রধান ও দুইজন উপ-প্রধান থাকেন। এঁদের নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত সকলে মেনে চলে। বিভিন্ন গ্রামের প্রধানগণ মিলে একজন সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচন করেন। তিনি গোটা দ্বীপের মুখোপাত্র। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অথবা পরিবারে পরিবারে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটলে গ্রাম-প্রধানগণ মিটিয়ে দেন; প্রয়োজন বোধে বিচার করে শাস্তি দেন। এখানে নিষ্পত্তি না হলে সর্বাধ্যক্ষের গোচরে আনা হয় এবং তাঁর নির্দেশ একবাক্যে সকলে মেনে চলে। সমষ্টি-গত জীবন যাত্রার এক অপূর্ব নিদর্শন। এখানে ব্যক্তিস্বার্থকে সমষ্টি স্বার্থের ঊর্ধে কোন সময়ই মাথা তুলতে দেওয়া হয় না। পারিবারিক, সামাজিক ও সমষ্টি জীবনের শৃঙ্খলা এখনও শিথিল হয়নি। কোন দ্বীপের মালিকানা সেই দ্বীপবাসীদের। প্রধানগণ ও সর্বাধ্যক্ষ পরিবারকে একক ধরে দ্বীপের সব বাগিচা ও জঙ্গল বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

সীমানা চৌহদ্দি মাপবার জন্য এখানে আমিন ডাকতে হয় না। কাঁটা ফেলে মাপজোকের প্রয়োজন এখনও দেখা দেয় নি। লিখিত

দলিল পরচার কোন কারবার নেই। পারিবারিক সম্পত্তির প্রধান ও সমাজ স্বীকৃত সীমানা আছে। খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর নেই। রেজেষ্ট্রী আপিসের প্রয়োজন উদ্ভব হয়নি। কোর্ট কাচারি নেই। মামলা মোকদ্দমা নেই। ভূ-সম্পত্তির হস্তান্তর নেই। সরকারকে রাজস্ব দেওয়ার দায়িত্ব নেই। জীবন যাত্রায় প্রাকৃতিক জীবনধারার ছাপ সুস্পষ্ট। কঠোর সমাজশাসনের নজির রয়েছে। সরকারী প্রশাসনের প্রভাব এখনও নামমাত্র। আধুনিক কৃষিরই প্রবর্তন হয়নি, শিল্পোন্নয়ন অনেকটা দূরের পথ। ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবন তাই জটিল হয়ে উঠেনি। মুখে সারল্য আছে, চিত্তে নিশ্চিন্ততা-বোধ আছে। মিথ্যা সাক্ষী, ষড়যন্ত্র, ছিন্‌তাই, পরস্বাপোহরণ ও গুপ্ত হত্যার নজির নেই বললেই চলে। গোটা দ্বীপের সর্বত্র শান্ত পরিবেশ। সরকারী একখানি বাস, নিকোবর ট্রেডিং কোম্পানীর কয়েকখানি ট্রাক এবং সরকারের জীপ ও ট্যাক্সি নীরবতায় সাময়িক বিঘ্ন ঘটায়। দ্বীপের দরিয়ায় জাহাজ ভেড়ামাত্র গোটা দ্বীপ চঞ্চল হয়ে উঠে। গ্রামের প্রধান বা দ্বীপের সর্বাধ্যক্ষ নারী পুরুষ উভয়েই হতে পারে। কোনরূপ বাধা নিষেধ নেই। গ্রাম প্রধানদের এরা ক্যাপ্‌টেন (Captain) বলে।

গ্রামগুলো ছোট ছোট। মোটামুটি পরিষ্কার। প্রতি গ্রামে একটি করে জমায়েত ঘর আছে। বিভিন্ন ঋতু-উৎসব, হড়ি-উৎসব ও সমবেত ভোজের সময় ভিন্ন গ্রামের অতিথি এসে এখানে উঠে। ঘরের সামনে বেশ কিছুটা খোলা চত্বর। আহারাদি, নাচগান, শালিশ দরবার, ভলি খেলা সব এখানে হয়। মেয়েরা সুন্দর 'ভলি' খেলতে জানে। পুরুষরা খেলে ফুটবল। দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমীবায়ুর আবির্ভাব সময়, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে হড়ি-বাইজ, শ্রাবণে গভীর সমুদ্রে মৎস ধরা এবং নিকোবরী দিনপঞ্জী অনুসারে বৈশাখে নববর্ষ—এইগুলো বিশেষ উৎসব দিন। এক একটি গ্রামে এক একটি উৎসব পালিত হয়। উৎসবে নাচগান ভোজ ও কুস্তি লড়াই

প্রায় থাকেই। হড়ি-উৎসবে—ক্যানুগুলো নতুন করে রং দিয়ে সাজিয়ে সমুদ্রে নামানো হয়।

নিকোবরে নারী পুরুষে অবাধ মেলামেশা। উভয়ের অধিকারও সমান। বিশেষজ্ঞদের অভিমত বিবাহের পূর্বে যৌন সম্পর্ক ঘটেনি এমন নারীর সংখ্যা এখানে কম। তরুণ-তরুণীর মধ্যে ভালবাসা দেখা দিলে তারা পিতামাতার অনুমতি চায়। অনুমতি প্রায় ক্ষেত্রেই দেওয়া হয় গ্রাম-প্রধানের অনুমোদন সাপক্ষে। তারপর আনুষ্ঠানিক বিবাহ। অবৈধ সন্তান সমাজ ও পরিবার স্বীকার করে নেয়। বিবাহের সময় যদি দেখা যায় স্ত্রীর পিতৃকুলে পুরুষের সংখ্যা কম; তাহলে অনেকক্ষেত্রে বর নিজ পিতৃগৃহে বধূ না এনে, নিজেই বধূর গৃহে গিয়ে উঠে। উভয় পরিবারের সম্মতিতেই এটা ঘটে।

একটা গ্রামের বিভিন্ন অংশে এক বা একাধিক পরিবারকে কেন্দ্র করে "তুহেত" খাড়া করা হয়। জঙ্গলের মধ্যে ছোট ছোট ঘর, নারিকেল ও সুপারী বাগিচা ও নিজস্ব বনভূমি নিয়ে গ্রামের অংশকে বলে 'তুহেত'। যখন রাস্তাঘাট ছিল না, বাগিচায় প্রবেশের পথ ছিল দুর্গম তখন 'তুহেতের' গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী। পরিবারের লোকেরা তুহেতে ঘর তুলে ফল পাহারা দিত ও সংগ্রহ করে আনতো। কার নিকোবরে অনেক পাকা রাস্তা হয়ে গেছে। বাস চলছে। ভূ-সম্পত্তির সীমানা নির্ধারণে তেমন কোন অসুবিধা ঘটছে না। ফলে 'তুহেতে' কেউ আর ঘর তুলছে না।

অপরের গাছের ফল বিশেষত নারিকেল সুপারি এখানে কেউ চুরি করে না। পথ চলতে পিপাসা পেলে পথিক অনুমতি না নিয়েই অন্যের বাগিচার ডাব পেড়ে খেয়ে নেয়; দু' একটা আবার সঙ্গেও নিয়ে যায়। যাবার পথে মালিককে বলে যায় অথবা গাছের গায়ে কাগজে নাম লিখে লটকে রেখে যায়। পিপাসায় সাধারণত জল পান না করে কাঁচা ডাবের জল পান করে। এসব দ্বীপে নলকুপ নেই। কুয়ো খুঁড়লে অল্প নীচে মিঠা জল পাওয়া যায়, কিন্তু সে জল পানের

উপযোগী নয়। মৃত্যু জনিত ব্যাপারে অথবা অন্য কোন কারণে সাধারণ ভোজ দিতে গিয়ে যারা অতিরিক্ত খরচ-খরচান্ত করে টানাটানির মধ্যে দিন কাটায় তারা নিজ বাগিচার সামনে "তাকয়া" খাড়া করে দেয়। যে বাগিচায় 'তাকয়া' খাড়া করা থাকে সেই বাগিচায় কেউ আর হাত দেয় না।

নিকোবরী ছেলেমেয়ে প্রায় সকলেই সাঁতার জানে। সমুদ্রের জোয়ার ভাটা, ঝড় তুফান, চোরা স্রোত সম্বন্ধে এদের জ্ঞান বিস্ময়কর। দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে যাতায়াতের একমাত্র উপায় হড়ি অর্থাৎ ক্যানু। জাহাজ তো সকল দ্বীপে থামে না। সেই জাহাজের দর্শনও একপক্ষ কালের মধ্যে একদিন—তাও ঘটে না। আমাদের তালগাছের ডোঙ্গার সঙ্গে হড়ির তুলনা করা চলে। দৈর্ঘে ও প্রস্থে যা একটু মিল আছে। হড়ি একটি বড় গাছের কাণ্ড খোদাই করে তৈরী হয়। মাঝখান থেকে দু' মাথার গলুই-এর দিকে ধীরে ধীরে সরু হয়ে গেছে। রং দিয়ে নিলে দেখতে সুন্দর দেখায়। হড়ির এক পাশে দু'টো কাঠের ফালি টানা দিয়ে হড়ির বরাবর আর একটি কাঠের ফালি বেঁধে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এতে উল্‌টে যাবার আর কোন ভয় থাকে না। ডোঙ্গার মত 'হড়ি' কখনও টল্‌মল্‌ করে না। ছোট শিশুসহ নারী পুরুষ হড়িতে চেপে স্বচ্ছন্দে সমুদ্রে বিচরণ করে বেড়ায়। সারি সারি 'হড়ি' সাজিয়ে গ্রামে গ্রামে বাইচ প্রতিযোগিতায় নামে। গ্রামের ছোট বড় নারীপুরুষ সমুদ্রতীরে জমায়েত হয়ে মহানন্দে বাইচে উৎসাহ দেয়। একটা 'হড়ি' ছ' সাত বছর বেশ চলে; অনেক সময় দশ বার বছরও টিকে যায়।

নিকোবর দ্বীপমালার সমুদ্র উপকূলে প্রবাল সঞ্চিত হচ্ছে। জলের নীচে নানা আকৃতির প্রবাল ধীরে ধীরে ফুলঝুড়ির মত বেড়ে উঠে। বিপুলা পৃথিবীর বুকে ক্ষুদ্র পলিপস্‌ কঙ্কালের এ-এক বিচিত্র সমাবেশ! তাছাড়া কত রকমের অদ্ভুত ধরণের শামুক, বিচিত্র কচ্ছপ, অপূর্ব কাঁকড়া, বিস্ময়কর চিংড়ি বছরের বিভিন্ন সময়

বেলাভূমিতে উঠে পড়ে। গৃহসজ্জার অপরূপ সামগ্রী! এগুলো বালির মধ্যে সংগ্রহ করা নিকোবরী ছেলেমেয়ের এক আনন্দ। শেলের বিচিত্র গহনা, শঙ্খ ও প্রবালের সভ্য সমাজে বিপুল চাহিদা। পোর্টব্লেয়ারে টুরিষ্ট যাঁরাই আসেন এগুলো হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকেন।

লোকালয়ের কয়েক গজ দূরেই পরিবার পিছু "আতুর ঘর" ও "মরণ ঘর" দেখতে পাবেন যদি উৎসুক থাকেন। জন্ম ও মৃত্যুতে তাদের অশৌচবোধ অত্যন্ত প্রবল। পরিবারের কোন নারীর সন্তান প্রসবের সময় হলেই আতুর ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রসবের পর নবজাত শিশুসহ প্রসূতি ও তার নিকটতম আত্মীয়কে কয়েকদিন আতুর ঘরের লাগোয়া কুটিরে বাস করে অশৌচ পালন করতে হয়। তারপর শুদ্ধি ও গৃহে ফিরে আসা। কোন লোকের কঠিন রোগ দেখা দিলে তাকে মরণ ঘরে সরিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ আছে। ঐখানে চিকিৎসা হবে। সুস্থ হলে গৃহে ফিরবে; আর মৃত্যু ঘটলে মরণ ঘরের কাছে কবর দেওয়া হবে। কার-নিকোবরে কিছুদিন যাবৎ পাবলিক গ্রেভইয়ার্ড সমুদ্রতীরে তৈরী করা হয়েছে। অন্যান্য দ্বীপে সাধারণ গোরস্থানের প্রচলন হয়নি; পারিবারিক গোরস্থান রয়েছে। মৃত ব্যক্তির নিজস্ব জিনিষপত্র কবরখানার সঙ্গে দেওয়া আর একটি পুরাতন প্রথা। কার-নিকোবরে এ-প্রথার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে; মূল্যবান অস্থাবর জিনিষ নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়, আর অন্যান্য জিনিষপত্র হয় কবরে রাখা হয় অথবা পুড়িয়ে ফেলা হয়। কার-নিকোবরে মৃতাশৌচের শুদ্ধি ঘটে ৭ হ'তে ১৫ দিনের মধ্যে। কুয়োর জলে স্নান করে শুদ্ধ হতে হয়। আগে অশৌচ চলতো অনেকদিন ধরে। শুদ্ধির দিনে সাধ্যমত ভোজদিবার প্রথা আছে। অনেকটা হিন্দুদের শ্রাদ্ধের মত!

এ-দ্বীপের প্রাণ-পুরুষ ৯৫ বছরের বৃদ্ধ বিশপ রিচার্ডসন। এ-দ্বীপের যত কিছু অগ্রগতি হয়েছে তার মূলে রয়েছে প্রধানতঃ

এঁরই অবদান। এখনও তিনি সক্রিয় ও অবিসংবাদিত নেতা। তাঁর কাছে বসে দ্বীপের যে অতীত কাহিনী শুনেছি এখানে তারই একটু পাঠকদের কাছে তুলে ধরছি। অরণ্যে ঘেরা দুর্গম এইদ্বীপে ১৮৯৬ সালে প্রথম ভারতীয় খৃষ্টান মিশনারী মিঃ সোলোমন বৃটিশ এজেন্ট হয়ে এখানে এলেন। এ-সব দ্বীপে একজন এজেন্ট পাঠিয়েই তখন বৃটিশরাজ দায়মুক্ত হতেন। পোর্টব্লেয়ার থেকে জাহাজ আসতো তখন ৩।৪ মাসে একবার। বৎসরে কখনও কখনও বর্মাগামী জাহাজ কার-নিকোবরের উপকূলে নোঙ্গর ফেলতো। রেঙ্গুন যদিও কাছে, তবু মেনল্যাণ্ডের সঙ্গে সংযোগ ছিল খুব ক্ষীণ। সভ্যজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। জীবন-যাত্রা পুরোপুরি প্রাকৃতিক। পুরুষরা পেছনে লেজ ঝুলিয়ে কোমরে নেংটি এঁটে ঘুরে বেড়াত। মেয়েরা লতাপাতার ঘাগরা কোমরে জড়িয়ে চলাফেরা করতো। চারিদিকে ভূতপ্রেত ও শয়তানের অঘটন আশঙ্কায় শঙ্কিত থাকতো। অপদেবতার অলৌকিক শক্তির উপরে বিশ্বাস ছিল অটুট। ভূতপ্রেতের ওঝার প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। প্রেত ভর করেছে বলে কোন নারী বা পুরুষকে একবার ওঝা চিহ্নিত করে দিলে আর নিষ্কৃতি নেই। তার ভাগ্যে মৃত্যুদণ্ড। সন্তান-সন্ততিদের নামকরণ করার প্রথা তখনও চালু হয়নি। ডাক নামের পরিবর্তন হামেশা ঘটতো। এমন এক সময়ে বৃটিশ এজেন্ট হয়ে এলেন মাদ্রাজের এক খৃষ্টান মিশনারী মিঃ সোলোমন।

গ্রাম প্রধানদের ডেকে তাদের বারজন ছেলে নিয়ে সোলোমন প্রথম ইস্কুল খুললেন। লালরঙের ছোট হাফ জাঙ্গিয়া ১২ খানা এনে তাঁর ছাত্রদের প্রথম পরিয়ে দিলেন। ছেলেরা নেচে উঠলো। মা বাবা বিস্মিত হলো। জাঙ্গিয়া পরে ইস্কুলে আসতে হয় সোলোমন শেখালেন। আজ দ্বীপের মধ্যে সকল পুরুষ জাঙ্গিয়া পরে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেরা পুরাদস্তুর ট্রাউজার ও বুশসার্ট পরতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সোলোমন বারজন ছাত্রের প্রথম

নামকরণ করলেন। জানালেন "জন" শব্দ সকলের নামের আগে থাকবে। নামকরণ হলো—একজন জন বুল, আর একজন জন ডেভিডসন, তৃতীয় জন রবিনসন ইত্যাদি। ১১ বছরের বালক হা চেভ্-কা সেদিন হলো জন রিচার্ডসন। নিকোবরীদের লিখিত কোন ভাষা ছিল না। সোলোমন ছেলেদের গল্প শোনাতেন। ধীরে ধীরে ইংরেজী শব্দের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতেন। রিচার্ডসনের যোগ্যতা ও বুদ্ধিতে তিনি আকৃষ্ট হলেন। রেঙ্গুন মিশনারীতে ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিলেন। সেখান থেকে রিচার্ডসনকে যেতে হয় মান্দালয়ের এক ইস্কুলে। নিকোবরীদের প্রথম শিক্ষিত ছেলে রিচার্ডসন। শুধু শিক্ষিত নয়, সমুদ্রপাড়ি দিয়ে বিদেশ থেকে পড়ে এসেছে। গ্রামে নেতৃত্ব দিল। মিঃ সোলোমনের স্ত্রী এসে যোগ দিলেন। মেয়েদের পোষাকও ক্রমশঃ বদলে গেল। বর্মার লুঙ্গী উঠলো তাদের কোমরে। ঊর্ধ-অঙ্গ বে-আব্রু থাকলো। ধীরে ধীরে সেখানেও পরিবর্তনের বাতাস লেগেছে। এখন টাইট ব্লাউজ সকলের অঙ্গেই।

মিঃ সোলোমন এই দ্বীপেই মারা যান। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ইস্কুল চালিয়ে যেতে লাগলেন। এরমধ্যে ছাত্রের সংখ্যা বেড়ে উঠেছে। জন রিচার্ডসন এই ইস্কুলেরই একজন শিক্ষক হলেন। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে মান্দালয়ে ফুটবল খেলেছেন, ভলিবল খেলেছেন। সোলোমনের ইস্কুলে ফুটবল চালু হলো। আজ ফুটবল ও ভলিবল নিকোবরের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতায় কার-নিকোবরের হাইস্কুলের ছেলেরা পর পর তিন বছরই সুব্রত কাপ ছিনিয়ে নিয়েছে। মেয়েদের ভলিবল খেলাও দেখবার মত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইংরেজ মিশনারী রেভারেণ্ড জর্জ হোয়াইট-হেড এই দ্বীপে এলেন। নিকোবরী ভাষা তখনও মৌখিক। লিখিত অক্ষরের প্রচলন ছিল না। রিচার্ডসন ও হোয়াইহেড লেগে গেলেন এই দুরূহ কাজে। রোমাণ বর্ণমালায় নিকোবরী-ভাষাকে

লিখিত রূপ দিলেন। তৈরী হয়ে গেল Dictionary of Car Nicobar Language. এবার দু'জন মিলে নিকোবরী ভাষায় বাইবেল অনুবাদের কঠিন সাধনায় নামলেন। কিছুদিন পর হোয়াইহেড দেশে ফিরে গেলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিশ্বজোড়া আলোড়নের মধ্যে শান্ত বিচ্ছিন্ন দ্বীপেবসে রিচার্ডসন অনুবাদের কাজ সমানে চালিয়ে যেতে লাগলেন।

রিচার্ডসনের বাড়ী মুস গ্রামে। ইস্কুলটিও মুস গ্রামে। তৎকালীন সরকারী এজেন্টের আপিসও ছিল মুস গ্রামে। রিচার্ডসনের চেষ্টায় খৃষ্টধর্ম এই গ্রাম থেকেই ধীরে ধীরে অন্যান্য গ্রামে প্রসার লাভ করে। মিঃ সোলোমন এই গ্রামে প্রথম ছোট একটি কাঠের ঘরে চার্চের পত্তন করেন। প্রথম যুদ্ধের পর সংস্কার করে সেটা বড় করা হয়। ইতিমধ্যেই রিচার্ডসন একখানা প্রার্থনা পুস্তকও সম্পাদনা করে ফেলেছেন। সমস্যা ছিল শুধু ছাপানোর। ঈশ্বর প্রসন্ন হলেন। মান্দালয় মিশনারী স্কুলের শিক্ষক—যার কাছে বছর কয়েক আগে রিচার্ডসন অধ্যয়ন করেছেন—মিঃ হার্ট এলেন কার নিকোবরের বৃটিশ এজেন্ট হয়ে। দশ বছর তিনি এখানে থেকে গোটা দ্বীপবাসীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কুড়িয়ে নেন। রিচার্ডসনের পুস্তিকা ছাপানোর ব্যবস্থা হলো। ফুটবল, ভলিবল স্পোর্টস তিনি সংগঠন করতেন এবং নিজে 'কোচ' দিতেন। তাঁর কোচে নিকোবরীরা পরিচ্ছন্ন খেলায় অভ্যস্ত হয়। তারা সাধারণত 'ফাউল' করে না। পেনালটি সর্টে গোল দিয়ে জিততে চায় না। তাদের খেলার স্ট্যানডার্ড বেশ উন্নতমানের। এ-দ্বীপে বাইরেব জিনিষ তখন আসতো না, দ্বীপের জিনিষও বাইরে যেত না। মিঃ হার্ট উদ্যোগী হয়ে রেঙ্গুন থেকে মুসলমান ব্যবসায়ীকে এখানে নিয়ে আসেন। কোপরা ও সুপারী মেনল্যাণ্ডে চালান দিয়ে দ্বীপবাসীর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের দায়িত্ব এদের হাতে ন্যস্ত করেন। এই গুজরাটী মুসলমান ব্যবসায়ী পরিবার এখন নিকোবরের সমস্ত দ্বীপে একচেটিয়া কারবার ফেঁদে

বসেছেন। কার-নিকোবরের চক্‌চকিয়া গ্রামে চাম্পিন দ্বীপে এদের বিরাট আপিস, বিরাট গুদাম, প্রচুর স্টক। অন্যান্য দ্বীপেও ছোট স্টোর আছে। চাল, ডাল, তেল, নুন থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় প্রসাধন দ্রব্য, পোষাক পরিচ্ছদ, বুশ সার্ট, জামার ছিট, চীনামাটি ও অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র, ট্রানজিস্টার সব ন্যায্য মুল্যে সরবরাহ করছেন দ্বীপবাসীদের। আর দ্বীপপুঞ্জের যাবতীয় নারিকেল ও সুপারি সস্তায় সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছেন। নিজেদের জাহাজ ও বোট আছে। সরকার বা শিপিং করপোরেশনের মুখাপেক্ষী নয় একটুও। কার নিকোবরে নিকোবরী কো-অপারেটিভ মার্কেটিং কোম্পানী (N.C.M C), চাম্পিনে নানকৌরী ট্রেডিং কোম্পানী (N.T.C.) নাম দিয়ে আকুজি একচেটিয়া কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন। নিকোবরী জনসাধারণ এদের প্রতি আস্থাবান। প্রতি দ্বীপের সর্বাধ্যক্ষদের এঁরা কারবারের সংগে যুক্ত করে রেখেছেন। কাজেই সংগ্রহ ও সরবরাহ কোন দিকেই তাদের কোন অসুবিধা ঘটছে না।

স্বজন বিহীন ভাবে হঠাৎ মিঃ হার্ট ১৯২৮ সালে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এখানকার ছোট্ট হাসপাতালে মারা যান। সেদিন গোটা গ্রাম মনোবেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। এবার রিচার্ডসনকে ভারত সরকার নিকোবরের এজেন্ট নিয়োগ করলেন। এই দ্বীপেরই একজন লোক এই প্রথম এজেন্ট হলেন। দ্বীপবাসী গৌরব বোধ করলো। ১৯৩৪ সালে রেঙ্গুনে ডেকে নিয়ে তাঁকে পাদ্রী পদে উন্নত করা হলো। পাদ্রী রিচার্ডসন উদ্ভট কতকগুলো কুসংস্কার দুর করার জন্য সঙ্কল্প নিলেন। মরণ ঘরের কথায় তখনও যেকোন অসুস্থ ব্যক্তি আঁতকে উঠতো। মৃত্যুর অনেক আগেই মরণ-প্রস্তুতি সুরু হয়ে যেত। ঝাড়ফুক্‌ প্রেত শান্তির তুক্‌তাক্‌ চলতে থাকতো। মুরগী বলি, শূকর বলি, দেওয়া হতো। মৃতদেহ কবরস্থ করার সময় শূকর ও মোরগের রক্ত লতাপাতায় লাগিয়ে ঘোরানো হতো—উদ্দেশ্য ভূতপ্রেত যেন কাছে ঘেঁষতে না পারে। রিচার্ডসনের বড় মনঃকষ্ট।

দেশবাসীর এই উদ্ভট কুসংস্কারের ঘোর কিছুতেই কাটছে না। এমন সময় নিকোবরী ভাষায় অনুবাদ করা বাইবেল রেঙ্গুন থেকে ছাপা হয়ে এসে গেল। লিখাপড়া জানা যেক'টি পরিবার ছিল এক কপি করে বাইবেল সকলকে রিচার্ডসন উপহার দিলেন। ১৯৩৯ সালেও মাত্র পাঁচশত জনের বেশী লোক খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেনি।

এলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪২ সালের ৪ঠা জুলাই জাপান দখল নিল দ্বীপপুঞ্জ। ইংরেজী জানা লোকের উপর অত্যাচার স্থুরু হলো। রিচার্ডসন কিছুদিন লুকিয়ে থাকলেন কার-নিকোবরের একটি গুহায়। জাপানীরা গুহাটির সন্ধান পেলে রিচার্ডসন বন্দী হলেন। পরে এই গুহার ভেতরে জাপানীরা অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখে। কাছেই বিমান অবতরণ ক্ষেত্র গড়ে তুলে। রাস্তা তৈরী ও জঙ্গল কাটার কাজে হাত লাগায়। স্থানীয় লোকদের টেনে কাজে নামায়। বিরোধিতা করার জো ছিল না। শাস্তি—দৈহিক অত্যাচার ও মৃত্যুদণ্ড। ১৯৪২ হ'তে '৪৫ সালের মধ্যে ৪০ জনেরও বেশী লোককে জাপানীরা হত্যা করে। রিচার্ডসনের দুই পুত্রও নিহত হন। তাঁর শিরেও মৃত্যুর নির্দেশ ঝুলছিল। আনবিক বোমা ঐদিন হিরোশিমায় না পড়লে তাঁর জীবন নাশ ঘটতোই। জাপানীদের হাতে যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের নামের তালিকা শ্বেত পাথরের ফলকে খোদাই করে মুস গ্রামে রাখা আছে। দ্বিতীয় যুদ্ধের শেষে অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় সকল দ্বীপবাসী খৃষ্টান হয়ে যায়। প্রায় প্রতি গ্রামেই একটি করে ছোট চার্চ দেখেছি। বিশপ রিচার্ডসন আবেগ জড়িত কণ্ঠে জানালেন—"জাপানীরা চার্চের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছিল। আমরা সেটা নতুন করে গড়েছি। বিরাট চার্চটি মিঃ সোলোমনের নামে উৎসর্গ করেছি। উনি এখানে না এলে আমরা আরো কতকাল অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকতাম। তিনিই আমাদের প্রথম আলোর সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর কথা আমরা

ভুলিনি, ভুলতে পারবো না।” ১৯৫০ সালে কলিকাতার সেন্টপল ক্যাথেড্রালের আর্ক-বিশপ পাদ্রী রিচার্ডসনকে “বিশপ” উপাধিতে ভুষিত করেন। কার নিকোবরের প্রায় ৮ হাজার লোক এখন খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। স্বাধীন ভারত সরকার তাঁকে “পদ্মশ্রী” ও “পদ্মভূষণ” উপাধিতে সম্মানিত করেছেন। একটা দুপুর মন্ত্র-মুগ্ধের মত শুনেছি এই কাহিনী।

এ-দ্বীপের অধিকাংশ লোক এখন পুরাতন সংস্কার মুক্ত। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে উৎসুক। সরকারী ও বেসরকারী চাকুরীতে যোগ দিতে ইচ্ছুক। এখানকার একটি যুবক এম এ পাশ করে তহশীলদার হয়েছেন, আর একটি বি এ পাশ যুবক চার্চের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

কয়েকটি সাধারণ নিকোবরী শব্দের এখানে উল্লেখ করছি ঃ

Fath r—yoṅg-ki-konyo.
Mother—yoṅg-ki-kaṅo.
Brother—kahen-ki-konyo.
Sister—kahen-ki-kaṅo.
Son—kon-ki-konyo.
Daughter—kon-ki-kaṅo.
Male—akram/otvai.
Female – poimā/tochen.
Marriage – pinihȯ.
My companion/“with me”—hol chu.
Coconut tree – Ta-ō-kȯ.
The liquid of a green coconut—ok.
Half karnal of coconut—i-rat-ka.
I have no coconut tree—ot ta-o-kie-chim.
Rain (noun) and to rain (verb)—kumrah.
One—kathok ; Two—net.
Three—Lūoi ; Four—fen.
Five—taneui ; Six—tafūol.
Seven—sat ; Eight—hevhore.
Nine—machūōtore ; Ten—som.

॥ বাট্টি মালভ্ ॥

কার নিকোবরের গায়ের কাছে ২৯ কিমি মত দুরে ছোট্ট একটি দ্বীপ। কাকানা গ্রামের দক্ষিণে অদুরে অবস্থিত এই দ্বীপটিকে ওরা

বলে "কুওন-নো'। কোন লোক এখানে থাকে না। প্রচুর পায়রা বাস করে দ্বীপের গায়ে। আর উপকূলে অপর্যাপ্ত মাছের আড্ডা। একটা কিংবদন্তী আছে কাকানা গ্রামের একটা অংশ কোনসময় দেবদূতরূপী বিরাট এক পাখী ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে নিষ্ফল হয় এবং ফেলে যায় সমুদ্রের মধ্যে। এইকারণেই এই ছোট্ট দ্বীপটার বিচ্ছিন্নতা কার-নিকোবর থেকে। কার-নিকোবরের লোকেরা এ-দ্বীপে যায় বটে কিন্তু বাস করে না।

॥ চৌরা ॥

"কুওন-নো" (বাট্টি মালভ্) দ্বীপকে পাশ কাটিয়ে ৩১। ৩৩ কিঃমিঃ এগোলে যে দ্বীপের সন্ধান মিলে তার আয়তন যদিও ছোট কিন্তু বৈশিষ্ট্যে অনন্য। দ্বীপটার আয়তন ২·৮ বর্গমাইল (৮·২ বর্গ কিঃ মিঃ) কার-নিকোবরের মত সমতল; দক্ষিণ প্রান্তে একটা ছোট টিলা আছে। লোকের বাস প্রায় দেড় হাজার। সমস্ত নিকোবর গ্রুপের দ্বীপ-সমূহের মধ্যে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দ্বীপ এটা। এ-দ্বীপের লোকেরা পরিশ্রমী ও গরীব। এদের বাগ বাগিচা ও বিষয়সম্পত্তির পরিমাণ খুব কম। আশপাশের দ্বীপে গিয়ে বহুলোককে মজুর খাটতে হয়। কাজের সন্ধানে বিভিন্ন দ্বীপে বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু কার-নিকোবরে মজুর খাটতে যায় না। যেখানেই কাজে যাক্, ঠিক দু'মাস পূর্ণ হয়ে গেলে একবার ঘরে ফিরবেই। কিছুতেই ধরে রাখা যাবে না তাদের। ওদের দীর্ঘদিনের বিশ্বাস দু'মাসের পর আর বেশীদিন অনুপস্থিত থাকলে গৃহিণীদের প্রলুব্ধ করে অন্যে বিবাহ করতে পারে। দু'মাসের পর স্বামী গৃহে না ফিরলে তার জীবন সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া দোষনীয় নয়।

নিকোবরীদের বিশ্বাস এই দ্বীপটি অপদেবতার আবাসভূমি। সকলের ধারণা চৌরাবাসী অলৌকিক শক্তির অধিকারী। সবাই এদের মনে মনে ভয় করে। কেউ চটাতে চায় না, কখন কি অঘটন

ঘটিয়ে ফেলবে। ঝাড় ফুঁক ভূত প্রেত অপদেবতা শয়তান ইত্যাদির পীঠস্থান এই দ্বীপ। পুরাতন সংস্কার, পুরাতন বিশ্বাস, পুরাতন প্রথা এরা আঁকড়ে ধরে আছে এখনও। বিশপ রিচার্ডসনের চেষ্টা সত্বেও কোন ফল হয়নি। হিন্দু সমাজের প্রাচীন সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

চৌরাবাসী সুন্দর ক্যানু বানাতে জানে। এদের মাটির কাজও চমৎকার। কিন্তু ভাল মাটি ও মজবুত কাঠ কোনটাই এখানে মিলে না। তেরেসা দ্বীপ থেকে মাটি ও কাঠ সংগ্রহ করে আনে। অন্যান্য দ্বীপে ক্যানু তৈরী করার পর চৌরায় এনে মন্ত্রপুত করা দীর্ঘদিনের রেওয়াজ। চৌরায় মন্ত্রপুত করা ক্যানু সমুদ্রের ঝড় তুফানে সচরাচর ডুবে না—এই বিশ্বাস। মাঙ্গলিক যে কোন অনুষ্ঠানে চৌরার তৈরী মাটির পাত্রে আহার্য রন্ধন নিকোবরীদের দীর্ঘস্থায়ী রীতি। চৌরার লোক মাটির পাত্র ও ক্যানু অন্যান্য দ্বীপে বেচতে যায়। বিভিন্ন দ্বীপের পুরুষরা চৌরায় মাটির পাত্র ও ক্যানু কিনতে আসে এবং এখানকার ওঝা পুরোহিতের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে যায়; গ্রহ-শান্তি, শয়তান শান্তি; প্রেতশান্তি করিয়ে যায়। তেরেসায় নিকোবর ট্রেডিং কোম্পানীর (N. T. C.) গুদাম থেকে চৌরাবাসী নিত্য প্রয়োজনায় জিনিস সংগ্রহ করে। এদের জমি কম বলে কেউ কোন জমি ফেলে রাখে না। নিকোবরীবাসীর কাছে এ-দ্বীপের খ্যাতি সবচেয়ে বেশী।

॥ তেরেসা ॥

চৌরা দ্বীপের কাছেই তেরেসা ও বোম্‌পোকা দ্বীপ। বোম্‌পোকা সমুদ্র ফুঁড়ে মাথাতোলা একটা টিলা মাত্র। ১৩·৩ বর্গ কিঃ মিটার আয়তন। জনা ষাটের বেশী লোক থাকে না। তেরেসার সঙ্গেই এদের যোগাযোগ নিবিড়। তেরেসা বড় দ্বীপ, ১০১·৪ বর্গ কিঃ মিঃ আয়তন। তবে লোকের বাস হাজার খানেক হবে কিনা সন্দেহ।

দ্বীপটি সাউথ আন্দামানের মত ছোট ছোট পাহাড়ময়। এখানকার মাটি তেমন উন্নত নয় বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তেরেসাবাসী অতিরিক্ত তাড়ির ভক্ত, অপদেবতার কাছে মানত প্রবণ, অদৃষ্টবাদী ও অলস। চৌরাবাসী অনেকে এসে এদের বাগিচায় কাজ করে। নারিকেল, পেঁপে, কলা ও লেবু ছাড়া অন্য কোন জিনিস ভাল হবে কিনা এখনও বলা কঠিন। নানকৌরী ট্রেডিং কোম্পানীর একটি ব্রাঞ্চ এখানে আছে। একটি প্রাথমিক স্কুল ও একটি ডিসপেনসারী আছে। তেরেসাবাসীর চুলের বেশভূষা দেখে মনে হয় একসময় দক্ষিণ ভারতের চোলদের প্রভাব এখানে যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল।

॥ কাচাল, কামোটা, নানকৌরী, ত্রিনকেট ॥

তেরেসায় জাহাজ ভিড়ার কোন জেটি নেই। চলার পথে জাহাজ ঘন্টাখানেকের জন্য নোঙ্গর ফেলে। তেরেসার দক্ষিণে একটু পূবঘেঁষে কাচাল দ্বীপ। সমভূমি ও ছোট পাহাড়ের সংমিশ্রণ। দেখে মনে হলো চুনা পাথরের আস্তরণ দেওয়া দ্বীপ। আয়তন ৬১ বর্গমাইল (১৭৪'৪ বর্গ কিঃ মিঃ)। লোকের বাস হাজার দুইয়ের মত। তার মধ্যে রাবার বোর্ড ও পি, ডবলু, ডির শ্রমিক হাজার খানেক। বাকী সব নিকোবরী। কাচালে একটি কংক্রিটের ছোট জেটি হয়ে গেছে। দিনের বেলায় জাহাজ এখানে ভিড়ে। সন্ধ্যার দিকে এখানে ভিড়ে না,আশপাশে প্রবাল রিফ্ আছে। তাই দুই আড়াই মাইল দূরে কাপাঙ্গায় গিয়ে দাঁড়ায়। কাপাঙ্গায় নানকৌরী ট্রেডিং কোম্পানীর একটি ব্রাঞ্চ আছে। কাচালবাসীর নেত্রী রানী 'ছাঙ্গা'র কিছুদিন আগে মৃত্যু হয়েছে। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হরি এখন দ্বীপের চিফ্ ক্যাপটেন। এরা কিছুদিন আগেও হিন্দু ভাবাপন্ন ছিল। এখন খৃষ্টান হয়ে গেছে।

কাচাল খুব সম্ভাবনা পূর্ণ দ্বীপ। বিশেষজ্ঞদের অভিমত এখানকার মাটি ভাল। ভারতসরকার এই দ্বীপে বৃহৎ আকারে রবার চাষের

পরিকল্পনা নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই রবার বোর্ডের পাকা আপিস হয়ে গিয়েছে। প্রথম রবার এষ্টেটে কিছু গাছও রোপন করা হয়েছে। রবার বোর্ডের পরিকল্পনা—কয়েক বছরের মধ্যে ছ'হাজার একরের তিনটি রবার এস্টেট খাড়া করা হবে। প্রতি এস্টেটে থাকবে দু'হাজার একর জমি। শ্রীলঙ্কার যেসকল দক্ষিণ ভারতীয়দের ভারতে ফিরিয়ে নিতে হবে তাদের এই দ্বীপে বসত দিয়ে রবার শিল্পের কাজে লাগানো হবে। আশা করা যাচ্ছে দু'হাজার লোকের এখানে কর্মসংস্থান হবে। রাস্তা ঘরদোর টাউনশিপ তৈরী করতে অনেক খরচা হবে। তবু বিশেষজ্ঞরা মনে করেন কয়েক বছর পর এ-থেকে সরকারের ভাল আয় হবে। তাঁরা মনে করেন—প্রথম বছর প্রতি একরে ২৫০ কেজি রবার পাওয়া যাবে এবং নবম বৎসরে গিয়ে সেটা ৬০০ কেজিতে দাঁড়াবে। মালয়েশিয়া থেকে উন্নত পদের অনেক রকম চারা এনে লাগানো হয়েছে। কোন্‌টা এই মাটিতে ও এই আবহাওয়ায় ভাল বৃদ্ধি পায় তার পরীক্ষা চালান হচ্ছে।

এখানে আর একটি গাছের সম্ভাবনাও প্রচুর বলে অনুমান করা হচ্ছে। নাইজেরিয়া থেকে রেড ওয়েল পামের বীজ এনে চারা করে লাগানো হয়েছে। গাছ যে হারে বেড়ে উঠেছে তা দেখে মনে হলো—এই মাটি ও জলহাওয়ায় খুব ভালই হবে। রেড ওয়েল পামের বীজ বনস্পতির প্রধান উপাদানরূপে কাজে লাগবে।

এখনও এ-দ্বীপের শতকরা ৮০ ভাগ জঙ্গলাকীর্ণ বনভুমি। বাদাম, সাদা চুগ্‌লাম, টউঙ্গপিনে ও মহুয়া গাছ বেশী দেখা যায়। বাঁশ ও বেতের গাছ নজরে পড়ে। নারিকেল সুপারি তো রয়েছেই। সম্প্রতি তৈরী হয়েছে কয়েক কিলোমিটার পাকা রাস্তা। রাস্তার পাশে রবার বোর্ডের আপিস, ছোট হাসপাতাল, শ্রমিক কোয়াটার, নতুন থানা, পোষ্ট আপিস নজরে পড়ে। শ্রমিক বস্তির পাশে কাপাঙ্গায়—রয়েছে একটি ছোট চার্চ, একটি শিবালয়।

কাচাল থেকে জাহাজ ছেড়ে দুই লম্বা দ্বীপের মাঝখানের সরু

চ্যানেল দিয়ে এগিয়ে চললো কামোটা নানকৌরীর দিকে। দু'দিকে পাহাড় ঘেরা সবুজ দ্বীপ। মাঝখানে সমুদ্রের লেগুন। তার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে জাহাজ এগিয়ে চলেছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। কাচাল থেকে কামোটা দেড় ঘণ্টার পথ। সব যাত্রী সমুদ্রের ডেকে এসে দাঁড়ায়। মনমুগ্ধকর দৃশ্য থেকে চোখ ফেরানো যায় না। চারদিক পাহাড়ে ঘেরা পশ্চিম প্রান্তের বিস্তীর্ণ সামুদ্রিক খাড়িতে এসে জাহাজ জেটিতে দাঁড়ালো। কামোটার জেটিও সম্পূর্ণ হয়েছে। অতিসুন্দর তিনদিক সংরক্ষিত এক স্বাভাবিক পোতাশ্রয়। কাচালের উত্তর-পূর্বে বিস্তৃত কামোটা বেশ বড় দ্বীপ। ১৮৮·২ বর্গ কিঃ মিটার আয়তন ; প্রায় দেড় হাজার লোকের বাস।

এখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের আপিস ও কোয়াটার আছে। নানকৌরী গ্রুপের সকল দ্বীপের উপর তাঁর প্রশাসনিক অধিকার। এখানে একটি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক আপিস, পোষ্ট আপিস ও একটি বেসিক স্কুল আছে। তাছাড়া, থানা, ওয়ারলেস সেণ্টার, মৎস বিভাগের আপিস রয়েছে। এখানে ভারত সরকার একটি নৌবহর রেখেছেন আই, এম্, এস কারদ্বীপ। ৩৭ বেডের বড় হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছে। ম্যালেরিয়া ও ফাইলেরিয়া রোগের প্রকোপ এ-অঞ্চলে খুব বেশী। উভয় রোগের অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের জন্য একদল ইনস্পেকটর নিযুক্ত আছেন। হাসপাতালে অসুস্থ রুগীকে বিনা খরচে পথ্য সরবরাহ করা হয়। জেটির অদূরে রাধাগোবিন্দের ছোট নিরালা মন্দিরটিও সুন্দর। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার জানালেন বিগ্রহ সেবার পুরোহিত মিলছে না। ভাল হিন্দু পুরোহিত দায়িত্ব নিলে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করবেন বলে ভরসা দিলেন। এতবড় দ্বীপে একটি মাত্র খাবার দোকান আছে যেখানে একমাত্র ইডলি ও লাল কফি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

মনে পড়ে গেল এই দ্বীপেই, হয়তো বা এই এলাকাতেই দু'শ

বছর আগে ১৭৬৯ সালে উপনিবেশ স্থাপন করতে দিনেমার ঘাঁটি করেছিল। খৃষ্টান মিশনারী এনেছিল। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে টিকতে পারেনি। এ-অঞ্চলে উপনিবেশ গড়বার আশা একেবারে ত্যাগ করে ১৮৪৮ সালে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত দ্বীপগুলো ইংরেজের হাতে তুলে দেয়। ইংরেজ অধিকার নিল বটে কিন্তু চোখমেলে তাকায়নি এ-দিকে। এখনও বড় বড় ক্যাস্যুয়ারিনা (Casuarina) গাছ দিনেমারের পদচিহ্নের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

খাড়ির একপ্রান্তে কামোটা জেটি, অপর প্রান্তে নানকৌরীর চাপলিন গ্রামের কাঠের জেটি। একখানি ছোট বোট এপার-ওপারে লোক ও ছাত্র পারাপার করে। এই গ্রামে নানকৌরীর নেত্রী রানী লক্ষ্মী বাস করেন। তিনি বৃদ্ধা; অতি সাদাসিধা জীবন-যাপন করেন। সুখ সম্ভোগের যোগান দিয়ে আকুজি তাঁকে কিনে রেখেছেন। নানকৌরী ট্রেডিং কোম্পানীর হেড কোয়াটার এখানে। নানারকম জিনিসপত্রের স্টক দেখলাম। টিপ্‌টপ্‌ সাজানো আপিস; অপূর্ব গেষ্ট হাউস। আশপাশের দ্বীপে সরবরাহ চলে এখান থেকে। নিজের বোটে মালপত্র যায়, পরের মুখাপেক্ষী হতে হয় না।

নানকৌরী কাচালের পূর্বে। ৬৬·৯ বর্গ কি: মিটার মাত্র আয়তন। লোকের বাস শ'সাতেক। চাপলিন গ্রামে একটি ছোট চার্চ আছে। একটি ইস্কুল আছে। কিছু কিছু ঘর নতুন প্যাটার্নে তৈরী হচ্ছে। দেখলাম এখানকার নিকোবরীদের জীবন যাত্রা স্টাডি করতে এসেছেন রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র ও অধ্যাপক। কষ্টকরে থেকে একমাস ধরে তথ্য সংগ্রহ করছেন।

এই পোতাশ্রয়ের পশ্চিম মুখ দিয়ে জাহাজ বেরিয়ে যায় গ্রেট নিকোবরের ক্যাম্বেল বের দিকে। অদূরে হাতের বাঁয়ে—পূব দিকে এক অপরূপ ছোট দ্বীপ ত্রিন্‌কেট। প্রবালে প্রবালে এ-দ্বীপের উপকূল ঘেরা। ফুলঝুড়ির মত অগণিত শাখা প্রশাখা বিস্তার করে

জমে জমে উঠেছে প্রবাল। জাহাজে যেতে যেতে বুঝলাম—প্রবাল দ্বীপ নিয়ে স্বপ্ন দেখা যায়, বাড়ি তোলা চলে না। ত্রিনকেটের আয়তন ৩৬'৩ বর্গ কিঃ মিটার। শ'দেড়েক মাত্র লোক এখানে সেখানে কয়েকটি ঝোপড়ি তুলে আছে। ত্রিন:কেটকে পিছনে ফেলে জাহাজ দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চললো। একরা:তর পথ। তারপর গ্রেট নিকোবর ও ক্যাম্বেল বে।

সকল দ্বীপেই রূপান্তরের হাওয়া লেগেছে স্বাধীনতার পর। এতদিনের অচলায়তন ধীরে ধীরে, কোথাও বা দ্রুত তালে অপসারিত হচ্ছে। সাগর জলে ভাসমান নিদ্রামগ্ন ভারতের শেষ ভূখণ্ডের সর্বত্র এখন ঘুম ভাঙ্গার আওয়াজ।

॥ গ্রেট্ নিকোবর ॥

বিশ্বের বনবিভাগের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ স্যার এইচ, জি, চাম্পিয়ন (Sir H. G. Champion) মন্তব্য করেছেন—"The forest in their pristine glory, if it is found anywhere in South-east Asia, it is in Andaman Islands." "বনের যদি আদিমতম সৌন্দর্য দেখতে হয় তবে যেতে হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়; সব জায়গায় নয়, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেই তার শুধু পরিচয় মিলে।" চাম্পিয়নের এই মন্তব্য আন্দামানের ক্ষেত্রে যতটা সত্য তার চেয়ে ঢের বেশী সত্য গ্রেট নিকোবরের ক্ষেত্রে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবুজ ও আদিম অরণ্য দেখতে হলে এই দ্বীপে আসতে হবে। যেমন দাঁড়িয়ে রয়েছে ১০০/১৫০ ফুট লম্বা লম্বা গাছ, তেমনি তলায় ঘন ঠাসা লতাগুল্মের দুর্ভেদ্য বনজঙ্গল। পাহাড়ী দ্বীপে ঢেউ খেলান অনন্ত সবুজের মেলা। লিটল আন্দামান—কাচাল তেরেসার মত এ-দ্বীপ সমভূমি নয়। আন্দামানের মত পাহাড় ও উপত্যকার লীলায়িত ঢেউ খেলান বনরাজি। এখানকার পাহাড়গুলো তুলনায় উঁচু, উপত্যকাগুলো অনেক প্রসারিত। সবচেয়ে বড় চূড়া—মাউন্ট থুলিয়ের (Mount

Thulier) উচ্চতা ২১০৫ ফিট। নিকোবরের অন্যান্য দ্বীপে ছোটখাটো জলধারা বা নালা আছে। এখানেই একমাত্র মিঠা জলের নদী আছে। পূব-পশ্চিমে প্রবাহিত বার মাস জল থাকে এমন একাধিক নদীর সন্ধান মিলেছে। "গালাথিয়া", "আলেকজানড্রা" ও "ডাগমার" নামকরা নদী। কোন কোন জায়গায় এদের গভীরতা ১৪/১৫ ফিট পাওয়া গেছে।

কোথাও প্রবাল মিশানো পীতবর্ণের মাটি, চুনাপাথর ভাঙ্গা মাটি, আবার কোথাও শক্ত কাল পাথর। সমুদ্রের নীলজল এর উপকূলে ডোবা পাথরের গায়ে দিনরাত আছাড় খেয়ে পড়ছে। তারই গা ঘেঁষে অনন্ত সবুজের মেলা। একটু বৃষ্টির জল পেলেই এখানকার মাটি কাদাকাদা হয়ে যায়; অল্প রোদেই শক্ত হয়ে উঠে। মনে হলো গ্রেট নিকোবরের মাটি অপেক্ষাকৃত সরু, আন্দামানের মাটি মোটা! দীর্ঘ দিনের ঝরা লতাপাতা-পচা মাটি খুব উর্বরা। নাইট্রোজেন ফস্‌ফরাস যথেষ্ট আছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত—পটাশের পরিমাণ কম।

গ্রেট নিকোবরে বৃষ্টির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। বৎসরে গড় বৃষ্টিপাত ১২০ ইঞ্চি (৩০০ মিঃ মিঃ)। বেশী সময় মেঘমুক্ত আকাশ পাওয়াই যায় না। প্রায় দিনই একটু আধটু বৃষ্টি হয়। নিকোবর দ্বীপমালার দক্ষিণতম প্রান্তে গ্রেট্ নিকোবর। অন্যান্য সব কটি দ্বীপ মিলে যে আয়তন এই দ্বীপের আয়তন তার সমান। ১০৪৫·১ বর্গ কিঃ মিটার। এর মাথার দিকে লিট্‌ল নিকোবর। ১৫৯·১ বর্গ কিঃ মিটার আয়তন। শ'দুই লোকের বাস। এই দুই দ্বীপের গায়ে গায়ে ছোট্ট দুই দ্বীপ—কণ্ডুল ও পিলোমিলো; যেন যমজ দুই বোন। একটির আয়তন ৪·৬ বর্গ কিঃ মিটার, আর একটি মাত্র ১·৩ বর্গ কিঃ মিটার। কণ্ডুলে শোয়াশ আর পিলোমিলোতে শতখানেক মাত্র লোকের বাস। মুষ্টিমেয় শম্‌পেন ও গুটিকতক নিকোবরী ছাড়া এই সেদিন পর্যন্ত এখানে কোন সভ্যমানুষের বাস

ছিলনা। বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যের মধ্যাহ্ন সূর্যের দিনেও ইংরেজ এখানে তার আধিপত্য বিস্তারের কোন চিহ্ন রাখেনি! ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্তও এটা ছিল পরিত্যক্ত দ্বীপ। এর বক্ষে কত সম্পদ আছে, ভবিষ্যতের কত সম্ভাবনা এখানে লুকানো আছে তা এখনও উদ্ঘাটিত হয়নি।

এ-দ্বীপের পূবপ্রান্তে ক্যাম্পবেল বেতে এসে সকালে জাহাজ দাঁড়ালো। কনক্রিটের জেটি এখনও অর্ধসমাপ্ত দেখেছি। জাহাজকে অদূরে নোঙ্গর ফেলতে হয়। সম্ভবতঃ জেটিতেই ভিড়ছে। ক্যাম্পবেল বের তিন দিক এই দ্বীপের সীমানা দিয়ে ঘেরা। প্রাকৃতিক সংরক্ষিত হওয়ার ফলে একটি স্বাভাবিক সুন্দর পোতাশ্রয় গড়ে উঠছে। প্রায় ১ কিঃ মিঃ চমৎকার বালুকাময় বেলাভূমি। এই পোতাশ্রয়কে কেন্দ্র করে নতুন টাউনশিপ গড়ে উঠছে। বিভিন্ন সরকারী বিভাগের উন্নয়ন মূলক কাজ পরিচালিত হচ্ছে এখান থেকে। এই পোতাশ্রয় থেকে পোর্ট ব্লেয়ারের দূরত্ব ৫৩০ কিঃ মিটার; কলিকাতার দূরত্ব ১৭০৫ কিঃ মিটার; মাদ্রাজের দূরত্ব ১২৪০ কিঃ মিটার, আর সুমাত্রার দূরত্ব মাত্র ১৪৫ কিঃ মিটার।

ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত এই দ্বীপের গুরুত্ব যে অত্যন্ত বেশী ভারত সরকার তা উপলব্ধি করেছেন। সর্বভারতীয় বর্ডার রোড অরগানিজেশনের "ইয়াট্রিক" (yatrik) শাখা এখানে পাকা রাস্তা তৈরীর দায়িত্ব নিয়েছে। ইতিমধ্যেই ক্যাম্পবেল বে থেকে ওয়েষ্ট কোষ্ট পর্যন্ত ৪৭ কিঃ মিটার সুন্দর পাকা রাস্তা সমুদ্রের কিনারা বরাবর পাহাড় কেটে তৈরী হয়ে গেছে। গত ডিসেম্বর মাস হ'তে এই পথে স্টেট-ট্র্যানস্পোর্ট সার্ভিসের একখানা বাস চালান হচ্ছে। ক্যাম্পবেল বে হ'তে হরমন্দর গড় পর্যন্ত—২৪ কিঃ মিটার যাওয়া-আসা করছে। ভারত সরকারের **Rehabilitations Reclamation Organisation** এর দুইটি ইউনিট বড় বড় ডোজার দিয়ে বিরাট বিরাট গাছ উপড়ে ফেলে জঙ্গল সাফ করে দিচ্ছে।

পুনর্বাসনের স্থান তৈরী করা হচ্ছে। বনবিভাগ প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় গাছের শ্রেণীবিন্যাস করছে। অপ্রয়োজনীয় গাছ কেটে সেগুনগাছ লাগাবার চেষ্টা চলছে। রাস্তার পাশে পাশে একদিকে রাঁচির উপজাতি ও তামিল কেরলের শ্রমিকদের ছাউনি, আর একদিকে পুনর্বাসের বসতবাড়ি; মাঝে মাঝে রিসেপশন ক্যাম্প।

পুনর্বাসনের প্রস্তুতি পর্বের জন্য এ-যাবৎ ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ১০৪½ লক্ষ টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা আছে। ক্যাম্পবেল বে থেকে দক্ষিণে পিগমালিয়ন পয়েন্ট পর্যন্ত ৫৪ কি. মিটার আর একটি পাকা রাস্তার কাজ স্থুরু হয়ে গেছে। সাউথ বের এই পিগমালিয়ান পয়েন্টে ২।৩ বছর আগে একটি লাইট হাউস স্থাপিত হয়েছে। মালাক্কা প্রণালী দিয়ে পৃথিবীর যত জাহাজ মালয়, স্থমাত্রা, জাভা, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, চীন, ফরমোজা, জাপানের দিকে যায় অথবা ঐদিক থেকে ফিরে আসে ভারতের এই লাইট হাউস তাদের নমস্কার জানায়।

এই দ্বীপে অবসর প্রাপ্ত সৈনিকদের পুনর্বাসন দিবার পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন। ১৯৩০ সালে ১ম ও ২য় ব্যাচে একশত পাঞ্জাবী পরিবার আনা হয়। তাদের বাড়ীতে স্থন্দর স্থন্দর পেঁপে, কলা, নারিকেল ও সব্জীর গাছ দেখেছি। মোষ ও মুরগী প্রায় সবারই আছে। এখানকার জলবায়ু মোষের উপযোগী। গরুর পক্ষে হয়তো ততটা ভাল হবে না। সরকারী তরফ থেকে গরু না দিয়ে মোষ দেওয়া হয়েছে। বছরখানেক আগে বিভিন্ন স্টেট থেকে আরো ১৪০টি পরিবার আনা হয়েছে। প্রায় সকলেই এখনও রিসেপশন ক্যাম্পে আছেন। তামিলনাড়ু থেকে এসেছে ৪৭, কেরলা থেকে ১৫, করনাটক থেকে ৯, অন্ধ্র থেকে ৫, মহারাষ্ট্র থেকে ৪০, উত্তরপ্রদেশ থেকে ২৪ —এই ১৪০ টি পরিবারকে সত্বরই পুনর্বাসন দেওয়া হবে। প্রত্যেকে রাস্তার ধারে ১ একর বসতবাড়ির জমি পাবে। একটু দূরে

উপত্যকায় ধানীজমি পাবে ৫ একর এবং বাগিচার জন্য পাহাড়ের গায়ে পাবে ৫একর। মোট ১১ একর জমি পরিবার পিছু থাকবে। তাছাড়া গৃহ নির্মাণ, তিন বছরের রেশন, চাষোপযোগী ক'রে তোলার ব্যয়, গৃহের আসবাবপত্র ও রাসায়নিক সার বাবদ প্রতি পরিবারকে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে ১৭,'৫০ টাকা। ট্রাকটার দিয়ে প্রথম বছর চাষ করতে গিয়ে নানা রকম বিপত্তি ঘটেছে। শুনলাম সরকার স্থির করেছেন চাষকাজে সাহায্যের জন্য পরিবার পিছু একজোড়া করে মোষ দেওয়া হবে। গত বর্ষায় সকলেই ভাল ধান পেয়েছে। দেখেছি যারা এখনও ক্যাম্পে আছে বসত বাড়ির জমি পায়নি তারাও নিজ খেতান জমির ধান শুকোচ্ছে। সকলেই খুশি, কারো তেমন কোন অভিযোগ নেই। প্রত্যেকটি পুনর্বাসন ক্যাম্পে একটি করে প্রাথমিক ইস্কুল খোলা হয়েছে; সবসময় দরকার এমন কিছু ওষুধপত্র দিয়ে একটি ছোট ডিস্‌পেনসরীও চালু করা হয়েছে। স্বল্পকালীন প্রাথমিক হেলথ ট্রেনিং প্রাপ্ত কয়েকজন তরুণ দেখলাম বিভিন্ন ক্যাম্পে নিযুক্ত আছে। সকলেই বাঙ্গালী। ভারতের প্রায় সকল রাজ্যের লোকের সমাবেশে দীর্ঘদিনের এই ঘুমন্ত দ্বীপটি জেগে উঠছে। আরো ২৬০টি পরিবার শুনলাম অল্পদিন মধ্যেই এসে যাবে। হয়তো এতদিনে এসেই গেছে।

ক্যাম্পবেল বে-তে ইয়াত্রিকের বেশ বড় আপিস ও হাসপাতাল আছে। অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনারের (পুনর্বাসন) আপিস এখানে। একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দশবেডের একটি হাসপাতাল, টেলিগ্রামের সুবিধাসহ সাব পোষ্টাপিস, পুলিশ স্টেশন, ছোট পাওয়ার হাউস, সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ আপিস রয়েছে। তাছাড়া পি, ডবলু, ডি, আপিস, আর, আর, ও, আপিস, ফরেষ্ট আপিস, সাপ্লাই স্টোর ও ফিশারী আপিস আছে এখানে। ক্যাম্পবেল বে একটা ছোট টাউনশিপে পরিণত হ'তে চলেছে। শিখরা ইতিমধ্যেই একটি গুরুদোয়ারা স্থাপন করেছে। হিন্দুরা রাধাগোবিন্দের মূর্তি

স্থাপন ক'রে নিত্য পূজা আরতির ব্যবস্থা করেছে। এখানে বিভিন্ন বিভাগে বেশ কয়েকজন বাঙ্গালী কর্মচারী আছেন। তাঁরা সরস্বতীপূজা, দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা সবই করেন। একটি ছোট ক্লাবও খুলেছেন। দেশের মধ্যে স্বজাতি প্রীতি না থাকলেও বিদেশে বাঙ্গালী নিজ ভাষার লোক পেলে আপ্যায়ন করেন। ইয়াত্রিকের বাঙ্গালী স্টাফের কাছে যথেষ্ট আন্তরিকতা পেয়েছি।

গ্রেট নিকোবরের উপকূলে জলের তলায় এক ধরণের লতা দেখেছি। শুনেছি এগুলো সামুদ্রিক মাছের নাকি খুব প্রিয় খাদ্য। গ্রেট নিকোবর, লিটল নিকোবর, নানকৌরী, কামোটা, কাচাল দরিয়ায় সমুদ্রের স্রোতে মাছের খাদ্য যথেষ্ট ভেসে আসে। তাই এই সব অঞ্চল জুড়ে নানাজাতের মাছ দল বেঁধে আনাগোনা করে। হয়তো এই কারণেই ইন্দোনেশিয়া, ফরমোজা, থাইল্যাণ্ড থেকে এই এলাকায় ছোট ছোট বোটে মাছ ধরতে আসা দীর্ঘদিনের রেওয়াজ। এতদিন কেউ বাধা দেয়নি। এখন ভারতসরকারের জল পুলিশ এটা রোধ করার জন্য টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। দেখলাম ৪।৫টি বিদেশী ছোট বোট আটক করা হয়েছে এবং প্রায় ৭০।৮০ জনকে বন্দী ক'রে পোর্ট-ব্লেয়ারের সেলুলার জেলে চালান দেওয়া হচ্ছে। এদের বোটে শুধু মাছ ভর্তি ছিল। সার্ডিন, ম্যাকেরেল, তুনা, মুলেট, পম্‌ফ্রেট, লোবসার্টস মাছ পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে অক্টোপাসেরও সন্ধান মিলে। একটু দূরে গেলে শার্ক মাছও ধরা পড়ে। আমাদের দরিয়ায় মাছ ধরতে আসার জন্য প্রতিবেশী দেশের লোকদের বন্দী করছি, হয়তো বিচারে জেলও হবে। আর আমাদের মৎসবিভাগ কেবল বিচার ও গবেষণা চালাচ্ছেন এ-সব এলাকায় মানুষের আহারযোগ্য মাছ আছে কিনা। অজস্র টাকা ব্যয় করে কিছু অপদার্থ লোকের পেছনে অর্থের অপচয় করা হচ্ছে। মৎস বিভাগের কাজের নমুনায় সর্বত্র বিরূপ মনোভাব দেখেছি। অথচ এই এলাকায় মৎস শিল্পের এক বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে।

শার্কলিভার ওয়েল তৈরী-হতে পারে। টিন-ফিস চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। টাটকা তাজা মাছ মেনল্যাণ্ডের বাজারে তোলা যেতে পারে। কত সম্ভাবনা আছে এই মাছ নিয়ে! মৎস বিভাগ উল্লেখ যোগ্য কোন কাজই করছে না।

ক্যাম্পবেল বে-তে সব জিনিসের দাম আগুন। দাম শুনলে আমাদের পিলে চমকে যাবে। চাল ডাল চিনি গম রেশনে মিলে। বাকিসব অগ্নিমূল্য। মোষের দুধের লিটার তিন টাকা। একটি ছোট মুরগী ২৫।৩০ টাকা, একটি ডিম ১ টাকা। আলুর কিলো তিন চার টাকার মধ্যে ওঠানামা করে। আলু পেঁয়াজ চালান আসে, আন্দামান-নিকোবরে কোথাও হয় না। সব্জীর মধ্যে পেঁপে, লোবিয়া (বরবটি), কাঁচকলা কিছুটা আয়ত্তের মধ্যে।

এখানে ধান ও কলাই ভাল হবে সন্দেহ নেই। ভুট্টাও হবে বলে মনে হয়। পেঁপে, কলা, নারিকেল, সুপারি পর্যাপ্ত হবে। তাছাড়া কমলা, মোসাম্বী, পাতিলেবু ভাল হবার সম্ভাবনা। কৃষিবিশেষজ্ঞদের অভিমত—লবঙ্গ, গোলমরিচ, জায়ফল, দারুচিনি এখানকার মাটিতে ও জল হাওয়ায় খুব ভাল হবে।

নিকোবরের অন্যান্য দ্বীপে পথ চলতে পাখীর কাকলি কানে তেমন আসেনি। কিন্তু এ-দ্বীপের অরণ্য পথে নিঝুম রাস্তায় যখন চলেছি নানারকম পাখীর কণ্ঠস্বর বনের মধ্য থেকে ভেসে এসেছে। মশার উপদ্রব সর্বত্র। অন্ধকার বনভূমির মধ্যে দিনের বেলাতেই মশা ভন্ ভন্ করে। হয়তো এই কারণেই ম্যালেরিয়া ও ফাইলেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। লোকবসতি যেখানে কম সেখানেই পোকামাকড়, গোসাপ, ময়ালসাপ খুব বেশী। আন্দামান-নিকোবরে কোথাও সাপের বিষ মারাত্মক নয়। এখানকার সাপের কামড়ে মৃত্যু হয় না। গভীর জঙ্গলে অনেক বানর আছে। যারা চাষ আবাদ স্থরু করেছে তাদের সকলের মুখেই এক কথা—ধান ও ভুট্টার গাছে শিষ আসার সাথে সাথেই ঝাঁকে ঝাঁকে বানর এসে শস্য নষ্ট

করতে থাকে। দিনরাত পাহারা না দিলে ফসল ঘরে তোলা যায় না। প্রায় সবগুলি নদীর মোহানায় ও সমুদ্রের ক্রিকে বহু কুমির বাস করে।

দীর্ঘদিন প্রায় মনুষ্যহীন থাকার ফলে এবং গভীর অরণ্যময় হওয়ায় এখানে বড় বড় গাছের সংখ্যা প্রচুর। যত্রতত্র বড় বড় গাছের গুড়ি পড়ে আছে। কাঠের যেন এখানে কোন মূল্য নেই। আমরা এক টুকরো কাঠ সংগ্রহ করতে কত চেষ্টা করি। লোক-বসতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরদোর গড়বার প্রয়োজন দেখা দিবে। তখন কাঠের চাহিদাও বেড়ে উঠবে। এখনও কোন স-মিল (Saw Mill) বসেনি। যত্ন নিলে ভাল যাতের টিক্‌উড্‌ এখানে হবার সম্ভাবনা আছে বলে অনেকে মনে করেন।

॥ শম্‌পেন ॥ এ-দ্বীপের সমুদ্র উপকূলে অরণ্যের মধ্যে বাসকরে আর একদল আদিম জাতি। এরা শম্‌পেন নামে পরিচিত। পূর্ব-প্রান্তে ৪।৫ মাইল ফাঁকে ফাঁকে এক একটি বের পাশে অদ্ভুত নামের গ্রাম—যেমন "লাফুল" "এওয়ে" "বাতাতাস্থ" "নামদিন" ইত্যাদি। এইসব গ্রামে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বাস করে শম্‌পেন। পশ্চিম উপকূলের পিলোভাবির মাইল ১৫ দূরে "রাকারাজ" "ধাগারে" "চুবা" "কুওয়া" ও "রাপাঙ্গ" অঞ্চলে কিছু শম্‌পেনের বাস আছে। দক্ষিণ প্রান্তের লাইট হাউসের কাছাকাছি 'মাতাইতা আন্‌লা' ও 'নারিয়েল নেক্‌রি'র মাঝখানে শম্‌পেন দেখতে পাওয়া যায়। গ্রেট নিকোবরের মাউন্ট থুলিয়ের মাথায় সামান্য কিছু শম্‌পেনের বসবাস আছে। পারাবত দ্বীপের (Pigeon Island) গায়ে যেসব শম্‌পেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তারা "বদমাস্‌" শম্‌পেন নামে পরিচিত। প্রায় একহাজার ফুট উঁচু মহারানী পিকে ঝাঁকে ঝাঁকে পারাবত বিশ্রামসুখ ভোগ করে বলে একে পারাবত দ্বীপ বলা হয়ে থাকে।

শম্‌পেনদের চেহারা নিকোবরীদের মতই বলিষ্ঠ ও সুগঠিত।

রোদে পোড়া মালয়বাসীর গায়ের রং। অনেকটা তামাটে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। দাড়ি গোঁফ নেই। হঠাৎ দেখলে নারী পুরুষ ঠাহর করা যায় না। পুরুষ মেয়ে উভয়েই কানের লতা ফুটো ক'রে প্রায় একইঞ্চি পুরু কাঠি ঢুকিয়ে রাখে। দিনরাত সুপারি চিবায় আর সুখার (তামাক পাতা) সন্ধান করে। বিড়ি পেলে খুব খুশি। কণ্ডুল দ্বীপে নানকৌরী ট্রেডিং কোম্পানীর একটি গুদাম ও ব্রাঞ্চ আছে। কণ্ডুলের নিকোবরীরা এই অঞ্চলের শম্পেনদের কাছ থেকে সুপারি, মধু ও নারিকেল যোগাড় করে কোম্পানীর গুদামে জমা দেয় এবং সেখান থেকে কাপড়, লোহার হাতিয়ার, তামাকপাতা সরবরাহ করে। এই আদান প্রদানে নিকোবরীরা এদেরকে ভয়ানক ঠকায়। তাই ওরা মাঝে মাঝে ক্যাম্পবেল বেতে অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনারের আপিসে মধু ও সুপারি নিয়ে হাজির হয়।

শম্পেনগণ প্রধানত সমুদ্রে মাছ ধরে। সকলেই শুকর পুষে। মাছ, শুকর মাংস ও কেওড়া ফল (Pandanus) খেয়ে জীবন ধারণ করে। যেখানে প্যাণ্ডানাস গাছ বেশী দেখা যায় তার আশপাশেই শম্পেন ঘর তোলে। এটা ওদের প্রধান খাদ্য। প্রথমত ফলগুলো চাকা চাকা ক'রে কেটে ঘণ্টা আটেক জলে সিদ্ধ করে। তারপর নরম অংশ ঝিনুক দিয়ে কুরে নেয়। ময়দার মত মাখে। এই মথা দলা পাতা দিয়ে জড়িয়ে আগুনের তাপে ঝলসায়। এবার খাওয়ার মত হয়। ওরা সকলে মিলে ক'দিন ধরে খায়। মাছ, শুকর ও কচ্ছপ মাংস দিয়ে এই কেওড়া ফল খেতে ওরা খুব ভালবাসে। গাছের পুরু বাকল দিয়ে কড়াই বানায়। তাতে জল দিয়ে কখনও মাছ সিদ্ধ করে নেয়, কখনও বা শুধু ঝলসিয়ে নিয়ে খায়। আবার কখনও লতাপাতায় মাছ জড়িয়ে একটু গর্ত করে মাটি চাপা দিয়ে তার উপর আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ঘণ্টাখানেক আগুনের তাপে রেখে তুলে নেয়। অনেক সময় শুকর ও কচ্ছপ মাংসও এইভাবে খায়। লবণ ও মশলার ব্যবহার এখনও জানে না।

আগে ওরা বর্শা ছুঁড়ে মাছ ধরতো। এখন সুতোর মাথায় বড়শি বেঁধে মাছ ধরে। কেরোসিন বা ডিজেলের বড় ড্রাম অর্ধেক ক'রে কেটে ওদের মধ্যে পাঠানো হচ্ছে। এতে প্যাণ্ডানাস সিদ্ধ করতে সুবিধা হয়। লোহার বড় কড়াই বা অ্যালুমিনিয়মের বড় ডেগ পেলে ওরা খুব উপকৃত হবে। দা কুড়ুল হাতুড়ি বর্শা ওদের জীবিকা নির্বাহের বিশেষ প্রয়োজনীয় হাতিয়ার।

শম্পেনরা চাষকাজ জানে না। কার-নিকোবরীদের মত নারিকেল সুপারির বাগিচা করতেও অভ্যস্ত নয়। ওরা নিজেদের ঝুপড়ির চারদিকে এলোমেলো ভাবে তামাক গাছ, সুপারি গাছ, কেওড়া গাছ ও এ-দেশী মিষ্টি ওলের (yams) গাছ আজকাল কেউ কেউ লাগাচ্ছে। নিকোবরী গ্রাম সেবকের মাধ্যমে কলা, পেঁপে, ওলমান, মিষ্টি আলু লাগানোর দিকে ঝোঁক আনার চেষ্টা চলছে। দু'একজন মজুর সঙ্গে নিয়ে—গাছের ছোট চারা ও বীজ ওদের বাড়ির আশপাশে পুঁতে দিয়ে আসতে হবে। ওরা গাছের বাড় দেখবে, ফল দেখবে, ফল পেড়ে খাবে ; তারপর হয়তো এদিকে আগ্রহ দেখা দিবে। তামাকপাতা ও সুপারির চাষ প্রথম সুরু করা মন্দ নয়। সমষ্টি উন্নয়নের কর্মী ও অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার এ বিষয়ে কতটা ভাবছেন জানি না।

শম্পেনরা এখনও অর্ধ-যাযাবর। ঘরে কোন মৃত্যু ঘটলে সেই স্থান পরিত্যাগ ক'রে চলে যায়। ইদানীং দেখা যাচ্ছে যেখানে ওরা কিছু গাছটাছ লাগিয়েছে সেখানে মৃত্যু ঘটলে কয়েকদিনের জন্য স্থানান্তরে যায় বটে, আবার ফিরে আসে। নিকোবরীদের মত উঁচু মাচার উপরে ঘর তুলে। মাচার নীচে শুকর থাকে। উপরে নিজেরা ঘুমায়। ঘরের মধ্যেই কাঁচা শুকর মাংস, শুকনো মাছ রাখে বলে ঘরে দারুণ দুর্গন্ধ। ওরা বড় বেশী চর্মরোগে ভুগে। অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলে। খাবার স্নানকরার ঘুমুবার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। পাতাসহ সুপারি, তামাক পাতা ও চুণ

সদাসর্বদা মুখে রাখে। কিছু সময় পর পর থুথু ফেলে। নিকোবরীদের মত নারী পুরুষ উভয়েই ধূমপান করে।

শম্‌পেন পুরুষ পিছনে লেজের মত ঝুলিয়ে নেংটি পরে। মেয়েরা গাছের বাকল ও পাতা দিয়ে বানান পেটিকোট পরে। উর্দ্ধ-অঙ্গ খালি-রাখে। শাড়ী দিলে কেটে পেটিকোট বানিয়ে নেয়। সরু শাড়ী পছন্দ করে না; মোটা শাড়ী চায়। গলায় পুঁতির মালা পরতে ভালবাসে। লোহার বালা পেলে হাতে দিয়ে আনন্দবোধ করে। মেয়েরা স্বভাবত লাজুক। নিকোবরী মেয়েদের মত স্বচ্ছন্দ বিচরণ করা পছন্দ করে না। নিজ গ্রামের বাইরে কোথাও বেরুতে হলে লাল কাপড়ের টুকরো, বিশেষ কোন গাছের লতাপাতা গলায় ঝুলিয়ে তবে বাইরে যায়। এই 'বাবুই' গলায় থাকলে ভূতপ্রেত শয়তান দৃষ্টি দিতে পারবে না।

এতবড় দ্বীপের গভীর অরণ্যে বিভিন্ন এলাকায় মুষ্টিমেয় শম্‌পেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পূর্ব প্রান্তে যারা বাস করে তাদের সঙ্গে পশ্চিম প্রান্তে শম্‌পেনদের কোন পরিচয় ও যোগাযোগ নেই। আবার পশ্চিম উপকূলের শম্‌পেনদের সঙ্গে দক্ষিণ প্রান্তের শম্‌পেনের কোন সংযোগ নেই। এই বিচ্ছিন্নতার ফলে বিবাহযোগ্য ছেলে ও মেয়ের বিবাহে অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। বিধবারা সবসময় বিবাহে আগ্রহী, কিন্তু অনেক সময় নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে পাত্র মিলে না। বিভিন্ন দলের মধ্যে যোগাযোগ ও আদান প্রদান ঘটাতে পারলে মনে হয় এ-সমস্যার অনেকটা সুরাহা হতে পারে। নারীর সতীত্বের উপরে এরা বিশেষ গুরুত্ব দেয়। বিবাহের পর বরকনে একেবারে পৃথক ঝুপড়ীতে গিয়ে বসবাস করে। নিকোবরীদের মত বড় হাটমেণ্টে একাধিক স্বামী স্ত্রী রাত্রি যাপন করে না। এদের উৎসব বর্জিত বিবাহ। বর কনের মধ্যে ভাব হলে মা বাবার মত নিয়ে বিয়ে করে।

শম্‌পেন ভাষায় বুহা মানে ক্যাপ্টেন; গ্রাম-প্রধান "কেখে" হলো—ভাইস ক্যাপ্টেন অর্থাৎ উপ-প্রধান। পরিবারের কর্তাকে বলে "তান দিন", কখন বা বলে "আ কেওন"। এক এক অঞ্চলে

এক এক নাম। যখন ওদের কোন লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন গ্রামের বৃদ্ধ নেতা "বিশউ" বা 'বুহা'কে ডাকা হয়। তিনি সুপারি গাছের পাতা দিয়ে রুগীর ঘরের একটা অংশ ঢেকে ফেলেন। সেখানে বসে 'বিশউ' সারারাত ধরে হাততালি দিয়ে গান করেন। এই ভাবে "আচাওয়া"কে আবেদন জানান। 'আচাওয়া' অশরীরী শক্তিমান পুরুষ। রোগ আরোগ্যের এই প্রার্থনাকে ওরা বলে "শেও"। পরদিন সকালে 'বিশউ' কতকগুলি শিকড় ও পাতা দিয়ে ওষুধ তৈরী করেন এবং লতাপাতায় তৈরী ঝাঁটা রুগীর হাতে দেন। ওদের বিশ্বাস এই ঝাঁটা দিয়ে রুগীর ঘর ঝাঁট দিলে ভুত প্রেত ও অপদেবতা "বাবুই" সে ঘর থেকে কোন কিছু নিতে পারে না। রুগী এর খপ্পর থেকে বেঁচে উঠে। এরা মৃতদেহ কবরস্থ করে। কবরদানের কাজে যারা উপস্থিত থাকে তাদের শুকর মাংস দিয়ে ভোজ দিতে হয়। মৃতের বিধবা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সারাদিন নাচ ও গান করে।

ক্যাম্পবেল বেতে আসা যাওয়ায় ওদের পুরাতন সংস্কারের ক্রমশ বদল হচ্ছে। সরকারী কাজকর্মের বহর দেখে ওদের মনে শঙ্কা জাগছে। ওদের মুলুক দখল করে নেওয়ার চেষ্টা চলছে এই ওদের ধারণা। একটা অবিশ্বাস ও ভীতির ভাব দানা বেঁধে উঠেছে। শম্পেনরা খুব কম কথা বলে। সুন্দর ক্যানু তৈরী করতে পারে। নিকোবরীদের সঙ্গে এদের ভাষার পার্থক্য থাকলেও মনে হয় যেন একটা মিলও রয়েছে।

আধুনিক যুগের বিনিময় মাধ্যম টাকা পয়সা নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না বা কোন তোয়াক্কা করে না। প্রধানত মধু ও সুপারি বিনিময় ক'রে দা, কাটারি, তীর, বর্শার ফলা, কাপড় চোপড় সংগ্রহ করে। নিকোবরীরা দীর্ঘদিন ধরে ওদের ঠকাতো। জলের দরে ওদের কষ্টলব্ধ মধু কিনে নিত। শ্রীসাধন রাহা এখানে যখন অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার ছিলেন এদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছেন। জীবন সংশয় ক'রে তিনি ওদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন

করেন। ওদের মধু ন্যায়সঙ্গত দামে কিনে নিয়েছেন। ওদের বাসস্থান, জীবন সমস্যা সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ ক'রে কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। ভারত সরকারের প্রতি আস্থার ভাব ফিরিয়ে এনেছেন। সরকারী কেন্দ্র পেলে এখন ওরা আর অন্য কারো কাছে জিনিস বদল করে না। এদিক থেকে সাধনবাবুর ·াজ খুবই প্রশংসনীয়।

'পথে প্রবাসে' বইতে ইউরোপীয়দের সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় ইউরোপবাসীদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—'খাটো খেলো আর খাও'—এই হচ্ছে এদের ত্রি-নীতি। নিকোবরীদের এখনও দ্বি-নীতি—খেলো আর খাও। ইউরোপীয়দের মত ওরা 'প্রকৃতির স্তনে দাঁত বসিয়ে' জীবন ধারণ করে না। প্রকৃতির কোলে বিচরণ ক'রে খায়। ভুবনের ঐশ্বর্য নিকোবরে আহৃত হয়নি। বরং ঐশ্বর্য-বিহীন দেশ এটা। সেখানে উন্মুক্ত আকাশ আছে; নির্মল বায়ু আছে; দীর্ঘস্থায়ী সূর্য আছে; আর আছে চন্দ্রের অপর্য্যাপ্ত সুধা! আমাদের মত বাহুল্য আহার নেই, খাদ্য চিন্তাও নেই। অপর্য্যাপ্ত নারিকেল আছে। তাদের আতিথেয়তা আছে। চাঁদের জ্যোৎস্নায় করে উৎসব, করে খেলা। দিনে পড়ে পড়ে ঘুমায় ও বেড়িয়ে বেড়ায়। চুরি ডাকাতির কোন বাসনা নেই। তারা সৎ। সত্যকথা বলায় কোন ভীতি নেই। তারা সত্যবাদী। পোষাক পরিচ্ছদে নিরাসক্ত। অনেকটা অর্ধনগ্ন। ভুত প্রেতের প্রতি প্রবল বিশ্বাস। অসুখ-বিসুখ হলে তাদের কাছে আবেদন জানায়; ঝড় তুফানে তাদের ডাকে; বিয়ে-শাদীতে তাদের সাক্ষী রাখে।

অবশ্য এই সংস্কার ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক মানুষ ক্রমশ আধুনিক সামাজিক মানুষ হয়ে উঠছে। যাযাবরতা পরিত্যাগ ক'রে কৃষিতে হাত লাগাচ্ছে। শিক্ষার দিকে আগ্রহ প্রকাশ করছে। আহারে পোষাকে পরিবর্তন আনছে। জমির চাহিদা বাড়ছে। হাসপাতালে যাবার অভ্যাস গড়ে উঠছে। নিকোবরীদের বিশেষত কার-নিকোবরীদের মধ্যে এই পরিবর্তনের আভাস সুস্পষ্ট।

কথাশেষ

নর্থ আন্দামানের মাথায় এরিয়াল বে থেকে গ্রেটনিকোবরের ক্যাম্পবেল বে পর্যন্ত বিভিন্ন দ্বীপে ঘুরে অনুভব করেছি দীর্ঘদিনের ঘুমন্ত দ্বীপপুঞ্জ এবার জেগে উঠছে। লোকালয়হীন অঞ্চল নবাগত মানুষের পদচারণায় নতুন কলেবর ধারণ করছে। যে বনরাজী এখানকার অপরূপ সৌন্দর্য এবং শ্রেষ্ঠ সম্পদ তা নির্বিবাদে কেটে ফেলা হচ্ছে। আশংকা হয় এই ধ্বংসসাধন একদিন অভিশাপ রূপে মানুষের দুঃখের কারণ হয়ে দেখা দিবে না তো! উন্নত জাতের বৃক্ষরোপণের কাগজী প্রোগ্রামের সঙ্গে বাস্তব চিত্রের মিল পাইনি। দক্ষিণ আন্দামানের পোর্টব্লেয়ার হ'তে উত্তর আন্দামানের ডিগ্‌লীপুর পর্যন্ত ট্রাঙ্ক রোড সমাপ্তপ্রায়। পোর্টব্লেয়ার ও তার নিকটবর্তী কিছু গ্রামাঞ্চল ছাড়া গোটা দ্বীপপুঞ্জে পাকারাস্তার অস্তিত্ব ছিল না। ১৯৫২ সালের পর থেকে প্রায় দ্বীপের অভ্যন্তরেই কিছু-না কিছু পাকারাস্তা হয়েছে ও হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকেও যেসব অঞ্চলে যানবাহন চলাচল কল্পনাতীত ছিল সেখানে এখন রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাস যাতায়াত করছে। পূর্তবিভাগের ট্রাক লরি চলছে। জাহাজ নোঙর করার জন্য অন্ততঃ দশটি নতুন জেটি তৈরী হয়েছে এবং কয়েকটির সংস্কার করা হচ্ছে।

পতিত জমি চাষযোগ্য ক'রে তোলার কাজ এগিয়ে চলছে। কোন কোন দ্বীপে ভাল ধান আখ ভুট্টা উৎপন্ন হচ্ছে। এখানে শীত নেই। কোন কোন দ্বীপে গ্রীষ্মকালীন সব্জী ভাল জন্মাচ্ছে; ফলের মধ্যে কলা পেঁপে মোসাম্বী পর্যাপ্ত হচ্ছে। লবঙ্গ, জায়ফল, গোলমরিচ, দারুচিনি চাষের আশাপ্রদ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গাছের ছায়ায় আদা ও হলুদের চাষও ভাল হবে বলে মনে হয়েছে। বেড ওয়েলপামের সম্ভাবনা উজ্জ্বল; কিন্তু নার্সারি বেড়ে পামের

সুন্দর চারা অবহেলায় যেভাবে নষ্ট হ'তে দেখেছি তাতে কৃষিবিভাগের ও বনবিভাগের উপরমহলের অফিসারদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা যায় না।

একমাত্র দারু শিল্প ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন শিল্প কোথাও এ যাবৎ গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়নি। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্র আন্দামান-নিকোবর। বড় আকারের কোন শিল্প কোথাও দাঁড় করাতে গেলে বহু সামাজিক সমস্যা ডেকে আনা হবে। সুপারি ও নারিকেল সকল দ্বীপের প্রধান অর্থকরী সম্পদ; অথচ এর কোন শিল্প এখনও গড়ে উঠেনি।

যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা এখনও অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। একদ্বীপ হ'তে আর একদ্বীপে যাওয়া সুকঠিন। শস্য সব্জী ও ফলের উৎপাদন যে দ্বীপে বেশী সেখানে ক্রেতা নেই; আর যেখানে চাহিদা রয়েছে সেখানে জিনিস নেই। উৎপাদন করার প্রেরণা এতে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

আদিম মানুষ এই দ্বীপপুঞ্জের বড় আকর্ষণ। সভ্যমানুষের ক্রমাগত অভিযানে তারা আজ আতঙ্কিত। এক এক ক'রে তাদের বংশলোপ পাচ্ছে। নেগ্রিটো আন্দামানিজ জারোয়া ওঙ্গে এবং মঙ্গলয়েড শম্‌পেন অবলুপ্তির পথে। নিকোবরীরা পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে বিকাশ লাভের চেষ্টা করছে; তাদের সংখ্যাবৃদ্ধিও হচ্ছে। সভ্যমানুষের সঙ্গে অবাধ মিশ্রণ ঘটিয়ে দিলে আশংকা হয় তাদের গুণাবলী আয়ত্ত না ক'রে দোষগুলি আয়ত্ত ক'রে নিবে! সভ্যমানুষের নানারকম কঠিন ব্যাধি অনুপ্রবেশ করবে তাদের মধ্যে, বিলাসব্যসন বিমুখ নারীপুরুষের মধ্যে বিলাস প্রবণতা আসবে। সভ্যতাভিমানী মানুষের প্রধান তিনটি দোষ—সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, অহঙ্কার ও দম্ভ এবং মিথ্যাচার—তাদের মধ্যেও প্রবেশ করবে যা থেকে এখনও তাঁরা প্রায় মুক্ত রয়েছে। সিন্দুকের অর্থনীতি (money economy) থেকে বহুলাংশে মুক্ত আছে বলেই

এখনও সামাজিক অসন্তোষ শিকড় গেড়ে পুরাতন ভিত ধসিয়ে দিতে পারেনি।

নিকোবরীদের বর্তমান উন্নতির পশ্চাতে ক্রীশ্চান মিশনারীদের অতুলনীয় অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। মিশনারীদের কাছে নিকোবরীরা বহুভাবে ঋণী। তাঁরা নগ্নদেহে পোশাক পরান শিখিয়েছেন; লিখতে পড়তে ও স্কুলে যাওয়ার অভ্যাস শিখিয়েছেন; অবয়বহীন কথ্যভাষাকে আকৃতি দিয়েছেন; উদ্ভট সব কুসংস্কারের কবল থেকে মুক্ত করে সহজ ধর্মবোধ এনে দিয়েছেন। এই কারণে অধিকাংশ নিকোবরবাসী আজ যীশুর অনুগামী। শ্রেণী ও ধর্মভেদের অচলায়তন খাড়া করে হিন্দুসমাজ আদিম মানুষের দিকে ফিরেও তাকায়নি। তারা অবজ্ঞা পেয়েছে, দরদী মন পায়নি; ঔদাসীন্য পেয়েছে, আন্তরিকতা পায়নি। আর্যসমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রম কেউ এই অবহেলিত এলাকায় মানুষের সেবা করতে আসেনি, আজও আসছে না। ভারতীয় ক্রীশ্চান মিশনারীদের কষ্টস্বীকার ক'রে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরতে দেখেছি; কিন্তু কোথাও কোন সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ পাইনি। একমাত্র আনন্দমার্গী দু'একজন ও কন্যাকুমারী বিবেকানন্দ কেন্দ্রের লাইফ ওয়ার্কারকে পোর্টব্লেয়ারে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি।

অশেষ কষ্টস্বীকার ক'রে দুর্গম স্থানে পড়ে থেকে ধৈর্যের সঙ্গে অবহেলিত পশ্চাৎপদ মানুষের সেবা করার মত মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোক হিন্দুসমাজে কম। হিন্দুর উন্নত উদার দর্শনের প্রতিফলন তাই সমাজের উপরে অতীতেও তেমন পড়েনি, আজও পড়ছে না। হিন্দুদের এই দুর্বলতার ছিদ্রপথে এবং শাসক বৃটিশ শক্তির পৃষ্ঠ-পোষকতায় ক্রীশ্চিয়ান মিশন ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে, আদিবাসী অধ্যুসিত এলাকায় বিপুল সংগঠন গড়ে তুলেছে এবং প্রভাব প্রসারিত করেছে। আন্দামান নিকোবরে তার ছবি সুস্পষ্ট।

লক্ষ্য করেছি শিক্ষা বিস্তারে সরকারের ত্রুটি নেই। স্কুলের

কোন অভাব কোথাও রাখা হয়নি। 'কিন্তু শিক্ষাদান পদ্ধতি গতানুগতিক মামুলি ও উদ্দেশ্যবিহীন। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার উপযোগী শিক্ষা প্রসারের কোন প্রচেষ্টা নেই। সমাজতান্ত্রিক মানুষ গড়ে তোলার চেষ্টা শিক্ষার প্রথম স্তর থেকে না নিলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ পত্তন হবে কি ভাবে? অথচ সবদিক দিয়ে সুন্দর অনুকূল পরিবেশ ছিল আন্দামানে।

লোকাল বর্ণ ও পুনর্বসতি প্রাপ্ত মানুষের সমাজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার অপূর্ব সুযোগ আমরা হারিয়েছি। এখনও সময় আছে, কিন্তু সরকারের প্রশাসন যন্ত্রের কর্ণধারগণ কি এ-সব নিয়ে ভাববেন!

নাম-সূচী/নির্দেশিকা